দ্বিতীয় বর্ষের সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অন্ধের অঙ্ক শিক্ষা	২৫০
আঙ্কাচিনির কল	৮
আখমাড়া কল	৪৬
আলফ্রেড নোবেল	৪৭, ৭১
আসব ও মদ	১০৬
ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স	২৭০
ইনকম্ ট্যাক্স রহস্য	২২২
উদ্ভিজ্জ তত্ত্ব	১৩১, ১৫২
এদেশী ছাতার কারখানা	১৮৭
করেন্সি	৩২
কষ্টিক পটাস	৭৯
কেঁড়াগাছির চিনির কারখানা	৮০
কালীপাহাড়ী অঞ্চলে কয়লার খনি	১৫০
কাসাভা আলুর চাষ	১৬৯, ২১৭, ২৪১, ২৬৫
কোলারের স্বর্ণখনি	১৭৭
কাজের কথা	১৮২
কৃষি ও শিল্প সমাজ	১৮৯
কলিকাতার ছোট আদালত ও ৩৯ ধারা	২২৭
কাপড়	২১০
কর্পূর	৯১
খাণ্ডুয়ার চিনির কারখানা	১৪৫
গাছে পোকা ধরা নিবারণ	২৭২
গোপালনগরে গুড়ের বাণ	২৮৩
ঘৃত	৩৮
ঘর্ষণ দেশালাই	২৫৯
চা	৩০, ৭৫, ১১৪, ১৪৮, ২৭৬
চিনির উপকারিতা	৫, ২৮, ১১১
চিনির ডিউটি	৯৩, ১২৮
চিনির রাসায়নিক তত্ত্ব	১৫৮
ছাতার বাঁটের কারখানা	২০৭
ছবি ও খেলা	২৩১
ছোট আদালত	৬২
জাপানী ভাষা	১৫, ৩৬, ১২০, ২৬৪, ২৮৫
জাম্মালপুরের লৌহ কারখানা	২৩৬
টাকশাল	৫২
ডাকের কথা	১৬৫
ডিক্লেরেশন আইন	২৬৮
দড়ির কারখানা	৫৬
দেশীয় শিল্প সংবাদ	২০৯
দিল্লীর শিল্প প্রদর্শনী	২৭২
পাথুরে কয়লা	১৬১, ১৭২, ২৪৪
বসিরহাটে চিনির কারখানা	২৬১
বাণিজ্যের কথা	২৫৭
বড়লোক হইবার উপায়	১৩৫
বিলাতী দেশালায়ের কারখানা	১২
বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিবরণ	১
বাঙ্গালার আবকারী	
বৈদ্যুতিক ট্রাম	
বীরভূমে চিনির কারখানা	
বিবিধ দ্রব্যের চিনি	

১-
কারি
উভয়
সাব্যস্ত
উদ্ভিদাণু-
ক্ষু-দণ্ডে প্রায়
াতে উদ্ভিদাণুর
একারণ কীট ও

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ভারতে শিল্প শিক্ষা	২১২	শর্করা-বিজ্ঞান	১, ২৫, ৪৯, ৭৩, ৯৭, ১২১, ১৫৯
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা	২৩		
মালদহের গুটীপোকা	৫৪	সোরার কার্য্য	৯, ৪২
মানভূমে কয়লার খনি	৮৩, ৯৯	সিমেণ্ট ও বিলাতী মাটী	৬০
মহাজন-উক্তি	৮৭	স্বাস্থ্য ও বস্ত্রাদি	৬৩
মেনিলা	১৩৩	সংবাদ	৯৬, ১৪৪
মহাত্মা কৃষ্ণপান্তি	১৩৮	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	১০৩, ২৭৯
মিষ্টব্যাধি	১২৬	সহজ শিল্প	১১৮, ১৬৭, ২৩৯
মটর কার	২০৪	স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র দত্ত	৮৯, ১১৬
মিশ্রিত দ্রব্য স্বতন্ত্র করিবার উপায়	২১৫	সঙ্কেতে অঙ্ক	২৩০
রণ্টজেনের নূতন আবিষ্কার	১৯৩	৺স্বরূপচন্দ্র কুণ্ডু	১৫৫
লৌহ ব্যবসায়	২২৯	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে	১৭
শান্তিপুরে চিনির কারখানা	১২		

মহাজনবন্ধুর কথা।

এক সংখ্যা মহাজনবন্ধু বা ১ বর্ষ কিংবা ২।৪ বৎসর মহাজনবন্ধু নিয়মিত পাঠ করিলেই যে রাশি রাশি অর্থার্জ্জন হইবে, ইহা যেন কেহ না ভাবেন। লেখা পড়া বা মহাজনবন্ধুর প্রবন্ধ গুলি কর্ম্মের উত্তেজক কারণেই ব্যবহৃত হইবে। নচেৎ কর্ম্মবীর কর্ম্মক্ষেত্রে দেহ মন দিয়া কার্য্য করিবার সময় কর্ম্ম হইতেই কর্ম্মের পথ প্রাপ্ত হইবেন।

তৃতীয় বর্ষের মহাজনবন্ধুর লেখা সম্বন্ধে বিপুল আয়োজন হইতেছে। এদেশে শিল্প বিজ্ঞানের সুবাতাস বহিবার পক্ষে আপনিও "একজন" ইহা সর্ব্বদা স্মরণ াখিবেন। যদিও আপনার বা আমার এই নশ্বর ক্ষুদ্র দেহ দ্বারা "দেশের চাল ন" সরাইবার শক্তি নাই বটে; কিন্তু দেহ অপেক্ষা "আপনার আমার" বুদ্ধি-ক যে বলবান, তাহা নিশ্চিত। একজনের বুদ্ধিতে এক একটা দেশ কাঁপিয়া দেহকে যেরূপ খাবার দিতে হয়; বুদ্ধিকেও সেইরূপ খাবার দিতে হয় া বুদ্ধির খাবার মাত্র।

মহাজনবন্ধু।

মাসিক-পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

২য় বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩০৮। [১ম সংখ্যা।

শর্করা-বিজ্ঞান।

(লেখক—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—M. A, M. R. A. C, and F. H. A. S.)

অষ্টম অধ্যায়—ব্যাধি-নিবারণ।

উদ্ভিদাণু-জনিত দুইটী রোগ ইক্ষু মধ্যে জন্মিয়া থাকে। একটীর নাম "বোঞ্চা" অপরটীর নাম "ধসা।" বোঞ্চা রোগ কোল্লেটোট্রিকাম ফাল্‌কেটাম (Colletotrichum Falcatum) নামক উদ্ভিদাণু (Microscopic Fungus) দ্বারা ঘটিয়া থাকে। ধসা রোগ ট্রাইকোস্ফিরিয়া সাক্কারি (Trichospheria Sacchari) জাতীয় উদ্ভিদাণু হইতে ঘটিয়া থাকে। উভয় রোগই একই উদ্ভিদাণু হইতে জন্মিয়া থাকে, এইরূপ সম্প্রতি সাব্যস্ত হইয়াছে। ইক্ষু-দণ্ড লোহিত এবং পরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেলে, উহা উদ্ভিদাণু-জনিত ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ অবস্থাগত ইক্ষু-দণ্ডে প্রায় কীট-কোটরও দেখিতে পাওয়া যায়। কীট-কোটর প্রস্তুত করাতে উদ্ভিদাণুর বীজ কোটরের মধ্যে অবস্থান করিয়া জন্মিবার সুবিধা পায়, একারণ কীট ও

উদ্ভিদাণু উভয় ঘটিত ক্ষতি যুগপৎ প্রায়ই লক্ষিত হয়। অধিকন্তু কীট-কোটর আছে, অথচ উদ্ভিদাণুর চিহ্ন নাই; অথবা উদ্ভিদাণুতে ইক্ষু নষ্ট করিতেছে, অথচ কীটের উপদ্রব নাই, এরূপ অবস্থাও কখন কখন লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ কীট লাগিবার কারণই ইক্ষু-দণ্ড “বোঞা-লাগা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, এইটীই অধিক সম্ভব। পরে রোগ যখন অধিক পরিমাণে জন্মিয়া যায়, তখন পোকালাগা না হইলেও ইক্ষুদণ্ডে এই রোগ বাড়িতে থাকে। কীট ব্যতীত যদি এই রোগ দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে দেখা যায়, তখন ইক্ষুতে ধসা লাগিয়াছে অনুমান করিতে হইবে। ধসালাগা এদেশে কখন কখন হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশে ইক্ষুতে ধসা লাগিয়া সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। কীট-কাটরগুলি এ রোগের অন্যতম প্রবেশ-দ্বার। অন্যান্য দেশে গাছগুলি তিন ফুট উচ্চ হইয়া গেলেই নিম্ন হইতে পাতা ছিঁড়িয়া দেওয়া নিয়ম আছে। হইতে পারে, পাতা ছিঁড়িবার কারণ ইক্ষু-দণ্ডে যে সকল ক্ষত স্থান বাহির হইয়া থাকে, ঐ সকলে উদ্ভিদাণুর বীজ সহজে স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল দেশের ইক্ষু-ক্ষেত্রে রোগের বৃদ্ধি এত অধিক হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ইক্ষু-দণ্ডের উপর পাতা বাঁধিবার নিয়ম আছে। ইহাও কীটের উপদ্রবের ও উদ্ভিদাণুর বীজ-দণ্ডের উপর স্থান অধিকার করার পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ। অন্য দেশের অনুকরণে এদেশে পাতা ছিঁড়িয়া (trashing) দিবার নিয়ম প্রচলিত না করিয়া, পাতা দ্বারা ইক্ষু-দণ্ড বাঁধিয়া দিবার নিয়ম সাধারণতঃ প্রচলিত করা ভাল।

মরিশশ, বার্বেডো প্রভৃতি স্থানে অধিক পরিমাণে ইক্ষু জন্মিবার কারণেও উদ্ভিদাণুঘটিত কীটরোগও ঐ সকল দেশে অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই রোগ অল্প বিস্তর পরিমাণে আমাদের দেশেও সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। মান্দ্রাজ প্রদেশে উদ্ভিদাণু জনিত ইক্ষুরোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ প্রদেশেও স্থানবিশেষে এবং ইক্ষুজাতি-বিশেষে ধসা রোগাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ কারণ যাহাতে কীট ও উদ্ভিদাণু নিবারিত থাকে, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

ইক্ষু-দণ্ডের গাত্রে এবং অভ্যন্তরে নানাজাতীয় কীট লাগিয়া ইক্ষুর বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। নিম্নলিখিত কয়েক জাতীয় কীটের মধ্যে মাজেরা পোকা, উই, ঘুণ ও ঘেরু পোকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করে। অন্য কীটগুলির দেশীয় নাম না থাকাতে কেবল লাটিন নাম দিতে বাধ্য হইলাম।

(১) বেরু পোকা (Xyle borus Perforans) কঠিন পক্ষবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ। ইহা কীটাবস্থায় ইক্ষু-দণ্ডের মধ্যে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তদভ্যন্তরে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়।

(২) মাজেরা পোকা (Chilo Simplex) ক্ষুদ্রকায় প্রজাপতি জাতীয় পতঙ্গের কীট। ইহারা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিদ্র করিয়া ইক্ষুর অভ্যন্তরে অল্পদূর মাত্র চলিয়া গিয়া কোটর মধ্যে যাতায়াত করিয়া কোটরের চতুষ্পার্শ্বস্থ ইক্ষু-রস শোষণ করিয়া থাকে। পরন্তু পতঙ্গাবস্থায় কোটরের ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হইয়া ইক্ষু-দণ্ডের উপর, পত্র ও দণ্ডের সন্ধিস্থানে ডিম্ব প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। এই সকল ডিম্ব হইতে পুনরায় কীট বাহির হইয়া দণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে। বীজের জন্য যে টিকলি বা ডগা ব্যবহার হয়, উহার মধ্যে মাজেরা পোকা ও বেরুপোকা, এই উভয় জাতীয় পোকাই লুক্কায়িত অবস্থায় থাকিয়া, ভবিষ্যৎ ফসলের ক্ষতিকর হইয়া থাকে। টিকলিতে যে পরিমাণ উদ্ভিদাণু বা কীট নিহিত থাকে, ডগাতে কিন্তু সে পরিমাণ থাকে না। এইজন্য টিকলি ব্যবহার দ্বারা ইক্ষু-দণ্ডের বিশেষ উন্নতি হয় বটে, কিন্তু প্রতীকারের উপায় না করিয়া টিকলি ব্যবহার করিলে ব্যাধির সম্ভাবনা অধিক হইয়া পড়ে।

(৩) ইক্ষু পাকিবার সময় এবং কাটিবার পরে গৃহ মধ্যে রাখিয়া দিলে উহাতে ঘুণ লাগে। ঘুণ ক্ষুদ্রকায় এক প্রকার কীট (Dinoderus minutus.)।

(৪) শ্বেতকায় প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন কীট, যাহারা বাঁধাকপির পাতা কাটিয়া নষ্ট করে। উহারা ইক্ষুর পাতাও কাটিয়া থাকে। ইহাদের নাম মান্‌সিপিয়াম্ নেপোলেন্‌সিস্—(Mancipium Nepalensis)।

(৫) কলম হইতে অঙ্কুর বাহির হইতেছে, এমন সময় এক জাতীয় কীট অঙ্কুরগুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া দেয়। ইহার নাম একিয়া মেলিসার্ত্তে,—(Achaea Melicerte)। ইহা ক্ষুদ্রকায় “কাটুরি পোকা” জাতীয় প্রজাপতির কীট। কীটাবস্থায় ইহা মৃত্তিকা মধ্যে থাকিয়া রাত্রিযোগে বাহির হইয়া গোড়া ঘেঁসিয়া গাছ কাটিয়া দেয়।

(৬) স্কার্পোফেগা আউরিফ্লুয়া (Scirpophaga auriflua) ও ড্রাগানা পান্‌সেলিস্ (Dragana Pansalis) নামক দুই জাতীয় প্রজাপতির কীটও ইক্ষুর পাতা খাইয়া নষ্ট করে।

(৭) ইডেলাস্ মার্মরেটাস্ (Oedalus Marmoratus) ও পিসিলোসেরা হায়েরোগ্লাইফিকা (Poecilocera Hieroglyphica) নামক দুই জাতীয় উইচিংড়িও ইক্ষুর পাতা খাইয়া ফসলের ক্ষতি করে।

(৮) ব্লিসাস্ জিবাস্ (Blissus Gibbus) নামক কঠিন ও চিত্রিত পক্ষবিশিষ্ট ক্লিঞ্চ্-বাগ্ (Clinch Bug) জাতির অন্তর্গত এক প্রকার পতঙ্গ; কীট ও পতঙ্গ উভয় অবস্থাতেই ইক্ষু-দণ্ডের উপর হইতে উহার রস শোষণ করিয়া উহাকে বিবর্ণ ও হীনবল করিয়া দেয়।

(৯) রাইপার্সিয়া সাকারি (Ripersia Sacchari) নামক অতি ক্ষুদ্রকায়, শুভ্র ধূলিবৎ পদার্থলেপিত, ঈষৎ লোহিতাভ, নিশ্চল, পক্ষবিহীন কীট বিশেষ, ইহারাও পত্র ও দণ্ডের সন্ধিস্থলে থাকিয়া দণ্ডের রস শোষণ করিয়া থাকে।

(১০) পিপীলিকা, উইও ইক্ষু-দণ্ডের বিশেষতঃ কলমের ক্ষতি করিয়া থাকে। পিপীলিকা কিছু ক্ষতি করে বটে, কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা পিপীলিকা দ্বারা উপকারই অধিক দর্শে। কোটরাভ্যন্তরস্থ মাজেরা পোকা ও বেরু পোকা ডেরাইলাস্ ওরিয়েণ্টালিস্ জাতীয় পিপীলিকা দ্বারা ভক্ষিত হইয়া অনেক মারা যায়। রেড়ির খোল ব্যবহার দ্বারা উইয়ের উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ভাল করিয়া ক্ষেত্র ডুবাইয়া জলসেচন করিতে পারিলেও উইয়ের উৎপাত কমিয়া যায়। কলমেই যখন উইয়ের উৎপাত অধিক হয়, তখন কলমেরই সহিত রেড়ির খোল মিশ্রিত করিয়া লাগান আবশ্যক। লোহিত বর্ণের ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকার উৎপাত ঘটিলে হরিদ্রাচূর্ণ ছিটাইলে উপকার দর্শে।

যাহা হউক, উদ্ভিদাণুজনিত কীটের রোগের প্রতিকারাপেক্ষা নিবারণোপায় অবলম্বন করাই বিহিত। চিকিৎসকের কর্ত্তব্যও তাই। রোগের কারণ এবং রোগ দু'য়েরই চিকিৎসা করিতে হয়। নিবারণোপায় পঞ্চবিধ; যথা,—

১ম উপায়। পুনঃ পুনঃ অনেক দিবস ধরিয়া চাষ করা। ইহা দ্বারা একিয়া মেলিসার্ক্তে প্রভৃতি পতঙ্গের পুত্তলিকা ও কীট সহজে সালিক প্রভৃতি পক্ষী দ্বারা ভক্ষিত হইয়া নষ্ট হইয়া থাকে।

২য় উপায়। ইক্ষুক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে ধন্যা ও সুল্‌ফা গাছ লাগাইয়া দেওয়া। তীব্র গন্ধযুক্ত ওষধি হইতে প্রজাপতি জাতীয় পতঙ্গ অন্তরে থাকে।

৩য় উপায়। কলম বসাইবার সময়, অণুনাশক বা কীটনাশক পদার্থের মিক্শ্চারে ডুবাইয়া বসান কর্ত্তব্য। উক্ত মিক্শ্চারটি * এই,—এক ভাগ শেঁকোবিষ (আর্সেনিক চূর্ণ), ৫ ভাগ তুঁতিয়াচূর্ণ, ১০ ভাগ চূণ, ১০ ভাগ ছাই, ৫ ভাগ ভূষা, ১০ ভাগ হরিদ্রাচূর্ণ, ২০০ ভাগ রেড়ির খোলচূর্ণ; ৫০০ ভাগ জলে ঐ সকল দ্রব্য গুলিয়া কলম গুলি এই মিশ্র পদার্থে ডুবাইয়া লইয়া অনতিবিলম্বে জমিতে বসাইয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে কলমের মধ্যে নিহিত উদ্ভিদাণু ও কীট সমুদয় মরিয়া যায় এবং বাহির হইতেও উই প্রভৃতি কীট আসিয়া কলমকে বা অঙ্কুরিত গাছকে আক্রমণ করে না।

৪র্থ উপায়। ক্ষেত্র ডুবাইয়া জল দেওয়া। ছিটাইয়া মাসে চারিবার জল দেওয়া অপেক্ষা ডুবাইয়া মাসে একবার জল দেওয়াতে উপকার অধিক হয়। উই, উইচিংড়ি, কাটরিপোকা প্রভৃতি ডুবাইয়া জল দিলে মারা পড়ে।

৫ম উপায়। ইক্ষুশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী ভূমি মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া উস্কাইয়া দেওয়া। ইহাতে মৃত্তিকা মধ্যে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে কীটেরা বাসা নির্ম্মাণ করিবার সুবিধা পায় না। ইহাতে গাছগুলিরও তেজ বাড়িয়া উদ্ভিদাণু জনিত ব্যাধির এবং রাইপার্সিয়া জাতীয় চলচ্ছক্তিহীন কীটের আক্রমণ প্রায় ঘটে না।

৬ষ্ঠ উপায়। পাতা বাঁধিবার কারণ ব্যাধি কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত হওয়া সম্ভব, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। (ক্রমশঃ)

চিনির উপকারিতা।

(লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগচী)।

—০ঃ * ঃ০—

ডাক্তার গার্ডনার মহাশয় (H, Will Oughby Gardener. M. D. London) বলেন, অধিক পরিমাণে চিনি ভক্ষণের ফলে গ্রেটব্রিটেনের লোকের দেহ অধিকতর দীর্ঘ ও সবল হইতেছে। দৈহিক গুরুত্ব বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সম্পন্ন হইয়া স্থূল বিশাল দীর্ঘদেহে উদ্যম ও অসাধারণ দুর্দ্ধর্ষতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেবল দেহে শক্তি, সাহস, এবং উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নহে; তৎসঙ্গে জনন-শক্তিও

---

* ব্যবস্থা মন্দ হইল না। কিন্তু দাদের ঔষধ লোক্যাল এপ্লাই চলে কি? মঃ বঃ সঃ।

অসাধারণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইংরাজ জাতির অত্যধিক বংশবৃদ্ধি হওয়ায় সমস্ত পৃথিবীতে ইংরেজ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

অধিক চিনির ব্যবহার করার ফলেই যে ঐ সমস্ত শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করা সহজ; কারণ, যে সময় হইতে চিনির ব্যবহার বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই সময় হইতে ইংরাজের ঐ শক্তিও বৃদ্ধি হইতেছে। অর্দ্ধ শতাব্দীরও কম সময় হইল, চিনির মূল্য ক্রমে ক্রমে হ্রাস (বিলাতে) হইয়াছে। গ্রেটব্রিটেনের অধিবাসীবৃন্দ ক্রমে ক্রমে অধিক পরিমাণে চিনি ব্যবহার করিতেছে। চিনির খরচের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত শক্তিও বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং, ঐ সমস্ত ফল যে অধিক চিনি ব্যবহার জন্য, তাহা বলা যাইতে পারে। জর্ম্মাণেরা এতদিন চিনি বেশী না খাইলেও তাঁহারা বিয়ার মদ্য যত ব্যবহার করিতেন, এত আর কোন দেশে উক্ত-মদ্য ব্যবহৃত হইত না; অতএব বিয়ারে যথেষ্ট চিনি অর্থাৎ মল্টস্ (Maltose) বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, তদ্দ্বারা চিনির কার্য্যই হইত। রুসিয়ানেরা চিনি কম খায়, এজন্য উহাদের শক্তি থাকিলেও উৎসাহ নাই, অর্থাৎ হচ্ছে হউক, যাহা হয় হইবে, এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। চিনি ভক্ষণে যে সবলতা, সুস্থতা, কার্য্য-তৎপরতা জন্মে, তাহা বুয়ারদিগের খাদ্য এবং কার্য্যপ্রণালীর প্রতি দৃষ্ট করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এই বুয়ারেরা কাফির সহিত যত অধিক পরিমাণে চিনি ব্যবহার করে, অপর আর কোন জাতি তত পরিমাণ চিনি ব্যবহার করে না।

যে চিনি এত উপকারী বলিয়া কথিত হইল, তাহার রাসায়নিক উপাদান কি? এবং জীবদেহে কি প্রণালীতে কার্য্য করে, তাহাও আলোচিত হওয়া উচিত। চিনি কার্ব্বহাইড্রেট শ্রেণীভুক্ত পদার্থ, অর্থাৎ কার্ব্বন (কয়লা), হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়। জলে যে পরিমাণ অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন (H_2O) বর্ত্তমান থাকে, ইহাতেও তদ্রূপ আছে। কার্ব্বহাইড্রেট শ্রেণীতে শ্বেতসার এবং শর্করা বর্ত্তমান থাকে। তবে পরিমাণের ন্যূনাতিরিক্ত হইতে পারে। কার্ব্বহাইড্রেট পদার্থ দেহ মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হইয়া জল এবং অঙ্গারিক অম্লে পরিণত হয়। অতএব পরিপাক-অবশিষ্ট কিছুই বর্ত্তমান থাকে না, অর্থাৎ চিনি খাইলে মলরূপে কিছুই নির্গত হয় না।

চিনি দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিরূপে পরিপাক এবং শরীর বিধানে

ন্যস্ত হয়, তাহা বিবেচনা করা উচিত। মুখ মধ্যে চিনি নীত হইলে লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহা দ্রব হওয়া ব্যতীত তথায় অপর কোন কার্য্য হয় না। পাকস্থলীতে নীত হইলে পাচক রস সংযোগে আংশিক পরিবর্ত্তিত হইয়া Dextroseএ (মধুশর্করা) পরিণত ও সামান্য অংশ মাত্র শোষিত হয়। পরে এই স্থল হইতে চিনি ক্ষুদ্র অন্ত্রে যাইয়া উপস্থিত হইলে তথায় ইহার যথার্থ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তখন ইহা গ্রেপসুগার অর্থাৎ মধু-শর্করায় পরিণত এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কোষ ও সাক্কাস্ এন্‌টি-রিকাস্ দ্বারা শোষিত হইয়া পোর্টাল শোণিতে উপস্থিত হয়। তৎপরে যকৃতে নীত হইয়া তাহার কোষ মধ্যে গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চিত হয়। এই গ্লাইকোজেনও একরূপ শর্করা। বিবিধ খাদ্যদ্রব্য হইতে লিবর এই চিনি (গ্লাইকোজেন) প্রস্তুত করিয়া আপন ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে। তৎপরে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিনি না খাইলেও তখন এই গ্লাইকোজেনই চিনির কার্য্য করে, অর্থাৎ ইহা তখন বিধান মধ্যে যাইয়া পুনর্ব্বার মধু-শর্করায় পরিবর্ত্তিত হইয়া ব্যবহারে আইসে। বিধান মধ্যে কার্য্য করার সময়ে অঙ্গারাম্ল এবং জলে পরিণত হইয়া বিধান সমূহকে কার্য্য করার জন্য উত্তেজিত করে। উত্তাপ উৎপন্ন হওয়ার জন্য অথবা যান্ত্রিক কার্য্যের ফলে উত্তেজনা হয়। পরন্তু চিনি অবস্থা-বিশেষে মেদে পরিবর্ত্তিত হইয়া দেহ মধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে। সুতরাং তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে আবশ্যকানুসারে দৈহিক উত্তাপ ও কার্য্য-তৎপরতা উৎপাদন জন্য ব্যয় হইতে পারে। চিনির আরও একটী কার্য্য এই যে, ইহা দেহ মধ্যে তেজ সঞ্চয় করিয়া রাখে। তেজ ওজঃ অণ্ডলাল ঘটিত খাদ্যের (Proteid Sparing Food) কার্য্য। সুতরাং চিনি সেবন করিলে দেহের তেজক্ষয় নিবারিত বা হ্রাস হইতে পারে। অধিকন্তু এমন উপকারী খাদ্য চিনি সুমিষ্ট, সুস্বাদু, উত্তেজক এবং পরিপাক-শক্তিবর্দ্ধক; সুতরাং চিনি যে একটী বিশেষ উপকারী এবং আবশ্যকীয় খাদ্য, তাহা বলা যাইতে পারে। দৈহিক বিধানের পরিপুষ্টি সাধক বলিয়া যে একথা বলা হইল, তাহা নহে; উৎসাহ এবং উত্তাপ প্রদান করে, এইজন্যই ইহা আরও আবশ্যকীয় খাদ্য। অল্প স্থানে সুদীর্ঘকাল রাখিলেও ইহা নষ্ট হয় না। কিন্তু বায়ুর জলজান বাষ্প টানিয়া ইহা রসিয়া অর্থাৎ ভিজামত হইয়া যায়। এইজন্য সকল সময়েই ইহা রসিতে পারে, বিশেষতঃ বর্ষাকালে চিনি গুদামে থাকিয়া বিস্তর রসিয়া যায়। (ক্রমশঃ)

আস্কা চিনির কল।

আস্কা কোথায়? কটকের দক্ষিণ বহরামপুর সহরের ১২ ক্রোশ অন্তরে "আস্কা" প্রদেশ। উক্ত প্রদেশে মিষ্টার জে, এফ, ভি, মিঞ্চিন নামক এক ধনাঢ্য সাহেব তথায় এক চিনির কল প্রতিষ্ঠা করেন। পরন্তু এই কলের নাম "আস্কা সুগার ওয়ার্কস" রাখা হয়। যাহা হউক, এই কলের পূর্ব্বাবস্থা বড় ভাল ছিল না। যদিও এ কলের চিনি কলিকাতায় আসিয়া থাকে বটে, কিন্তু বরাবর আসে না, মধ্যে অনেক দিন বন্ধ ছিল। এই কলের পিটি বা পেষা চিনিই কলিকাতায় অধিক আইসে, দানাদার বা খৃষ্টাল আস্কা সুগার অতি অল্পই কলিকাতায় আমদানী হয়।

আমাদের এলাহাবাদস্থ "প্রবাসী" বলিতেছেন, "আস্কা কলে এবার হইতে এক অভিনব উপায়ে চিনি প্রস্তুত হইতেছে। ইক্ষুদণ্ডগুলি পেষিত না হইয়া কেবল মাত্র ইহাদের বিশেষ একটী কলের দ্বারা চিরিয়া লওয়া হয়। এই সকল চেরা আক্ কতকগুলি নলের মধ্য দিয়া চালিত হয়। প্রত্যেক নলের মধ্যে অতিশয় উষ্ণ জল থাকাতে, এবং চেরা আক্‌গুলি একটী নল হইতে অপর একটী নলে চালিত হওয়াতে, সমস্ত শর্করা ভাগ ঐ উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত হয়, এবং জৈব পদার্থগুলি উষ্ণতা প্রযুক্ত কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, অর্থাৎ উক্ত নলের ভিতরেই গরম রস হইয়া, পরে গরম গুড় হইল। ইক্ষুদণ্ডে স্বভাবতঃ যে ৯০ বা ৯১ ভাগ রস থাকে, উহার ৮৪ হইতে ৮৬ ভাগ এই উপায়ে বাহির হইয়া আইসে। পরে নলগুলির মধ্যস্থিত উষ্ণজল বা রস ভাল করিয়া ছাঁকিয়া স্ফটিকের ন্যায় পরিণত করিয়া লইয়া শুকাইয়া লইলেই চিনি হয়। রস ছাঁকিবার প্রক্রিয়া আছে, তাহাতেই কলের চিনি বা পরিষ্কার চিনি বা রিফাইন সুগার প্রস্তুত হয়। প্রত্যহ ৭০০০ মণ ইক্ষুদণ্ড এই উপায় দ্বারা রিফাইন চিনিতে পরিণত করিতে হইলে, ৪ লক্ষ টাকা দিয়া কল বিলাত হইতে আনাইতে হয়। পরন্তু আস্কাকলের সাহেবরা এই কল আনাইয়াছেন। অধিকন্তু এই কল প্রেগ্ (Prague) সহরের Bohmisch Mahrische Maschine fabrik কারখানায় ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

সোরার কার্য্য।

Saltpetre বা সোরার কার্য্য করিবার জন্য কি কি প্রকার আয়োজন আবশ্যক হয়, তাহারই একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ব্যবসায়িগণ যাহাতে এই কাজে দুই পয়সা লাভ করিতে পারেন, তাহার বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমে জানা আবশ্যক, সোরা জিনিসটী কি এবং ইহা ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে উৎপন্ন হয়, ইহা দ্বারা কি কি কর্ম্ম হয়, কোন্ কোন্ দেশের কোন্ কোন্ অংশে ইহা রপ্তানি হইয়া থাকে।

সোরা জিনিসটী ৫টী দ্রব্যের সমষ্টি,—যথা (Saltpetre বা Potasium Nitrate) বা সোরা, (Sodium) লবণকর ধাতুবিশেষ, (Potash) সোরার ক্ষার, (Moisture) জল, (Impurities) খাদ,—এই কতিপয় পদার্থ সমন্বিত সোরা দেশ বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। রালী ব্রাদার্স, আন্দার্শন রাইট, গিলিণ্ডার প্রভৃতি কলিকাতাস্থ প্রায় অধিকাংশ ব্যবসায়িগণ ইহা ইউরোপের ও আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন দেশে সকল সময়েই আবশ্যকমত রপ্তানি করিয়া থাকেন। এই দ্রব্য ভারতবর্ষের সমগ্র ছাপ্‌রা, মোজাফরপুর, মতিহারি, কানপুর, ফরাক্কাবাদ, সিওয়ান, আলিগঞ্জ প্রভৃতি জেলায়—সামান্যতঃ বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেকানেক স্থানে মাটী হইতে উৎপন্ন হয়। লোণা মাটীতে এক প্রকার লুণ ফুটিয়া উঠে। উহা চাঁচিয়া লইয়া, পরিমিত জল দ্বারা ভিজাইলে, এক প্রকার গাঢ় রসে পরিণত হয়। সেই রস সুবৃহৎ লৌহ কটাহে অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া, সুবৃহৎ কাষ্ঠ টবে রাখিয়া দেওয়া হয়; এবং ঐ টবের ভিতর কতকগুলা কাঠি রাখিয়া দেওয়া হয়। ক্রমশঃ এই রস শীতল হইলে, দশ বার দিবসের মধ্যে ঐ সকল ভাসমান কাটির গায়ে এক প্রকার দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে। সেই সমস্ত দানা একত্র সংগ্রহ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সচ্ছিদ্র পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হয়। উহা হইতে রস ঝরিয়া বাহির হইয়া গিয়া, কথঞ্চিৎ শুষ্ক হইলে, তখনই ইহা আমদানির উপযোগী পণ্য হইয়া থাকে। ইহাই অপরিস্কৃত লবণ-ক্ষার-জল এবং খাদ মিশ্রিত

সোরা। আমার অনুমান, এই প্রকারে প্রতি বৎসর অন্যূন চল্লিশ বা পঞ্চাশ সহস্র টন্ সোরা আমদানী হইয়া থাকে। Railway—Export-List নামক কাগজে প্রত্যেক দিনের হাওড়ার আমদানী সোরার এক বৎসর কালের হিসাব নিয়ত দেখিয়া আসিলে, এইরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বোধ হইবে না। এই অবিশুদ্ধ সোরা বিশুদ্ধ হইয়া, যখন সমগ্র জগতে নানাস্থানে ব্যবসায়িগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হয়, তখন অনেকেই ইহা খরিদ করেন। প্রথমতঃ ইহা বারুদেই ব্যবহৃত হইত; সে কারণ প্রত্যেক রাজ্যেরই যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারেই ইহার প্রয়োজন ছিল বলিয়া, সকল দেশের অধিপতিই ক্রেতা ছিলেন। Saltpetre বা সোরার অন্য নাম Nitre নাইটর। এই সোরা বা Nitre হইতে Nitric acid বা লবণদ্রাবক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের মাটী উর্ব্বরা দেশগুলির সহিত আপেক্ষিকী তুলনায় কথঞ্চিৎ অনুর্ব্বর বলিয়া শুনা যায়; সে কারণ কখন কখন ইহা সাররূপে মাটীর সহিত মিশাইয়া ইংলণ্ড বা তাদৃশ দেশের ক্ষেত্রসমূহে প্রযুক্ত হইত। ভারতের ন্যায় উর্ব্বরা ভূমিতেও এই সোরার সারের প্রয়োগ বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। বারুদ প্রস্তুতিতে ব্যবহার্য্য সোরা এবং Nitric acid প্রস্তুতীকরণের উপাদান সোরা অতীব উৎকৃষ্ট হওয়া চাই; কিন্তু সারের জন্য (Manuring Purpose) ব্যবহার্য্য সোরা অতীব নিকৃষ্ট হওয়া দরকার। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কামানের বারুদের নিমিত্ত ইহার অতীব আদর ছিল। তবে আধুনিক জর্ম্মণদেশের কৃত্রিম সোরা (Artificial Nitre) আবিষ্কৃত হওয়া অবধি ইহার সৌভাগ্য অনেকটা কমিয়াছে। অপিচ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে (By Electricity) বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ সহযোগে সে কার্য্যের সহায়তা হওয়ায়, ইহার গৌরবের আরও অধিকতর হ্রাস হইয়াছে। তবে অপরতঃ ইহার গৌরব রক্ষা পাইবার অনুকূল সৌভাগ্যোদয় হইতেছে, এখন বেলওয়ারি কাচের কারখানার কাচ শিল্পে সোরা ব্যবহৃত হইতেছে।

সকল কর্ম্মেই যে প্রকার উত্তম হইতে ক্রমান্বয়ে অধম পর্য্যন্ত নির্ণয় করিবার নিমিত্ত একটী উপায় আছে, ইহারও সাধারণতঃ একটী সেইরূপ ক্রম আছে। তাহাকে বিশুদ্ধির পরিমাণসূচক Percent বা শতকরা হিসাব বলা সঙ্গত; যথা শতকরা ১ ভাগ, ২ ভাগ, ১০ ভাগ বা ৫০ ভাগ অবিশুদ্ধ সোরা বা খাদ আছে। তবে সোরা ব্যবসায় শতকরা ৫ বা Five Percent বলিলে শতকরা ৫ মণ খাদ বুঝিতে হইবে। শতকরা ৬ বলিলে, ৬ মণ খাদ বুঝাইবে; ইত্যাদি। শতকরা ৫ মণ হইতে ১৫ মণ অবধি খাদে সোরা বৈদেশিক বণিগ্‌গণ খরিদ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সোরাতে ৫টী প্রকার পদার্থ সংসক্তভাবে মিশ্রিত আছে;—শতকরা ৫ ভাগ খাদের চুক্তির সোরা (Five Percent guaranteed Saltpetre) বলিলে বুঝাইবে যে, একশত মণ সোরার ভিতর ৫ মণ মাত্র খাদ আছে। যথা—৯৫ মণ বিশুদ্ধ সোরা অর্থাৎ Kalium Nitrate (K. N. O. 3) ৫ মণ খাদযুক্ত সোরা—[এই ৫ মণ খাদযুক্ত সোরার রাসায়নিক বিশ্লেষণে (Analyse) পূর্ব্বোক্ত চারিটি দ্রব্যই দেখা যায়]। তবেই দেখিতে পাইতেছি, ৫ মণ খাদের মালকেই শতকরা ৫ মণ খাদের সোরা বলে। এক শিশি ৫ মণ খাদের মাল Analyse করিতে দিলাম।

তাহার ফল নিম্নলিখিতরূপে প্রাপ্ত হইলাম; যথা—

লবণকর ধাতু, Sodium	1.200	বা	Sodium	2.400
সোরার ক্ষার, Potash	1.300		Potash	.400
জল, Moisture	2.100		Moisture	1.200
খাদ, Impurities	.008		Impurities	.584
Total	4.508		Total	4.584

যদ্যপি Analyse ফল বা Result ৫ মণের কম হয়, বা ৫ মণ পর্য্যন্ত সমান হয়, তাহা হইলেই তাহাকে 5 P. C. বলিব; কিন্তু যদ্যপি এক দশমিকাংশ বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ হাজার ভাগের ১ ভাগ বাড়ে, তাহা হইলে, তাহা আর শতকরা ৫ মণ খাদের মধ্যে আসিবে না; যথা, বিশ্লেষণে খাদের সমষ্টি—৫.০০১, এবম্প্রকারের হইলেও, তাহা শতকরা ৫ মণ খাদের মাল বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য করা হইবে না। তবে ৫.০০১ হইতে ৫.২৫০ পর্য্যন্ত সওয়া পাঁচ মণ, ৫.২৫১ হইতে ৫.৫০০ পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচ মণ, ৫.৫০১ হইতে ৫.৭৫০ পউনে ছয় মণ এবং ৫.৭৫১ হইতে ৫.৯৯৯ পর্য্যন্তও পউনে ছয় মণ। তাহার পর ৬.০০০ হইলেই তাহা শতকরা ৬ মণ খাদে ধার্য্য হইবে। এবং এইরূপে শতকরা ৬ মণ বা ৭ মণ খাদ প্রভৃতি ধরা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। এবং এই বিশ্লেষণ কার্য্যের ভারটী এক্ষণে ডাক্তার আর স্কট্টমশন সাহেবের রাসায়নিক বিশ্লেষণ বিভাগে বিন্যস্ত আছে। তাঁহারা যাহা করিয়া দিবেন, কি ক্রেতা, কি বিক্রেতা, সকলকেই অখণ্ডনীয়রূপে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইতে

হইবে। তাহাতে কি বিক্রেতা কি ক্রেতা কাহারই কোন প্রকার ওজর আপত্তি চলিতে পারে না।

পশ্চিম হইতে চালানি মাল কলিকাতায় অধিকাংশ যাহা আসে, তাহা বেশী খাদী। সেই বেশী খাদী মালকে 5 P. C.এ পরিবর্ত্তন করিয়া, বিক্রী করিবার নিমিত্ত কতকগুলি ব্যবসায়ী লোক আছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারখানা আছে। সেই কারখানায় তাঁহারা সেই সব বেশী খাদী মাল মাড়য়ারীদিগের আড়ত হইতে খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দেন। তৎপরে উক্ত বৈদেশিক ক্রেতাদিগের গ্রাহ্য শতকরা ৫ মণ খাদের মাল পরিণত করিয়া, বিক্রি করিয়া থাকেন; এবং ইহাকেই কলিকাতার বাজারে খরিদ বিক্রীতে শতকরা ৫ মণ খাদের পরিষ্কৃত সোরা বলিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রসাদদাস দত্ত।

শান্তিপুরে চিনির কারখানা।

এখানকার চিনির কারখানাগুলিও "র" সুগার বা কাঁচা চিনির। পূর্ব্বে এখানকার নিকটবর্ত্তী পার্শ্বস্থ অনেক গ্রামের স্থানে স্থানে এই চিনির কারখানা অনেক ছিল; এখন আর প্রায় নাই,—কেবল শান্তিপুরের মধ্যে সূত্রগড় নামক স্থানে ২০।২৫টী চিনির কারখানা অদ্যাপি জীবিত আছে। গোবরডাঙ্গার চিনির কারখানা তাম্বুলি এবং কৈবর্ত্তজাতি দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানকার কারখানাগুলি কেবল মোদক জাতিতে করিয়া থাকে।

শান্তিপুরের ওজন কাঁচি, অর্থাৎ ৬০ শিক্কার ওজন। কলিকাতার ওজন ৮০ শিক্কার। অতএব উক্ত দেশের ওজনের সঙ্গে কলিকাতার ওজনে "সিকি" আন্দাজ ইতর বিশেষ করিয়া ধরিলে, মোটামুটি হিসাব করা চলে; অর্থাৎ শান্তিপুরে ১/০ মণ বলিলে, কলিকাতায় উহা ৸০ ত্রিশ সের হইবে। কাঁচি ওজনের দরও কাঁচি হয়, অর্থাৎ এখানে অমুক দ্রব্যের মণ ২৲ টাকা বলিলে, কলিকাতার হিসাবে উহার উপর সিকি মণের অনুপাতে দামের এক তৃতীয়াংশ চাপিয়া যাইবে। কারণ ২৲ টাকা ঠিক, সেখানকার মণটা ঠিক নহে বলিয়া অর্থাৎ ১/০ মণ বলা হইয়া, কিন্তু ৸০ সেরে মাল দিয়া, ২৲ টাকা লওয়া

হয়; কাজেই মণে সিকি চাপায় দামে অর্থাৎ টাকায় ।/৫ সওয়া পাঁচ আনা বাড়িবে। যাহা হউক, এখানে গুড়ের হাট হয় না। কারখানাওয়ালারা বাড়ী বসিয়া গুড় ক্রয় করেন। অগ্রহায়ণের শেষ হইতে মাঘের শেষ পর্য্যন্ত যতদিন খেঁজুর গাছে রস থাকে, ততদিন গুড় ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। খেঁজুরে গুড়ের চিনিই শান্তিপুরের কারখানা গুলিতে প্রস্তুত হয়। ইক্ষু চিনির কারখানা এখানে আদৌ নাই।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসে আপনাদের "মহাজনবন্ধু"তে যিনি গোবরডাঙ্গার চিনির কারখানা লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের দেশের কারখানার খরচার যে তালিকা দিয়াছেন, আমাদের প্রায় ঐ খরচা পড়ে—আমরাও মণকরা প্রায় এগার আনা খরচা ধরি, যদিও ৻১০ পয়সা বা /০ আনা কম খরচা হয় বটে; কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্য মধ্যে নহে। অতএব আমরা আর খরচার তালিকা দিলাম না। ধরিয়া লউন, আমাদেরও খরচা গুড় হইতে চিনি করিতে মণকরা ।৷৶০ আনা পড়ে। ইহা কলিকাতার এগার আনা জানিবেন। পরন্তু এ প্রবন্ধের নিম্নে যে সকল হিসাব দিব, তাহা পাকী মণের উপর অর্থাৎ আপনাদের কলিকাতার মণ এবং টাকার হিসাবেও তাহাই জানিবেন।

বিগত বৎসর আমাদের গুড় খরিদে গড় পড়তায় দেখিয়াছি, উহা কাঁচি ২৸০ আনা মণ পড়িয়াছে; কলিকাতার হিসাবে ৩।৶০ আনা গুড়ের মণ কেনা পড়িয়াছে। আমরা একটা চুব্‌ড়িতে ৩/০ মণ গুড় রাখিয়া, উহাতে পাটাশেওলা চাপা দিয়া রাখি; এখানে ৮ দিনের মাথায় শেওলা তুলিয়া চিনি কাটা হয়, অর্থাৎ ৭ দিন শেওলা চাপা থাকিলে এবং চুব্‌ড়িস্থিত গুড়ের মাৎ ঝরিয়া উহার নিম্নস্থ গাম্‌লায় পড়ে, অর্থাৎ আমরা চুব্‌ড়িতে গুড় রাখিয়া, উক্ত চুব্‌ড়ি একটী গাম্‌লার উপর বসাইয়া রাখি; এই গাম্‌লায় চুবড়িস্থ গুড়ের মাৎ আসিয়া পড়ে। ৭ দিন চুব্‌ড়িতে গুড় থাকিলে, উহার মাৎ ঝরিয়া এবং পাটা শেওলার দ্বারা চুব্‌ড়ির উপরস্থ গুড় রীতিমত শুখাইয়া উঠে; শুষ্ক গুড় এবং চিনি একই দ্রব্য। যাহা হউক, ৭ দিন পরে, শেওলা তুলিয়া যে চিনি চুব্‌ড়ি হইতে কাঁকিয়া বা কুরিয়া বাহির করা হয়; ইহাকে "দলো" চিনি কহে। খেঁজুরের গুড়ের ইহাই প্রথম চিনি। তৎপরে চুবড়ির নিম্নস্থ গাম্‌লার মাৎগুড় এবং চুবড়ির তলদেশের যে গুড় ৭ দিনে শুখায় নাই,—এই দুয়ে একত্র করিয়া জ্বাল দিয়া, নাদে ফেলিয়া শীতল করিয়া, গুড় জমিলে, ইহাকে আবার চুবড়িতে দেওয়া হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পাটাশেওলা চাপা দিয়া রাখা হয়।

তৎপরে ৭ দিন পরে পূর্ব্বোক্ত ভাবে চিনি কুরিয়া লওয়া বা চিনি কাটা হয়; এই চিনিকে “গোঁড়” চিনি বলে। এইবার চুব্‌ড়ির নিম্নস্থ গাম্‌লায় যে গুড় চুব্‌ড়ি হইতে ঝরিয়া পড়ে, তাহা জ্বাল দিলে আর গুড়ের মত জমে না, চট্‌চটে আটাবৎ হইয়া পড়ে; কাজেই ইহাকে আর জ্বাল দেওয়া হয় না, ইহাকে “চিটে” বলা হয়। তামাক মাখিতে এবং মদ্য প্রস্তুত করিতে ইহা বিস্তর ব্যবহৃত হয়। এমন কি সময়ে সময়ে কারখানাওয়ালাদের চিনিতে ক্ষতি হইয়াছে; কিন্তু হয় ত সে বৎসর চিটের দর ভাল ছিল বলিয়া, কারখানায় লাভ হইয়া গিয়াছে। এখানকার নিকটস্থ হরিপুরের খালের পাটাশেওলা দ্বারা শান্তিপুরের কারখানাগুলি চলে। গরুর গাড়ির এক গাড়ি পাটাশেওলা ১৲ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত প্রণালী দ্বারা চুবড়িতে গুড় রাখাকে “পেতে দেওয়া” বলে। এখানেও আউড়িতে (অন্ধকার শুষ্ক ঘরে) চিনি প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। একটা চুব্‌ড়িতে ৩/০ মণ গুড় রাখা হয় বলিয়া, তাহাকে “তিনমুনী পেতে” বলে। পরন্তু একটী পেতে বলিলে, তাহাতে কলিকাতার মণে ৩/০ গুড় আছে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, গত বৎসর আমরা গড়-পড়তায় ৩৷৷৶০ হিসাবে প্রতি মণ গুড় ক্রয় করিয়াছি। এক্ষণে একটী পেতের হিসাব দেখুন,—

১ পেতে ৩/০ মণ গুড় ৩৷৷৶০ হিসাবে	···	১১/০
খরচা মণ করা ৷৷৶০ হিসাব ৩/০ মণে	···	২/০
মোট		১৩৵০ খরচ।

ইহা দ্বারা চিনি পাওয়া যায়,—

দলুয়া চিনি	৸০ সের	দর ৬৷০ হিসাব	৪৷৷৶০
গোঁড় চিনি	৷৫ ,,	,, ৫৷০ হিসাবে	১৸৶১০
চিটে গুড়	১৷৫ ,,	,, ২৷৷০ হিসাবে	৩৷৶০
জলতি	৷৷০ মণ		
মোট	৩/০ মণ		১০/১০ আদায়
অতএব ক্ষতি			৩৲১০

তিন টাকা আধ আনা মাত্র প্রতি পেতেয় ক্ষতি; ইহা স্মরণ রাখিবেন। একটা পেতেয় পরন্তু দলুয়া, গোঁড় এবং চিটের দর যাহা ধরা হইল, উহা বিগত কার্ত্তিক মাসের দর জানিবেন। অধিকন্তু দলুয়া, গোঁড়ের দর যতই বৃদ্ধি হউক, বিট্‌চিনি প্রভৃতি কলের চিনি থাকিতে, আমাদের এ দেশী দলুয়া ১০৲ ৯৲ মণ আর বিক্রয় হইবে না নিশ্চিতই। অতএব গত বৎসর প্রত্যেক পেতেয় গড়ে ২৷৩ টাকা লোকসান নিশ্চয়ই হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাঁচশত পেতের কমে কারখানা হয় না; অর্থাৎ খুব ছোট কারখানা করিলেও, ৫০০ শত পেতে এক বৎসরে দিতে হয়, অর্থাৎ (তিন মণের পেতে বলিয়া) ৩ তিন পাঁচে “পোণের শত” মণ গুড় ভাঙ্গিয়া চিনি না করিলে, তাহা কারখানার মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে। এ বৎসরে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা গুলিতে হিসাব মত প্রত্যেক পেতেয় ৩৲ টাকা ক্ষতি হইলে, ৫০০ শত পেতেয় ১৫০০৲ টাকা ক্ষতি হইবে। শান্তিপুরের বড় বড় কারখানাগুলিতে প্রত্যেক কারখানায় বড় জোর এক বৎসর মধ্যে ১৬৷১৭ শত পেতে দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু বড় বড় কারখানা আর নাই। যাহা আছে, তাহাও যাইতে বসিয়াছে। শ্রী:—

জাপানী ভাষা শিক্ষা।

(দোকান সম্বন্ধীয় কথা।)

তোমার আছে?—আরিমাস্কা।
আমার আছে—আরিমাস।
আমার নাই—আরিমাসেন।
আমি জানি বা বুঝি—ওয়াকারিমাস্থ।
আমি জানি না বুঝি না—ওয়াকারি,—
মাসেন, বা সীরিমাসেন।
পুরাতন—ফুরুই।
নূতন—আটারাসি।
শস্তা—য়াস্থই।
খুব মহার্ঘ—টাকাই, আমারি টাকাই,—
বা টাকুসান, টাকাই।

খুব শস্তা—টাকুসান য়াস্থই।
ক্রেপ—চিরিমেন।
তূলা—চিজিমি।
কারুকার্য্যযুক্ত রেশমী বস্ত্র—নিসিকি।
গাউন—কিমোনো।
আবরণ, কোট—হাওরি।
শাসীর ফ্রেম—ওবি।
মোটা—আটস্থই।
পাত্‌লা—উস্থই।
প্রশস্ত—হিরোই
সরু—সেমাই।

লম্বা—নাগাই।
সংক্ষেপ, ছোট—মিজিকাই।
গজ—সাকু—(আড়াই সাকুতে একগজ)
বদ্‌লাইতে—টোরিকায়েরি।
কাল—ক্রোরি।
নীল—আয়ো, সোরাআইরো।
গাঢ়নীল—আসাসিইরো, কোন।
ঈষৎ নীল—মিজু আসাগি।
সবুজ—আওই, মিডোরি, মোয়েগী।
ঈষৎলাল—মোমোআইরো।
গাঢ়লাল—মুরাসাবি।
লাল—আকোই।
সাদা—সীরোই।
হরিদ্রাবর্ণ—কিইরো।
রকম, রীতি—হায়ারি।
ময়লা—কিটানাই।
সর্ব্বোৎকৃষ্ট—ইচিবান উরোসী।
বৃহৎ—ওকি।
আমি করিতে পারি বা করিব—ডেকিমাস।
আমি করিতে পারি না করিব না—ডেকিমাসেন।
ইহা অসম্ভব—ডেকিনাই।
স্বর্ণ—কিণ।
রৌপ্য—জিন।
কাগজের টাকা—সাটস্থ।
ছোট—চিসাই।
কাঁচি—হাসামি।
ইহাকে ডাকিতে—সোকাই টুনা এটেও, কাকিনাসাই।
আমি ইহাও লইব—কোরেমো মোচিমাসো।
আমাকে আরও ভাল কিছু দেখাও—মোটো ই মোনো ও ওমীসে ন্যাসাই।
তোমার কাছে যাহা আছে, সেই সকলের নমুনা আমার কাছে আন—আরুডাকে নোমোনো মিহোন মোট্টে কিটে কুড়াসাই।
আমি ইহা কিনিব—কোরে ও কাইমাস।
যখন ইহা প্রস্তুত হইবে, আমাকে জানাইও—সাকু সারেহা সিরাসে নাসাই।
ইহা আরও শস্তা করিবেন—মোট্টো ওমাকে নাসাই।
আমি ইহা আরও হাল্‌কা রঙ্গের চাই—মোটো উস্থই ইরোগা হোসী।
আমাকে আরও খুব গাঢ় রঙ্গের দাও—মোটো ক্রোই ইরো কুডাসাই।
কিসে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে?—কোরেওয়া নান্‌ডে ডেকিটে ওরিমাস।
কতগুলি?—ইকুটস্থ?
তোমার কি আর বেশী আছে?—মোট্টো আরুকা?
এই বোঁচকাটা পাঠাও—কোনো স্থটস্থমিও এয়াট্টেকুরে।
আমি ইহা দেখ্‌তে পেতে পারি কি?—মিসেটে ওকুরে।
কম—স্থকুনাই।
খারাপ—ওয়ারুই।
স্থন্দর—কিরেই।
আমি আবার আসিব—মাটা কিমাস্থ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে।

প্রবন্ধের শিরোদেশে যে পবিত্র উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় স্থপুরুষের উদ্ভাসিতদ্যুতি প্রতিকৃতি দেখিতেছেন,—ইনিই সম্পন্ন শ্রেষ্টিপুঙ্গব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে। বাহ্যতঃ ইঁহার মূর্ত্তি যেমন সৌন্দর্য্যের বিমল আধার বলিয়া মনে হয়, তেমনই ব্যবহার-গুণে ইনি সকলেরই নিকট মনোমোহন বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন; ইঁহার মনোগত উচ্চাশয়ের নিদর্শন তাঁহার বদনপ্রভায় সর্ব্বদাই প্রকাশমান। অপিচ, ভগবৎকৃপায় দয়া ক্ষমা প্রভৃতি দেবোচিত সদ্‌গুণে তিনি যে স্থব্যক্তমহত্ত্ব-অলঙ্কৃত, তাহা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই পরিলক্ষিত হয়। ইঁহার জন্মভূমি ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগর—বা ফরাসডাঙ্গার অন্তর্গত বারাশত বিভাগে।

ফরাসডাঙ্গা অঞ্চলে যে কয়েকটী ধনী আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মানকুণ্ডের শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল খাঁ প্রভৃতি (হাটখোলার প্রসিদ্ধ ধনী মহাজনগণ), লালবাগানের ৺দুর্গাচরণ রক্ষিত, (ইনি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যে সবিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন, বর্ত্তমান কালে তাঁহার পুত্রেরাও বৈদেশিক

বাণিজ্যে রত), তেলিনীপাড়ার শ্রীযুক্ত সত্যদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি (ইঁহারা সুবিখ্যাত কীর্ত্তিমান জমিদার-পরিবার)—ইঁহাদিগের দেশপ্রসিদ্ধি থাকিলেও, তত্রত্য বারাশতের শ্রীমানী-বংশ এবং দে-বংশ কোন প্রকারেই উপেক্ষণীয় নহে—বরং বর্ত্তমান বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ইহাঁরা সুপ্রসিদ্ধ ধনী বলিয়া, সম্মানার্হ। অদ্য আমাদিগের প্রবন্ধে ইহাদিগের অন্যতর দে-বংশের পরিচয়ই প্রকটিত করা উদ্দেশ্য।

৺রাধাকৃষ্ণ দে মহাশয় হইতেই ইঁহাদিগের ফরাসডাঙ্গায় বাস। ইনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—সামান্য ব্যবসায়োপজীবী ছিলেন; ব্রিটিশ-অধিকৃত চন্দননগরে আসিয়া সামান্য ভাবে এক তূলার দোকান করেন। ইঁহার সময় ভারতে তূলার বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রসার-প্রতিপত্তি সর্ব্বদেশেই ছিল; বাঙ্গালার তূলা বিশেষতঃ ঢাকার তূলার মর্য্যাদা এখনও সর্ব্বদেশ-সমাদৃত হইলেও, তখনকার আদরের অনুপাতে অনেক অল্প। তখন ভারতীয়, বিশেষতঃ বঙ্গীয় তূলার আদর থাকায় ভারতে তূলার বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রবল ভাবে চলিতেছিল; তূলার দোকানও তখন ছিল অনেক—তৎকালে কলিকাতার বড়বাজারেও তূলাপটীর শ্রী-সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান! এখন সে দিন আর নাই—এখন তূলাপটী আছে,—তূলার ব্যবসায়ের সেরূপ শ্রীবৃদ্ধি নাই!

বাণিজ্য-সংক্রান্ত ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলে—প্রত্নতত্ত্বে দৃষ্টি রাখিয়া, তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, জানা যায়, প্রাচীন কাল হইতে ভারতের পণ্যজাতের মধ্যে তূলাই প্রথম বলিয়া গণ্য। ভারতের মধ্যে বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে তূলার কৃষি অনুষ্ঠিত হইত সত্য, তূলার বাণিজ্য-ব্যবসায়ও ছিল বটে, কিন্তু উৎকর্ষে বঙ্গীয় তূলার স্থান অধিকার করিতে না পারায়, ইহার আদর পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সমভাবে দেখা যাইত না। যদিও বোম্বাইয়ের পারসিক ধনীগণ, বঙ্গীয় তূলা-ব্যবসায়ীদিগের অপেক্ষা অধিকতর লাভবান্ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের বণিকৃবৃত্তির সহিত অস্মদ্দেশীয়দিগের বাণিজ্যপদ্ধতির তুলনা করিলে, ইহার কারণোপলব্ধি করা যায়। বোম্বাই পারসিগণই শ্রমসহিষ্ণুতায় ও বুদ্ধিমত্তায় যে অগ্রগণ্য, তাহা সর্ব্বথা-স্বীকার্য্য। অপরতঃ তূলার ব্যবসায়ে তাঁহারাই যে অগ্রণী, তাহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য। বঙ্গীয় ধনীগণের অন্তর্ব্বাণিজ্যেই ধন-বিন্যাস,—বহির্ব্বাণিজ্যে ইহাঁদিগের বিরাগ বহুদিনের। আর বোম্বাইয়ের ধনীগণ বহির্ব্বাণিজ্যের পক্ষপাতী—অপিচ তাঁহারই কল্যাণে বোম্বাই-ধনীদিগের শ্রী-সমৃদ্ধির বৃদ্ধি! যেমন বোম্বাইয়ের তুলকব্যবসায়ীগণ বাঙ্গালায় আসিয়া তূলা ক্রয় করিতেন, তেমনই কলিকাতায় বৈদেশিক বণিকগণও তূলা ক্রয় করিতেন;—তাঁহাদিগের প্রচলিত তূলা সংক্রান্ত বহির্ব্বাণিজ্যের অনুকম্পায় বাঙ্গালার অন্তর্ব্বাণিজ্যেও ধনীদিগের বেশ জয়জয়কার হইত।

এই তূলার ব্যবসায়ের অতিপ্রসার লইয়া, এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন আলোচনা হয়। ১৮৫৯—৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতে তূলার বিনিময়ে ১২ কোটী রৌপ্য মুদ্রার আগম হয়। পৃথিবীতে তাৎকালিক যাবতীয় রৌপ্য-খনি হইতে যত রৌপ্য উত্থিত হয়, তাহাতে ১০ কোটী টাকা প্রস্তুত হইতে পারে; ভারতে তূলার বাণিজ্যে এক বৎসরের উৎপন্নেরও অধিক প্রায় ১২ কোটী টাকার আমদানী হওয়ায় য়ুরোপে মহা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সেই সময়ে ভারতে স্বর্ণমুদ্রা চালাইবার উদ্যোগ অনুষ্ঠান বা জল্পনা কল্পনা হইতে থাকে; কিন্তু তাৎকালিক রাজস্ব-সচিব ত্রিবিলিয়ন, ও বিলাতের ভারতীয় ষ্টেট-সেক্রেটারী সার চার্লস উড, এই মহাপুরুষদ্বয়ের বিশিষ্ট মনোযোগের অভাবে সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এখন ভারতে সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলন যে হইয়াছে, ইহার বিনিময়-বিভ্রাটের অপনয়ন উদ্দেশ্য হইলেও, প্রথম প্রবর্ত্তনায় প্রস্তাবের কারণ তূলার বিস্তৃত ব্যবসায়।

বাণিজ্যকুশল উদ্যোগী পুরুষদিগের কখনই পরমুখাপেক্ষা বা বৈদেশিক নির্ভর কখনই অভিপ্রেত হইতে পারে না—তাই তূলার বীজসংগ্রহের চেষ্টা চরিত হইতে লাগিল। ভারতীয় তূলার বীজ হইতে মিশরে, আমেরিকায় তূলা-কৃষি আরব্ধ হইল,—অদম্য উদ্যমে সুফলও ফলিল। পাশ্চাত্যজগতে উন্নতি-সাধন-চেষ্টা ইন্দ্রজালের মোহিনী মায়ার ন্যায় আশ্চর্য্যকরী! যত্নে ও পরিশ্রমে অল্পদিন মধ্যে পৃথিবীর অনেকস্থানে তূলা জন্মিতে লাগিল। প্রতিযোগিতায় ভারতের তূলার ব্যবসায়ে ফল-বিপর্য্যয় ঘটিল—তূলার কৃষি-বাণিজ্যে সাংঘাতিক আঘাত লাগিল—মন্দাবস্থার সূত্রপাত হইল। হায়! চিনি বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় পড়িয়া আজ ভারতের বা চিনির ব্যবসায়ের যেরূপ ক্রমহ্রাস বা উচ্ছেদের আশঙ্কা, তূলার বিষয়েও তখন তাহাই! পরন্তু বাঙ্গালায় দেশীয় 'র' সুগারের কারখানা যদিও এখন ২।৫টা জীবিত, কিন্তু তূলার বাণিজ্যে পরিণামে আরও ভয়ানক হইল, তূলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের একবারে লোপ হইবার উপক্রম

হইল। (এখন তূলার কাজ লোপ পাইয়া গিয়াছে। চিনির কাজেও শীঘ্র ঐরূপ দুর্দ্দশা হইবে! মঃ বঃ সঃ)। সেই সঙ্গে আমাদের ৺রাধাকৃষ্ণ দে মহাশয়ের তূলার ব্যবসায়ের সঙ্কোচ আরম্ভ হইল; একদিকে যেমন তূলা-বাণিজ্যের সঙ্কোচ, অপর দিকে তেমনই অপর বাণিজ্যের প্রসার হইতে লাগিল। এই সময় হইতে ইহাঁর মোকামী ব্যবসায়ের বা চালানীকার্য্যের প্রবর্ত্তন হইল। ইনি এইরূপ ব্যাপারে পণ্য বিনিময় করিয়া কলিকাতা, ভদ্রেশ্বর, মুঙ্গের, সুলতানগঞ্জ, রামনাথপুর, খাগড়িয়া প্রভৃতি স্থানের প্রতিষ্ঠিত মোকাম হইতে সবিশেষ লাভ করিতে লাগিলেন। বাণিজ্য ব্যবসায়ের ক্রমপ্রসারে ইহাঁর ক্রমশই ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

রাধাকৃষ্ণ দে মহাশয়ের দুই পুত্র;—জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রমোহন দে এবং কনিষ্ঠ শিবচন্দ্র দে। ইহাঁর সদ্ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল!—বিধাতৃপ্রসাদে ইনি এক দিকে যেমন অর্থার্জ্জন করিয়াছেন, অপর দিকে পুণ্যকর্ম্মে তেমনই যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। ইনি দশভূজা সিংহবাহিনী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বীয় আবাসের গৌরববৃদ্ধি এবং পবিত্রতা-সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই দেবীর কৃপায় ইহাঁর আবাসে চিরউৎসব! আরও আনন্দময়ীর আনন্দনিকেতন ক্রিয়া-কলাপের অবিরাম স্রোতে আনন্দময়। দে-বংশ এইখান হইতেই দেবাংশে অনুগৃহীত। রাধাকৃষ্ণ দে মহাশয় পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য যেরূপ সদ্ব্যয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের সবিশেষ প্রশংসার্হ। তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১০।১২ হাজার টাকা ব্যয় করেন। অনেক অধ্যাপক পণ্ডিতের বিদায়াদি ব্যাপারে বহু অর্থদান করিয়াছিলেন। ইহাঁর জীবনাবসানে এক মাত্র জীবিত পুত্র——

(৺) শিবচন্দ্র দে পিতৃঐশ্বর্য্যের সহিত পিতৃসদ্‌গুণাবলীর অধিকারী হইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে পিতৃপদানুসরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। উদ্যোগ, চেষ্টা, দয়া, ধর্ম্ম, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সহিত বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকার করায়, পিতৃপ্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের পরিচালনে বেশ সুশৃঙ্খলতার ব্যবস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সৎপরিচালনের গুণে ইহাঁর মোকামী ব্যবসায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; অধিকন্তু ইনি কুসীদ ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করিয়া সবিশেষ লাভবান্ হইয়াছিলেন। ৺রাধাকৃষ্ণ দে মহাশয় শেষাবস্থায় তূলা ব্যবসায়ের সঙ্কোচ করিয়াও, যে অসমর্থ তূলার ব্যবসায়ের রক্ষা সাধন করিয়াছিলেন, শিবচন্দ্র বাবুর আমলে তাহার উচ্ছেদ হইয়া গেল। যাহা হউক, ইনি ব্যবসায় পরিচালনগুণে পিতার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে আয়বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই আয়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধিও হইয়াছিল। অধিকন্তু, জগদ্ধাত্রী পূজা, কার্ত্তিক পূজা ইহাঁর আমল হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। ব্রাহ্মণাদির পোষণ ব্যাপারে দান বৃদ্ধি পাইয়াছিলও যথেষ্ট। ইনি এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী সাধারণের শুভানুষ্ঠানের কার্য্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বারাশতের পথ-প্রতিষ্ঠা করিয়া অনেকের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। ইহাঁর সহধর্ম্মিণী এখনও বর্ত্তমান। ইহাঁর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম—

৺যোগেন্দ্রনাথ দে। ইহাঁর বয়ঃক্রম যখন ১২ বৎসর, সেই সময়ে ৺শিবচন্দ্র দে মহাশয় পরলোক গমন করেন। পরন্তু নগেন্দ্র বাবুর বয়স তখন ৪।৫ বৎসর মাত্র। অতি অল্প বয়সে যোগেন্দ্র বাবুর স্কন্ধে এই সুবৃহৎ পরিবারবর্গ এবং অতুল ঐশ্বর্য্য আরোপিত হইল। এ সময় দুইজন ট্রাষ্টি এবং একজন বিশিষ্ট গোমস্তা ৺কেশবলাল শূর ইহাঁদের বিষয় রক্ষক হয়েন। কেশবলাল শূরের মত বিশ্বস্ত গোমস্তা আমরা আর দেখি নাই। ইনি এক সময় এই সুবৃহৎ ধনীর একমাত্র রক্ষক ও পরিচালকরূপে বস্তুতঃ কর্ত্তার মত হইয়া সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার পর ২।১ বৎসর মধ্যেই যোগেন্দ্র বাবু বিষয় কর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন। ইহাঁর আমলে, পিতৃদত্ত অধিকাংশ মোকামের কার্য্য উঠিয়া গিয়া, কেবল কলিকাতা, ভদ্রেশ্বর, মুঙ্গের, সুলতানগঞ্জ, রামনাথপুর, খাগড়িয়া এই কয় স্থানে মোকাম রহিল; কিন্তু পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত কুসীদ ব্যবসায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক প্রবল করিয়া তুলিয়াছিলেন। অদ্যাপি নগেন্দ্র বাবু ঐ সকল মোকাম এবং দাদার পথানুসারে কার্য্য কর্ম্ম করিতেছেন। যোগেন্দ্র বাবু পিতামহীর শ্রাদ্ধে ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করেন। ইহা ভিন্ন ইনি আরও অনেক মঙ্গলকর কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা অর্থ-বিভ্রাটে স্বীয় আবাস-স্থান বন্ধক রাখিলে, যদিও টাকা দিয়া, বন্ধক রাখিতেন, কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহারা টাকা দিতে না পারিলে, উক্ত টাকা ছাড়িয়া দিয়া, বাড়ী ফেরত দিতেন; এরূপ উদারতার পরিচয় অনেক দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন জল-কষ্টের দেশে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া, কীর্ত্তিমান্ হইয়া গিয়াছেন।

ঋণী ব্যক্তি দেনার জন্য, জেলে যাইতেছে; ইহা শুনিতে পাইলে,

ইনি তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়া, তাঁহার কারামুক্তি বা ঋণমুক্তি বিধানে উদ্যত হইতেন। ইহাঁর আর এক সৎকার্য্য ছিল, লোকতঃ যাহাকে সৎকার্য্য বা সৎকার বলে,—অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য বা দাহ ক্রিয়া অর্থাভাবে সম্পন্ন হয় না, এ অবস্থার কথা শুনিলে, ইনি বড়ই অধীর হইয়া অগ্রে টাকা দিতেন। অনেক দুঃখী লোকের বিবাহে টাকা সাহায্য করিয়া, তাহাদিগের বংশস্রোত প্রবাহিত রাখিবার উদ্যোগ অনুষ্ঠানে চিরোৎসাহী ছিলেন। ৺রাধাকৃষ্ণ দে'র পবিত্র অর্থের সদ্ব্যয় এই মহাপুরুষ দ্বারা যথেষ্ট হইতেছিল; এমন সময় নিষ্ঠুরকাল আসিয়া এই মহাফলকে ভক্ষণ করিয়া বসিল। দরিদ্রের অশ্রুজল অশ্রুতেই শুকাইল; বিগত সন ১৩০২ সালের ৯ই ফাল্গুন ইনি বহুমূত্ররোগের উপসর্গে কার্ব্বঙ্কল বা দুষ্টব্রণ রোগগ্রস্ত হইয়া ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ৺যোগেন্দ্র বাবুর দুই পুত্র শ্রীযুক্ত জহরলাল দে এবং শ্রীযুক্ত পান্নালাল দে। তন্মধ্যে জহর বাবুর এক পুত্র হইয়াছে। জগদীশ্বর ইহাঁদের দীর্ঘ-জীবী করিয়া সুখী করুন; কারণ ইহাঁদের দ্বারা দেশের দীন-দরিদ্র অনেক প্রতিপালিত হইতে পারিবে। যাহা হউক, ৺শিবচন্দ্র দে মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে—যতদিন যোগেন্দ্র বাবু ছিলেন, ততদিন ইনি বিষয়-কার্য্য কিছুই দেখেন নাই। ইহাঁদের ভ্রাতৃসম্মিলন বড়ই অপূর্ব্ব। বাঙ্গালীর ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই এ প্রবাদ ইহাঁদের নিকট পরাস্ত! রামায়ণের রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির ভ্রাতৃমিলনের যে আদর্শ পাওয়া যায়, বস্তুতঃ ৺যোগেন্দ্র বাবু এবং নগেন্দ্রবাবুর স্বভাব সেই আদর্শে গঠিত। নগেন্দ্র বাবু হুগলী কালেজে এফ, এ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। আজ কয়েক বৎসর হইল, দাদার মৃত্যুর পর পাঠ-পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, আপনাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য কার্য্য-কর্ম্ম দেখিতেছেন। ইনিও বিনয়ী, নম্র, দাতা এবং ধৈর্য্যশালী মহাপুরুষ। পবিত্র বংশাবলীর গুণ ইতিমধ্যেই ইহাঁর জীবনে অনেক দেখা দিয়াছে। গোমস্তাদিগের কোনরূপ গলদ বাহির হইয়া পড়িলেও, ইনি তাহা জানিয়াও যেন শুনেন নাই, এইরূপ আশ্চর্য্যভাবে দোষী ব্যক্তিকে অবাধে ক্ষমা করেন। যদি কেহ কাহার যথার্থ দোষ দেখাইয়া দেয়, তাহাও ইনি গ্রাহ্য করেন না! গোমস্তারা দস্তুরী ইত্যাদি বাবে টাকা গ্রহণ করিলে, ইনি বলেন, "উহারা না লইলে, কোথা পাইবে; নচেৎ উহাদের সংসার চলিবে কেন?" পরন্তু ইনি পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সমুদয় কীর্ত্তি এবং কার্য্য-কর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিয়াছেন। গোমস্তাদের না খাওয়াইয়া, ইনি আহার করেন না। যাহা হউক, ইনি এখন এ দেশীয় অনেক ধনীদিগের ধনী, মহাজনদিগের মহাজন। ইহাঁদের পবিত্র টাকা লইয়া, যাঁহারা ব্যবসায় করিয়াছেন, তাঁহারাই ধনী হইয়া উঠিয়াছেন। শুনা যায়, ইহাঁদের টাকার এই একটা মস্তগুণ আছে। নগেন্দ্র বাবুর দুই কন্যা বর্ত্তমান। মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই দে-বংশাবলীকে সুখী করুন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সেদিন সমাজের কোন উচ্চপদস্থ মহোদয় আমাদের সঙ্গে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন; তিনি বলেন,—"এ দেশের অনেকগুলি মাসিক পত্রের কোন একটা স্থির উদ্দেশ্য নাই; উহা পড়িলে এই বুঝা যায় যে, সম্পাদক মহাশয় কোন বিষয়ে সিদ্ধপুরুষ নহেন। উহাঁরা গল্প, পদ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি, যাহা যিনি পান, তাহাই ছাপেন। অথচ ঐ সকল প্রবন্ধের মধ্যে কোন বিষয়ে তিনি "কৃতকর্ম্মা" নহেন। এইজন্য আমাদের সাহিত্য ঠকে। সেই সঙ্গে সমাজ ঠকে! পরন্তু মাসিক পত্রের অন্যান্য দোষের মধ্যে ইহাও একটি মস্ত দোষ!"

আমরাও বলি,—যিনি যে বিষয়ে কর্ম্মী, তাঁহার মুখে সেই বিষয় শুনিতে বড়ই ভাল লাগে। এইজন্য ডিটেক্‌টিভ বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "দারোগার দপ্তর" সমাজের বড়ই প্রিয় বস্তু! এই জন্য কাঁকুড়গাছীর যোগোদ্যানের "তত্ত্বমঞ্জরী"—ইহা ধর্ম্ম-পত্রিকা—যথার্থ যাঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন, এবং ঐ ব্যবসায় লইয়া উন্মত্ত হইয়া আছেন, তাঁহাদের হস্তের লেখা বলিয়াই বড় ভাল লাগে। এই জন্যই "কৃষক" নামক মাসিক পত্রিকা আমাদের বড়ই আদরের দ্রব্য। কারণ "কৃষক" যে বিষয় বলেন, তাহা তাঁহারা হাতে কলমে করিয়া, ফল ফলাইয়া দিতে পারেন। পরন্তু যখন প্রবাসী বাঙ্গালীকে আমরা "বঙ্গভাষার" প্রচার এবং শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে দেখি, তখন বস্তুতঃ আনন্দে অধীর হইয়া পড়ি। এ পক্ষে "প্রবাসী" আমাদের একটি মহৎ কার্য্য করিতেছেন। ইহার ফলে "বাঙ্গালা ভাষার" পাঠক-সংখ্যা নিশ্চিতই বৃদ্ধি হইবে। পরন্তু "প্রবাসী" বঙ্গসাহিত্যের

যথার্থ গৌরবান্বিত পত্র। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কৃষি, শিল্প, কল কারখানার পত্র আমরা এদেশে দুই দশখানা কবে দেখিতে পাইব? “নবপ্রভা” মাসিক পত্রের টাইটেল পেজের ব্লকখানি অতি সুন্দর। উহা যেবার লাল কাগজে ছাপা হয়, তখন মনে হয়, যেন প্রাতঃকালের সূর্য্যোদয় হইতেছে! আবার ঈষৎ সবুজ কাগজে উহা ছাপা হইলে, তখন ঐ সূর্য্যকে চন্দ্রের মত মনে পড়ে,—যেন চন্দ্রের কিরণে বৃক্ষের আঁধারে নদীতীরে একটি স্ত্রীলোক দুইটি সন্তান লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভিষক-দর্পণ ডাক্তারি কাগজ, ইহার কথা বিগত মাসে বলিয়াছি; পরন্তু চিকিৎসক ও সমালোচক ইহার ছোট ভা'য়ের মত। চিকিৎসক ও সমালোচক এ দেশের আগাছা-পত্রের মত উদ্দেশ্যহীন পত্র নহে; ইহাও সমাজের একটা মস্ত উদ্দেশ্য লইয়া প্রকাশিত হইতেছে। বস্তুতঃ বাঙ্গালায় এই কয়েকখানি ভাল কাগজ ভিন্ন আর কোন ভাল কাগজ আছে কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। নচেৎ অধিকাংশ মাসিক পত্রের বাক্যবীরগণ গ্রাহকের চোখে বালি দিয়া বাজে গল্প বলিয়া মোহ বিস্তার করিয়া থাকেন। অতএব ঐ শ্রেণীর মাসিক পত্রের সম্পাদক মহাশয়দিগকে করযোড়ে বলি যে, যিনি যে কার্য্য করেন, তিনি সেই বিষয়ের শিক্ষা ও অনুশীলনের উদ্দেশ্যে পত্রিকা বাহির করুন। ইহাতে নিশ্চয়ই আমাদের গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর সাহায্য করিবেন।

বাঙ্গালা-ভাষা পূর্ব্বে “সেবক শ্রী” “আজ্ঞাকারী” পর্য্যন্ত ছিল। তৎপরে ইংরাজ-রাজের সাহায্যেই ইহার অনেক উন্নতি হইয়াছে। এখনও তিনি সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন; তবে বাজে গল্প এবং ছড়াতে তাঁহারা অর্থ দিবেন না। কাজের কথা বল, প্রকৃত কাজ কর—সিদ্ধিলাভ হইবে। এই জন্যই “ভিষক্ দর্পণ” রাজার সাহায্য পাইয়াছেন; এই জন্যই “মহাজনবন্ধুকে” রাজা দয়া করিয়া, সাহায্যে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং করিবেন। রাজার কার্য্য রাজা করিবেন, আমাদের কার্য্য আমরা করিব; পরন্তু এ সঙ্গে সাধারণ গ্রাহক মহোদয়দিগেরও একটী কর্ত্তব্য আছে; তাঁহারা কখনই ঐ সকল বাজে মাসিকের গ্রাহক হইবেন না এবং আত্মীয় স্বজনকে ঐ কার্য্য করিতে দেখিলে ঘৃণা করিবেন। ছড়া এবং গল্পের কাগজ বলিয়া উপহাস করিবেন। পুত্র কন্যা, ভাই ভগিনী, আত্মীয় স্বজন, যাঁহাকে-তাঁহাকে তাঁহারা কেবল “কাজের কাগজের” গ্রাহক হইতে বলিবেন। ছি! পয়সা খরচ করিয়া গল্প শুনিতে আছে কি!!

মহাজনবন্ধু, মাসিকপত্র।
২য় খণ্ড; ২য় সংখ্যা; চৈত্র, ১৩০৮ সাল।

শর্করা-বিজ্ঞান।

লেখক—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—M. A. M. R. A. C. and F. H, A. S.

অষ্টম অধ্যায়—চাষের নিয়ম।

ইক্ষু জন্মাইতে হইলে গভীরভাবে চাষ দেওয়া আবশ্যক। আলু উঠাইবার পরেই যদি ইক্ষু লাগান হয়, তাহা হইলে মৈ দিয়া জমি সমতল করিয়া, দ্বিপক্ষ লাঙ্গল দ্বারা ভিলি প্রস্তুত করিয়া লইয়া, ইক্ষু লাগান চলিতে পারে। কলাই, সর্ষপ প্রভৃতি ফসল জন্মাইবার পরে ইক্ষুর জন্য চাষ করিতে হইলে, মাঘ ফাল্গুন মাসে, কালবিলম্ব না করিয়া উপর্য্যুপরি যতবার চাষ দেওয়া যাইতে পারে, ততবার চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু মাঘের শেষে বৃষ্টি না হইলে, কলাই বা সর্ষপ উঠাইবার পরেই জমিতে লাঙ্গল দেওয়া দুরূহ হইয়া উঠে। অগ্রহায়ণ মাসের পর হইতে যখনই বৃষ্টি হইবে, তখনই ধান্যের জমি বা অন্য যে কোন জমি পতিত অবস্থায় থাকুক না কেন, লাঙ্গল দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইলে ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে আকের কলম লাগাইবার পক্ষে উপযোগী হইয়া থাকিবে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জমি প্রস্তুত করিয়া শ্রেষ্ঠ চর্ব্ব্যজাতীয় কোন ইক্ষু লাগাইতে পারিলে একটী সুবিধা হয়,—পর বৎসর দুর্গোৎসবের পূর্ব্বেই ঐ ইক্ষু প্রস্তুত হওয়াতে, উহা অপেক্ষাকৃত অধিক দামে বিক্রয় করিতে পারা যায়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ইক্ষুর কলম লাগাইলে একটু ক্ষতি হয়,—শীতের কয়েক মাস গাছ ভাল বাড়িতে না পাইয়া গাঁইট গুলি অতি নিকট নিকট জন্মে এবং ফাল্গুনে লাগান আকের যেমন তেজ হয়, শীতের পূর্ব্বে লাগান আকের কখনই সেরূপ তেজ হয় না। একারণ মোটের উপর ধইঞ্চা লাগাইয়া, পরে আলু লাগাইয়া, তৎপরে ইক্ষু লাগানই প্রশস্ত নিয়ম।

মারীচি দ্বীপে যেরূপ গর্ত্তের মধ্যে বা খানার মধ্যে ইক্ষুর কলম লাগায়, তদপেক্ষা বঙ্গদেশে যেরূপভাবে সমতল জমিতেই জুলি কাটিয়া তন্মধ্যে ইক্ষু বসানর নিয়ম আছে, তাহাই ভাল পদ্ধতি। তবে কোদালি দ্বারা জুলি কাটাই হউক আর দ্বিপক্ষ লাঙ্গল দ্বারাই জুলি কাটা হউক, জুলির নিম্নে তিন ইঞ্চি আল্গা মাটীর উপর কলম বসাইয়া উহার উপর আর তিন ইঞ্চি মাটী চাপাইয়া দিয়া, পরে জুলির মধ্যে জলদিয়া কলম সিক্তাবস্থায় রাখিতে হইবে। গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া কলমের অঙ্কুর বাহির করিয়া লইয়া পরে উক্ত নিয়মে কলম বসাইলে অতি সত্বর গাছ বাহির হইয়া পড়ে।

কলম বসাইয়া জল দিবার এক সপ্তাহের মধ্যেই জমি একবার কোদালি বা “হাণ্টার-হো” দ্বারা অথবা অন্য প্রণালীতে আল্গা করিয়া দিতে হইবে, নতুবা জমির উপর চাপ বাঁধিয়া অঙ্কুর বাহির হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিবে। জমি আল্গা থাকিলে, যাহাতে ‘ট্যাঁক” বাহির হইয়াছে এরূপ কলম লাগাইতে পারিলে ফাল্গুন মাসে জল সেচনের এক সপ্তাহের মধ্যে গাছ বাহির হইয়া পড়ে। গাছগুলি অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ উচ্চ হইলে, ছাই ও সোরা (বিঘাপ্রতি প্রত্যেক দ্রব্য একমণ) মিলিত করিয়া, জমিতে ছিটাইয়া দিয়া, আর একবার জল সেচন করিতে হইবে। এই জল সেচনেরও পরে এক সপ্তাহের মধ্যে জমি আর একবার ‘হাণ্টার-হো’ দ্বারা আল্গা করিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ৪।৫ বার জল সেচনের আবশ্যক হইতে পারে। খড়ি আক প্রভৃতি অচর্ব্ব্য জাতীয় আক লাগাইয়া দিয়া, বৈশাখ মাসের প্রথমে আর একবার মাত্র জল দিলেই যথেষ্ট হয়। জল যদি ৫ ফুটের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা হইলে দোন ব্যবহার করাই ভাল। যদি ৮ ফুটের নিম্নে থাকে তবে সিউনী চালাইয়া জল সেচন করা উচিত। যদি ১০।১৫ হাত গভীর কূপ হইতে জল উঠাইয়া জল সেচনের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, “মোটের” বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। দোনের দ্বারা একব্যক্তি প্রত্যহ তিন বিঘা জমির জল উঠাইতে পারে। সিউনিদ্বারা চারি ব্যক্তি (দুইজন পালাপালি করিয়া) প্রত্যহ অর্দ্ধ বিঘা জমির উপযুক্ত জল উঠাইতে পারে। জমিতে জল চালাইয়া দিবার জন্য পৃথক এক ব্যক্তির আবশ্যক। তবে সিউনী ব্যবহার করিতে গেলে যে দুই ব্যক্তি সিউনী ছাড়িয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে যাইবে, তাহারাই জল জমিতে চালাইয়া দিতে পারে। দোন চালাইতে হইলেও যে ব্যক্তি

ক্ষেত্রে জল চালাইবে, সে ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে দোন চালাইলে, পালাপালি করিয়া কার্য্য চলিতে পারে।

“বালদেব-বালতি” (চিত্রে দেখ) নামে একপ্রকার ডবলদোন কাড়পুরের পরীক্ষা-ক্ষেত্রের কারখানায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪ ফুটের মধ্যে জল থাকিলে এই কলের দ্বারা জল উঠানতে বিলক্ষণ লাভ আছে।

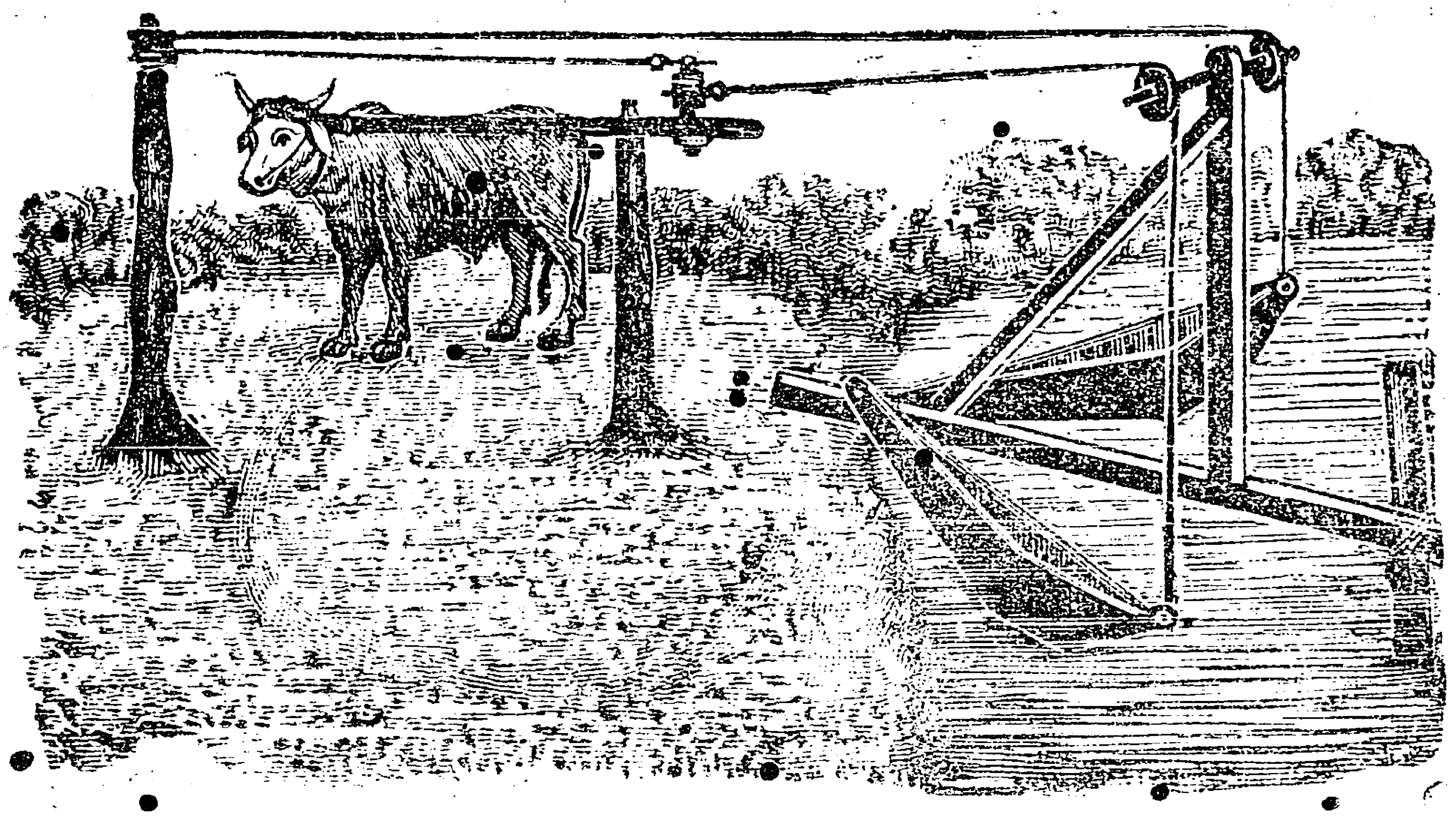

যদি ধইঞ্চা লাগাইয়া আলু জন্মাইয়া আর ৫।৭ মণ করিয়া এপেটাইটের গুঁড়া ছিটাইয়া, ইক্ষু জন্মান যায়, তাহা হইলে বিঘা প্রতি একমণ ছাই ও একমণ সোরা ভিন্ন আর কোন সার ব্যবহার করা আবশ্যক করে না। তবে এপেটাইট ও সোরার যোগাড় না হইলে বিঘা প্রতি ৫।৭ মণ করিয়া রেড়ির খোল গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করা আবশ্যক। সারের জন্য বিঘা প্রতি ১০।১২ টাকা ব্যয় করা উচিত। শিবপুর ক্ষেত্রে খড়ি-আকের একমণ জমিতে গত বৎসর (অর্থাৎ ইং ১৯০০—১৯০১ সালে) একার প্রতি ১০/ মণ, (কাশিপুর চিনির কলে যে হাড়ের-গুঁড়া-কয়লা ব্যবহারানন্তর ফেলিয়া দেওয়া হয়) সেই কয়লা, এবং ৫/ মণ সোরা, সাররূপে ব্যবহৃত হয়, এবং অপর একখণ্ড জমিতে একার প্রতি ২০/০ মণ রেড়ির খোল ব্যবহৃত হয়। প্রথমোক্ত জমিখণ্ড হইতে একার প্রতি ৪৮৩/০ মণ ইক্ষুদণ্ড ও ৩৮/০ মণ গুড় পাওয়া যায়। এই ইক্ষুদণ্ড হইতে শতকরা ওজনে ৫৯ ভাগ রস বাহির হয়। যে জমি খণ্ডে রেড়ির খোল ব্যবহৃত হয়, উহা হইতে একার প্রতি ৪০৫ মণ ইক্ষুদণ্ড ও ৩৭ মণ গুড় প্রস্তুত হয় এবং শতকরা ওজনে ইক্ষু হইতে ৫৬ ভাগ রস বাহির হয়। গত মাঘ মাসের বৃষ্টির পরেই হাড়ের কয়লার গুঁড়া ও সোরা যে জমিতে

সাররূপে ব্যবহৃত হয়, ঐ জমির ইক্ষু কাটা হয়। ঐ সময়ে ইক্ষুগুলি সম্পূর্ণ পাকে নাই এবং জমিতেও তখন বিলক্ষণ রস ছিল। আর একমাস বিলম্ব করিয়া কাটিলে এই জমি হইতে আরও অধিক গুড় পাওয়া যাইত। রেড়ির খোল যে জমিতে সাররূপে ব্যবহৃত হয়, ঐ জমির আর একমাস বাদে (ফাল্গুনমাসে গত বর্ষের) সম্পূর্ণ পক্কাবস্থায় কাটা হইয়াছিল। হাড়-সারের উপকারিতা রেড়ির খোল অপেক্ষাও যে কিছু অধিক এই পরীক্ষা দ্বারা এরূপ উপলব্ধি হয়। অবশ্য উহার সঙ্গে সোরা ছিল বলিয়া।

(ক্রমশঃ)

চিনির উপকারিতা।

(লেখক,—শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগচী।)

বহু বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার গিলবার্ট প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, কেবল কার্ব্বহাইড্রেট দ্বারাই শূকর শাবকের দেহে মেদ সঞ্চিত হইয়া থাকে। ডাক্তার ফিঙ্ক প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পর্ব্বতারোহণ সময়ে কার্ব্ব-হাইড্রেট খাদ্য গ্রহণ করিলে পৈশিক অবসাদ হয় না। পোটন ফোকার প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, পৈশিক বিশ্রামের সময় যবক্ষার-জান যুক্ত খাদ্যই অধিক আবশ্যক হয়, কিন্তু পৈশিক পরিশ্রমের সময়ে যবক্ষার-জান-বিহীন খাদ্যই আবশ্যক হইয়া থাকে। অতএব বিশ্রামের সময় (যবক্ষারজান যুক্ত খাদ্য) মাংসাদি ভোজন করিয়া তৎপরে কার্য্য করার সময়ে ভাত (যবক্ষারজান বিহীন খাদ্য) ইত্যাদি শ্বেত সার ঘটিত খাদ্য ভক্ষণ করিতে হয়। জাপানে কিন্তু এই নিয়মে আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভাত সহজে পরিপাক হয়, অথচ তাহাতে শ্বেতসার যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। দেহ মধ্যে এই শ্বেত সার হইতে এক প্রকার চিনি (Polysacep arides.) প্রস্তুত হয়।

যাহা হউক এ দেশে অনেকের দেহ দেখিতে স্থূল হয় বটে, কিন্তু দেহে তাদৃশ বল থাকে না। এ সকল ক্ষেত্রে এই দেখা যায় যে, তাহারা ভাত ইত্যাদি অন্নাহার দ্বারা দেহ স্থূলকৃত করিয়াছে বটে কিন্তু উহারা উপযুক্ত পরিমাণে মাংস বা আণ্ডলালিক খাদ্য গ্রহণাভাবে ঐরূপ ব্যাধিগ্রস্ত বা দুর্দ্দশান্বিত হইয়াছেন।

১৮৯৩ খৃঃ মোঁসো মহোদয় মনুষ্যদেহ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, খাদ্যসহ শর্করা থাকিলে পেশীর অপকর্ষতা অল্পই হইতে পারে। পরিশ্রান্ত পেশী যখন কার্য্যাক্ষম হয় তখন শর্করা খাদ্য দিলে অল্প সময় মধ্যে সেই পেশী পুনর্ব্বার কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

১৮৯৫ খৃঃ বার্লিনের ষ্টাফ সার্জ্জন স্কাম্বার্গ মহোদয় অনেক মনুষ্য পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে পৈশিক শক্তি সম্বন্ধে সবল দুর্ব্বল প্রায় সকল লোকই ছিল। তাহাতে শেষ মীমাংসা এই হয় যে, যাহাদের পৈশিক শক্তি কার্য্য করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের যদি ৩০ গ্রাম চিনি খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টা কিম্বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরেই সে পুনর্ব্বার পরিশ্রম করিতে সক্ষম হয়। চিনি অল্প সময় মধ্যে শোষিত হইয়া পেশীতে কার্য্য করার শক্তি সঞ্চার করে। অতএব অল্প পরিমাণ খাদ্যে অধিক ফল পাওয়া যায়। চিনি স্নায়ুমণ্ডল দিয়া কার্য্য করিয়া পেশীতে কার্য্য করার শক্তি সঞ্চার করে। কাজেই পরিশ্রম জনিত অবসাদ দূরীভূত করে। পরন্তু আরও অনেকে এইরূপ পরীক্ষা করিয়া উক্ত ডাক্তার স্কাম্বার্গের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন।

রুট নামক এক মহোদয় লিখিয়াছেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইক্ষুর আবাদ স্থল উৎকৃষ্ট; কেন না, শ্রমজীবীরা যখন ইক্ষুক্ষেত্রে পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন ইক্ষু-রস পান করিয়া পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষম হয়। পরন্তু ইক্ষু যে কেবল সুমিষ্ট খাদ্য তাহা নহে। উহাতে পুষ্টিকারক গুণও যথেষ্ট আছে। তাই অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা ইক্ষুক্ষেত্রের শ্রমজীবীরা হৃষ্ট পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ। অধিকন্তু প্যারিশের ক্যাব কোম্পানী অশ্বকে চিনি খাইতে দিয়া থাকেন। ইহার ফলে অন্যান্য স্থানের অশ্ব অপেক্ষা তাঁহাদিগের অশ্ব অধিক সুপুষ্ট এবং কার্য্যক্ষম।

ডচ আরমী সার্জ্জন সুমাত্রায় পরীক্ষা করিয়াছেন যে, সৈন্যদিগের দীর্ঘ পথ অতিক্রম সময়ে যদি তাহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি খাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই সময়ে সৈন্যগণ পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে না।

১৮৯৭ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে জর্ম্মণ পার্লিয়ামেণ্টে সৈন্যদিগের পক্ষে চিনি খাদ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা এবং পরীক্ষার ফলে স্থির হয় যে, সৈন্যদিগের দৈনিক রীতিমত খাদ্য ব্যতীত প্রত্যেককে প্রত্যহ ৬০ ড্রাম অর্থাৎ প্রায় এক ছটাক চিনি খাইতে দিতে হইবে। এখনো এই নিয়ম বজায় রহিয়াছে। ইহার ফলে সৈন্যদের স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পরন্তু ফরাসী

দেশেও এই নিয়ম আছে যে, শান্তির সময়ে প্রত্যহ সৈন্যেরা ১৩॥০ ড্রাম পরন্তু জল যুদ্ধের সময়ে ২১ ড্রাম এবং স্থল যুদ্ধের সময় ৩০ ড্রাম পর্য্যন্ত চিনি খাইতে পাইবে। অধিকন্তু ইংরেজ সৈন্য প্রত্যহ প্রতিজনে ৩৭ ড্রাম চিনি পাইয়া থাকে।

ক্লান্তি দূর করিয়া পরিশ্রম-ক্ষম করিবার জন্য ব্রাণ্ডির পরিবর্ত্তে শর্করা ব্যবহার করিবার প্রথাও কোন কোন সমাজে প্রচলিত আছে। যে যে সমাজে সুরাপান ধর্ম্মবিরুদ্ধ তথায় দেখিতে পাওয়া যায় মিষ্টদ্রব্য এবং সুমিষ্ট ফল ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব চিনির উপকারিতা সম্বন্ধে এগুলিও একটী সুন্দর উদাহরণ তাহাও স্থির সিদ্ধান্ত। অধিকন্তু প্রমাণ স্বরূপে যে সকল দৃষ্টান্ত উপরে প্রকটিত হইল, তাহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শর্করা সেবনে দৈহিক গুরুত্ব, স্থূল এবং সুস্থ দীর্ঘ সবল দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চা।

প্রথম অধ্যায়—ডাল কাটা।

হেমন্তের শেষভাগে আসামাদি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়। তখন চা গাছের আর কচি পাতা জন্মায় না। সুতরাং আর পাতা ছিঁড়া হয় না। আসাম, কাছাড় ও শিলিগুড়ি অঞ্চলে ডিসেম্বরের ১০ই তারিখ পর্য্যন্ত এবং দার্জিলিঙ কুমাউন প্রভৃতি অঞ্চলে নভেম্বরের শেষভাগে পাতা ছিঁড়া বন্ধ হয়। তখন গাছের ডালগুলি ছাঁটিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে আগামী বসন্ত ঋতুর আরম্ভে অধিক পরিমাণে নূতন পাতা হইয়া থাকে। এইরূপ ডাল কাটাকে দেশ বিশেষে "কলম দেওয়া" বা "কলম কাটা" বলে। এইরূপ ডাল না কাটিলে গাছে আগামী বৎসর তত কচি পাতা হইবে না; সুতরাং চা-ও অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারা যাইবে না। ফুকা দিয়া দুধ বাহির করা এবং এই গাছ ছাঁটিয়া পাতা বৃদ্ধি করান এ সকল বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়িদিগের আবিষ্কার!!

সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে আরম্ভ করিয়া জানুয়ারি মাসের শেষে অথবা ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে ডাল কাটা শেষ হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে জল হইলে নূতন ডগা ও পাতা বাহির হইতে থাকে। বাগান বিশেষে ফেব্রুয়ারির শেষ অথবা মার্চ্চ মাসের আরম্ভে পাতা তোলা আরম্ভ হয়। পরন্তু পাতা তোলার কথা পরে বলিব।

এক শত একার বা তিন শত বিঘার চা-বাগানকে ক্ষুদ্র বাগান বলিতে হয়। এই ভূমিতে অনূ্যন ১৬০০০০ চা-গাছ জন্মিতে পারে। পরন্তু এক শত জন কুলি লইয়া এরূপ বাগান করা যায়। অধিকন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চা-র কলম কাটিয়া দিতে হয়। ১ লক্ষ ৬০ হাজার গাছে ১০০ জন কুলির মধ্যে ৩০ জনকে লইয়া অবশ্য রবিবার বাদে চল্লিশ দিনের মধ্যে উক্ত সমুদয় গাছের ডালগুলি কাটিয়া দিতে হয়। এই হিসাবে যত বড় বাগান হইবে, ততই কুলি রাখা চাই। চা আবাদের সমুদয় বিষয়ই নিয়ম বদ্ধ। ক্রমেই তাহা এই প্রবন্ধে জানিতে পারিবেন।

কলম কাটার সময় কয়লা প্রস্তুতির জন্য লোক নিয়োগ করিতে হয়। এই সময় জীর্ণ গৃহাদি সংস্কার না করিলেও চলে না। যে স্থানে গাছ মরিয়া গিয়াছে, সেই শূন্য স্থান গুলিও এখন পূরণ করিতে হয়। এইরূপ নানা কাজে লোক দিয়া এক শত কুলির মধ্যে ৩০ জনকে ডাল কাটিতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহাতে আবার কঠিন প্রকার ডাল স্ত্রীলোকে কাটিতে পারে না। যাহা হউক প্রত্যহ ১ জন কুলিতে যাহাতে ১৩৩ গাছের ডাল কাটিতে পারে সে বিষয়ে ম্যানেজারের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু গাছ বড় হইলে এক জন কুলিতে ১৩৩টা গাছের ডাল কাটিতে পারে না, সে পক্ষেও অবশ্য ম্যানেজার কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন! আমি এরূপ চা'গাছ দেখিয়াছি যে তাহার ব্যাস ৮ হস্ত এবং পরিধি ২৫ হস্ত হইবে।

চা'গাছ ছাঁটিয়া না দিলে ১০।১২ হস্ত কিম্বা ততোধিক উচ্চ হয়। এত উচ্চ হইলে পাতা ছিঁড়া অসম্ভব; অতএব ইহাকে ছাঁটিয়া বা ডাল কাটিয়া গাছটি নীচু রাখিতে হয় যেন অনায়াসে পাতা ছিঁড়িতে পারা যায়; অধিকন্তু গাছটি পরিধিতে যত বাড়ে ততই ভাল, কারণ ঝাকড়াল গাছের পাতা বেশী হয়; চা-গাছের পাতা লইয়া ব্যবসায় কিনা! কাজেই পাতা বাড়িলেই পয়সা বাড়ে।

প্রথমতঃ নূতন বাগিচায় ৩।৪ বৎসর চা-চাষে লাভ হয় না, কারণ সে সময় গাছ ছোট থাকে, পাতাও ছিঁড়া হয় না। যদিও দ্বিতীয় বর্ষে পাতা ছিঁড়া হয়, তাহা অল্প; পরন্তু ২।১ বৎসরের গাছগুলিতে "আগল কম" দিতে হয়। দুই হস্ত পরিমিত একটী কাঠীতে মাপ করিয়া তদূর্দ্ধ যাহা হয় গাছের সেই আগাটী কাটিয়া ফেলিতে হয়; ইহাকেই "আগল কম" বলে। অপিচ

এই অবস্থায় গাছের অন্য কোন ডাল কাটিতে নাই। কেবল ঐ আগল কম করিয়া দিলে গাছের চারিদিকে ডাল বাহির হইতে থাকে। প্রথম বৎসর কেহই গাছের পাতা ছিঁড়ে না। দ্বিতীয় বর্ষে শেষে অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষারম্ভে যদি গাছগুলি দুই হস্তের উপর উঠে, তাহা হইলে ঐ মাপের উপর পাতা ছিঁড়া হয়। তৃতীয় বর্ষে গাছগুলিকে ২॥০ অথবা ২৸০ হস্ত উচ্চ করিয়া ডাল কাটা কর্ত্তব্য; পরন্তু রোগাক্রান্ত এবং সরু ডালগুলি পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। কিন্তু সাবধান! বেশী পরিষ্কার করিতে গিয়া যেন অনেক ভাল ডাল কাটা না পড়ে।

করেন্সি।

এই আপীশ হইতে নোট বা টাকা কিম্বা স্বর্ণমুদ্রা, তাম্রের পয়সা ইত্যাদির পরিবর্ত্তন দেওয়া এবং লওয়া হয়। অতএব মহাজনদিগের সঙ্গে এই আফিশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

বাঙ্গালায় এক টাকাকে যেমন ১ তোলা বলে; সেইরূপ ইংরাজীতে ১ টাকাকে ১ ট্রয় বলা হয়। ১ ট্রয় বা ১ টাকার ওজন ১৮০ গ্রেণ। অতএব ১ আধুলি ৯০ গ্রেণ, ১ সিকি ৪৫ গ্রেণ এবং ১ দুয়ানী ২২॥০ গ্রেণ। যাহা হউক, পুরাতন টাকা যদি এই আফিশে প্রতি টাকায় ৩·৬ গ্রেণ কম অর্থাৎ ১৭৬৪ গ্রেণ পর্য্যন্ত ওজন হয়, তাহা হইলেও উক্ত টাকার পরিবর্ত্তে ষোল আনা পাওয়া যায়। অথবা উহা বাজার চলন টাকা (অল্প ঘসা টাকার কথা হইতেছে) বলিয়া সকলে লইতে পারেন। ইহা ছাড়া ভাল টাকা যদি খইয়া গিয়া একআনা কমিয়া যায়, তাহা হইলেও গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর "দয়া করিয়া" উহা বদ্‌লাইয়া দিতে পারেন অথবা না দিতেও পারেন, কারণ তাহা অনুগ্রহের উপর নির্ভর! তাহা বলিয়া উক্ত কমি টাকা সাধারণে আইন মতে লইতে বাধ্য নহে। পরন্তু যে টাকা ওজনে শতকরা দুইভাগের অধিক কমিয়া গিয়াছে, তাহা এই আফিশে ধরা পড়িলে কাটা হয় এবং তাহাতে কোন কৃত্রিমতা না থাকিলে, উক্ত কাটা টাকার মূল্য এইরূপ হারে ধরিয়া দেওয়া হয় যথা,—

পোনের আনার কিছু উপর হইলে ১৲ টাকা দেওয়া হয়। চৌদ্দ আনা হইতে ১৫ আনার মধ্যে হইলে ৸৵০ আনা দেওয়া হয়; তের

আনা হইতে চৌদ্দ আনার মধ্যে হইলে ৸৴০ আনা ধরিয়া দেওয়া হয়। ঐরূপ বার আনা হইতে তের আনার মধ্যে হইলে ৸০ আনা ধরিয়া দেওয়া হয়। পরন্তু বার আনার কম হইলে, তাহা কাটিয়া অধিকারীকে ফেরত দেওয়া হয়। স্মরণ রাখিবেন, এ সকল ভাল টাকা ওজনে হাল্‌কা হইলে এই ব্যবস্থা করা হয়। নচেৎ "আরকী" হাল্‌কা টাকা চালাইতে চেষ্টা করিলে এবং আরকী টাকা প্রস্তুত করিবার সাজ-সরঞ্জম প্রাপ্ত হইলে, তাহার দশ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

শুনা যায়, উগ্র নাইট্রিক এসিড কাচ কিম্বা পাথর বাটীতে কিছু ঢালিয়া তাহাতে জুয়াচোরেরা (২।৩ সেকেণ্ড মাত্র) টাকা ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ উহা তুলিয়া লইয়া উক্ত এসিডে জল ঢালিয়া দেয় তৎপরে উহার ভিতর একটা পয়সা ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত পয়সার গাত্রে নাকি রৌপ্যাণু আসিয়া জমিয়া গিয়া পয়সাটী রৌপ্য মণ্ডিত হয়। তাহার পর এই পয়সার গাত্র হইতে রৌপ্য চাঁচিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। উগ্র নাইট্রিক এসিড এতই তীব্র যে, ২।১ সেকেণ্ড মাত্র টাকাটি উহাতে ফেলিলেই নাকি প্রায় দেড় আনা দুই আনা রূপা বাহির হইয়া, তাম্রখণ্ডে আসিয়া থাকে। অধিকন্তু যে টাকাটি ইহাতে ফেলা হয়, তাহার বর্ণ অতি বিশ্রী হইয়া পড়ে,—ইহাকেই "আরকী" টাকা বলে; ইহা দেখিলেই সহজে চেনা যায়। আরকী টাকা কিন্তু এক পৃষ্ঠা এবং দুই পৃষ্ঠার আছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহা ভিন্ন যখন টাকার ধার পয়সার মত মসৃণ ছিল, তখন জুয়াচোরেরা উক্ত ধার চাঁচিয়া বা ঘসিয়া রূপা বাহির করিয়া লইত, এখন সে পক্ষে কাঁকর কাটা হইয়াছে, কাজেই উহার ভিতর আর জুয়াচুরি চলে না, তাই এখন পাপিষ্ঠেরা টাকার ভিতর মহারাণীর মস্তিষ্কের উপরে স্থানটা চাঁচিয়া লয়; মহাজনদিগের ক্যাসিয়ারেরা ইহাকে "কোড়াঝালা" টাকা বলে। অর্থাৎ এদেশীয় অনেক দুঃখী লোকেরা সন্তানাদিকে টাকার কোড়া করিয়া, উহার ভিতর সূতা দিয়া গাঁথিয়া গলায় পরাইয়া দেয়। তৎপরে অর্থের অনটন হইলে, উক্ত কোড়া কর্ম্মকারের দোকান হইতে ভাঙ্গিয়া দিয়া টাকাটি খরচ করে। কর্ম্মকারেরা কোড়া কাটিয়া দিলেও, উহার ঝালার দাগ থাকে। পরন্তু এই সুযোগে জুয়াচোরেরা কোড়াঝালা ছিল বলিয়া উহা হইতে রূপা চাঁচিয়া লইয়া, উহা বাজারে চালাইয়া দেয়। এরূপ চালানও অবৈধ—নিয়ম বিরুদ্ধ; ইহার জন্য

রীতিমত দণ্ড হইতে পারে। আরো শুনা যায় আজকাল নাকি ইলেক্ট্রোপ্লেট দ্বারা টাকার রূপা বাহির করা হইতেছে! নোট জালের মত টাকাও নাকি জাল হয়, জাল টাকা ধরা পড়ে,—ঐ টাকার কাঁকর কাটা দাগ দেখিয়া, জুয়াচোরেরা টাকার আকৃতি অবিকল করিতে পারিলেও, কিন্তু টাকার ধারে ঐ কাঁকর কাটার "কায়দা" জাল হইবার উপায় নাই; কারণ উহা হাতের লেখার মত! প্রত্যেক হস্তের লেখা যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তাহা লেখা দেখিলেই জানা যায়, উহাও তদ্রূপভাবে জানা যায়। জাল করা টাকাকে "মেকি" টাকা বলে। ইহা করিলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠান হয়। ভারতবর্ষের কোষাগারসমূহে প্রতিবৎসর গড়ে কুড়ি হাজার মেকি টাকা এবং দেড় লক্ষাধিক হাল্‌কা টাকা ধরা পড়িয়া কাটা হইয়া থাকে। বঙ্গের মহাজনেরা কিন্তু করেন্সির মত করিয়া টাকা বাছিয়া ব্যবহার করেন। ইহা শুভ লক্ষণ! বিশেষতঃ টাকার বিষয়ে সকলেই সেয়ানা। তবু করেন্সির সবিশেষ নিয়মাবলীটি সাধারণকে শুনাইয়া রাখা হইল।

বীরভূমে চিনির কারখানা।

বিগত কার্ত্তিক মাসে শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভুজঙ্গভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বীরভূমের চিনির কারখানা সম্বন্ধে "চলিসার" বিষয় যাহা বলিয়াছেন, ঐ চলিসাতে আমরা ৮।১০ মণ গুড় রাখিয়া থাকি। অবশ্য ইহা বীরভূমের ওজন। আমাদের দেশেও শান্তিপুরের মত "কাঁচি" ওজন জানিবেন—অর্থাৎ ৬০শিক্কায় মণ হয়—পরন্তু আপনাদের কলিকাতার মণ ৮০ শিক্কায়; এই জন্য আমাদের ৪ মণ আপনাদের ৩ মণ হয়। পরন্তু কলিকাতার ১ মণ দ্রব্য এখানে আনিলে, আমাদের এক মণ এগার সের হয়।

এ প্রদেশে আমরা দুই তিন পুরুষ হইতে এই চিনির কার্য্য করিতেছি। যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে বলিতে পারি যে, কাঁচি খুব নীচু ২।০, ২।৵০ হইতে খুব উচু বড় জোর ৩॥০ টাকা ৩।৶০ আনা পর্য্যন্ত আমরা গুড়ের মণ দেখিয়াছি। পূর্ব্বে এ প্রদেশে কালীপুর, মল্লিকপুর, রাইপুর এবং রাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এই শ্রেণীর কাঁচাচিনির ('র' সুগারের) কারখানা অনেক ছিল। এখন কালীপুরে ৫টা (পূর্ব্ব বৎসর ছিল ১০ টা,) মল্লিকপুরে ৩টা, রাজগঞ্জে ২টা এবং রাইপুরে ঠিক বলিতে পারি না; বোধ হয়, ২।৫ টা আছে;—পাঁচটার বেশী কিছুতেই হইবে না।

প্রত্যেক কারখানায় অন্ততঃ ৮।১০টা চলিসা করিতে হয়। অপেক্ষাকৃত মোটা দড়ির জাল, নলের মত করিয়া;—এই দড়ির নলের ভিতর গুড় পূরিয়া দিয়া, তাহাকে ঘরের এদিকে একটা বাঁধন এবং ঘরের অপরদিকে একটা বাঁধন দিয়া রাখা হয়, এই বাঁধনের দুই মুখে কাষ্ঠ খণ্ড দেওয়া থাকে, তাৎপর্য্য এই যে ইহা ঘুরাইয়া দড়ির জালের নলে পাক দিয়া দিতে হয়। অর্থাৎ গামছা নিংড়াইবার মত করিতে হয়। পরন্তু রসটা ঘরের মেজের পড়ে বলিয়া এবং এক ঘরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে এইরূপ ৮।১০টা চলিসা রাখিতে হয় বলিয়া, প্রত্যেক চলিসার নিম্নে এক একটী নর্দ্দামা বিশেষ—ইহা গুড়ের নর্দ্দামা ভিতরটী বিলাতী মাটী দিয়া পরিষ্কার করা, আবার গোয়াল ঘরের গোমূত্র যেমন নর্দ্দামা দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে, পরন্তু এইরূপ গোমূত্র যথায় আসিয়া পড়ে, তথায় যেমন একটা গর্ত্ত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাও সেইরূপ গুড়ের রস পরিখা বা নর্দ্দামা দিয়া যথায় আসিয়া জমে; তথায় একটা বিলাতী মাটি দিয়া পরিষ্কৃত গর্ত্ত করা হয় জানিবেন। মোটামুটি-ভাবে চলিসার বিষয় এই বুঝিবেন।

তৎপরে চলিসাতে যে ৫ মণ গুড় দেওয়া হয়, উহার রস ঝরিয়া শুকাইয়া শক্ত হইলে, তখন উহা চলিসা হইতে নামাইয়া রৌদ্রে রাখিয়া, মুগুর দিয়া পিটিয়া চিনি করিয়া বস্তাবন্দী করা হয়। তাহার পর, সেই গর্ত্তের মধ্যে যে রস পাওয়া যায়, উহা লইয়া বড় বড় কটাহে করিয়া জাল দিয়া, পুনরায় গাঢ় গুড় করিয়া শীতল হইলে, এই গুড় আমরা নাদে রাখিয়া পাটা শেওলা চাপা দিয়া রাখি এবং নাদের তলদেশের ছিদ্র খুলিয়া, ইহাকে অপর এক গামলার উপর বসাইয়া রাখি। এই ছিদ্র দিয়া নাদের রস ঝরিয়া গামলায় পড়ে পরন্তু এই গামলার রসকে "কোৎরা" বলে। অধিকন্তু নাদের উপরের পাটা শেওলা ৮ দিন পরে তুলিয়া চিনি কাঁকিয়া লওয়া হয়। পরন্তু পূর্ব্বের চলিসার চিনি এবং এই নাদের চিনি আমাদের কারখানায় এই দ্বিবিধ চিনি হয়। পরন্তু নাদপাত্রের তলদেশের শেষে যে চিনি পাটা শেওলার দ্বারা শীঘ্র শুকায় না, তাহাকে "ছিটনীর" চিনি বলে।

একটা পাঁচমণী চলিসাতে;—

চিনি পাওয়া যায়	১॥০	মণ	দর	৮৲	হিসাবে	১২৲
কোৎরা আড়াই হাড়ী ৩/৫ সের	,,		২॥০	,,		৭৸/০
ছিটনির চিনি	।০	,,	১৸০	,,		।৶০
মোট জমা						২০।০

উক্ত কুড়ি টাকা চারি আনা আদায় করিতে নিম্ন লিখিত হারে খরচ হইয়া থাকে।

গুড় খরিদ	৫ মণ	৩৲	হিসাবে	১৫৲
পাটা শেওলা এবং দড়ি ইত্যাদি				।০
জ্বালানী পাতা কিম্বা পাথুরে কয়লা				॥৵০
লোকের বেতন ৮।১০ জনের ……				২॥০
মোট				১৮।৵০
অতএব মূল্যঃ ৫/০ গুড়ে				১৮৵০

স্মরণ রাখিবেন, ইহা পূর্ব্বের হিসাব। নচেৎ এক্ষণে আর লাভ নাই কারণ ফর্দ্দে দেখিবেন, চিনি যাহা দেড় মণ পাওয়া যায়, উহার দর ৮৲ টাকা বিক্রয় হইয়াছিল বলিয়া এক টাকা চৌদ্দ আনা লাভ দাঁড়াইয়াছে। এদেশীয় কাঁচা চিনি এক্ষণে আর ৮৲ টাকা মণ বিক্রয় হয় না। বিগত ফাল্গুন মাসে এই শ্রেণীর কাঁচা চিনি কলিকাতায় পাক্কা মণ সাড়ে পাঁচ টাকা মণ বিক্রয় হইয়াছে। এখন পরিষ্কৃত কলের চিনির মণ ৭৲ টাকা। অতএব এ সব কারখানা আর কি থাকিবে? এখানে ৮।১০ শত মণ গুড় ভাঙ্গা ভিন্ন একটা কারখানা হয় না। পাতার জ্বালে খরচা চৌদ্দ আনা হইতে এক টাকার মধ্যে পড়ে। ভাল কারিকর হইলে, তাহারা দেড় মণের স্থলে বড় জোর ১৷৫ সের চিনি বাহির করিতে পারে। পরন্তু গুড় বিশেষে এক মণ পনর সেরও বাহির হইতে পারে। ছিট্‌নীর চিনি সম্বন্ধেও তাই /৫ /৭ সের হইতে ।০ সের পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। শ্রীহরিনারায়ণ দে। কালীপুর চিনির কারখানা।

জাপানী ভাষা।

(খাদ্যাদি সম্বন্ধীয় শব্দ।)

আতা—রিনঙ্গো।
গোমাংস—উসি।
মদ—বির।
ফোটা, সিদ্ধ হওয়া—নিরু।
রুটি—পান।
খুব গরম করা—য়াকেরু।

মাখন—ঙ্গাঁউরাকু, বাট্টা।
বাঁধা কপি—বোটাননা, কাবিজ্জি।
পিঠে সকল—কাসী।
শালগম—সিনজিন।
মুরগী শাবক—নিয়াটোরি।
ছোট মৎস্য—কোহি।

বড় মৎস্য—টারা।
ক্লারেট মদ—বোর্দ্দর।
শসা—কিউরি।
ডিম সকল—টামাঙ্গো।
নরম সিদ্ধ ডিম সমূহ—টোমাঙ্গো নো হানজিকু।
কঠিন ভাবে সিদ্ধ ডিম সমূহ—টামাঙ্গো নো নিম্নকি।
ডুমুর সকল—ইচি জিকু।
মৎস্য—সাকানা।
ময়দা—উডোন নোকো।
খাদ্য—টাঁবেমেদনা।
মোরগ—টোরি।
ফল সকল—কুডামেদনা, মিজুঙ্গাসী।
আঙ্গুর সকল—বুডো।
হাঁস—ঙ্গাচো।
খরগস—উসাঙ্গী।
হরিণ—নিসিন।
ভেড়ার ছানা—কোহিট সুজি নোনিকু।
লেবু—যুজু।
মাকরেল (সামুদ্রিক মৎস্য বিশেষ)—সাবা।
মাংস—নিকু।
কাঁকুড়—উরি।
খরমুজা—মস্কমিলন—মাকুরা উরি।
তরমুজ—সুইকা।
দুধ—উসি নো চিচি।
সুলেট (মৎস্য বিশেষ)—বোরা।

সর্ষপ—কারাসি।
ভেড়ার মাংস—হিটসুজি নো নিকু।
তৈল—আবুরা।
ডিমপিষ্টক—টামাঙ্গোয়াকী।
কমলালেবু—মিকান।
শামুখ—কাকি।
মটর—এনডোনামে।
পীচ—মোমো।
নাসপাতি—নাসী।
মরিচ—কোসো।
পায়রা—হাটো।
কুল—উমে।
শূকর মাংস—বুটা।
আয়র্লণ্ডের আলু—জাঙ্গাইমো।
মিষ্ট আলু—সাট সুমাইমো।
শশক—উসাঙ্গী।
চাউল—মেকি, ঙ্গোজেন।
সিদ্ধকরা—আকু।
সুপ—ঝোল—সুরু, ওসুইমোনো।
চিনি—সাটো।
শাক সবজী—যাসাই।
তিনিগার—সু।
জল—মিডজু।
পানীয় জল—নোমি মিডজু।
গরম জল—যু।
মদ—বুডোসু।
দেশীমদ—সাকে।
গাজর—কাবু।
ক্যাকড়া—বুড়োসাকে।

ঘৃত।

ভারতের "র সুগার" বলিলে যেমন খেজুরে চিনিকেই বুঝায়, যেহেতু ইক্ষু চিনি বা সাচাচিনি উহার তুলনায় অতি অল্প পারিমাণে হইয়া থাকে; "ভারতে ঘৃত বা ঘি" বলিলে সেইরূপ মহিষের দুগ্ধের ঘৃতকেই বুঝাইয়া থাকে, যেহেতু মাহিষ-ঘৃতের তুলনায় গব্যঘৃত অল্প পরিমাণেই হয়। পূর্ব্বে এ দেশীয় "র সুগার" বা কাঁচা চিনি অর্থাৎ দলুয়া গোঁড় ইউরোপে রপ্তানী হইত। এখন আর এ দেশী চিনির শিপ্‌মেণ্ট হয় না। ইউরোপ হইতে চিনি আসিতেছে, কিন্তু ঘৃত সম্বন্ধে এখনও সেটি হয় নাই, অর্থাৎ বিদেশীয় ঘৃত এখনও ভারতে প্রবেশ করে নাই, বরং ক্রমশই ভারতেরই ঘৃত বিদেশে যাইতেছে। আফ্রিকা, আমেরিকা এবং ইউরোপ খণ্ডের লোকেরা ঘৃতের আস্বাদন ক্রমেই পাইতেছেন। ঐ সকল প্রদেশে মাখন এবং চর্ব্বির ব্যবহার ছিল। ভারতের সর্পিঃ যে চর্ব্বি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং মাখন অপেক্ষা প্রচুর এবং সহজ প্রাপ্য দ্রব্য, তাহা বিদেশবাসীরা ক্রমশই বুঝিতেছেন। এই জন্য ইহার রপ্তানী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিকন্তু অনেকে বিবেচনা করেন, এই কারণেই ভারতে ঘৃতের দর স্থায়ী ভাবে যেন দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে, অর্থাৎ ঘৃতের দর পূর্ব্বের মত ২৬৲ ২৭৲ টাকা মণ আর নাই, এখন ৩৫৲ ৩৬৲ টাকা হইতে সময়ে সময়ে ভাল ঘৃত ৫০৲ মণ বিক্রয় হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ঘৃতের এরূপ অবস্থা যে কেবল রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য হইয়াছে, তাহা নহে; পূর্ব্বেও "ঢালাই" * কার্য্য ছিল ত! তখন ঘৃত এমন দুর্ম্মূল্য হয় নাই কেন? অতএব বিদেশীয়দিগের মধ্যে ইহার ক্রমিক ব্যবহার বৃদ্ধি পাইলেও, আর একটী কারণ এই যে, ভারতে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইয়া, গ্রাম্য পশুদেরও খাদ্যের অভাব ঘটিয়া উহারাও মারা পড়িতেছে। ফলে, মোটের উপর দুর্ভিক্ষ হইলে দেশের অপরাপর অনেক দুরবস্থার সহিত ঘৃতের ফলনও কমিয়া গিয়া থাকে; তাই আর পূর্ব্বের মত ভারতে ঘৃত উৎপন্ন হইতেছে না।

---

* ঢালাই অর্থাৎ বিদেশীয় বণিকগণ যখন এদেশীয় ঘৃত লইয়া যান, তখন আমাদের ঘৃতপাত্র মট্‌কি বা কানেস্তারা হইতে উহাঁদের পাত্রে ঢালিয়া লইয়া থাকেন। এই কার্য্যকেই "ঢালাই ঘৃতের" কার্য্য বলে। কলিকাতা আফিসওয়ালারা এবং বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের আফিসওয়ালারা ভারতের ঘৃত ক্রয় করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া থাকেন

ভারতে কোথায় কত সিক্কার ওজন, তথাকার ঘৃত পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া কত দরে বিক্রয় হইত, এখনই বা উহার কত দর হইয়াছে, কোন্ স্থানের ঘৃত ভাল, কোন স্থানের ঘৃত মন্দ—ইত্যাদি বিষয়ের একটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্থানের নাম,	১২৬৯ সালের দর	১৩০৮ আশ্বিনের দর	উপস্থিত দর
মুঙ্গের ১	২৪৲	৪৬৲	৩৪৲
খাগড়িয়া ২	৩০৲	৪৪৲	৩৩৸০
পরিহার ২	,,	৪৪॥০	৩৩৲
রামনাথপুর ১	২৫৲	৪৫৲	৩৫৲
সুলতানগঞ্জ ১	২৬৲	৪৬৲	৩৫৲
তেকড়া ১	২৫৲	৪৫৲	৩৪৲
মনসর সমসার ২	২৪॥০	৪৪৲	৩৫৲
বেগুসরাই ২	২৪।০	৪৫৲	৩৩৸০
রামদিনে ২	২৪॥০	৪৫৲	৩৩৸০
চকোর ২	২৫৲	৪৫৸০	৩৪৲
সাহাপুর ১	২৩॥০	৪৬৲	৩৪৲
ভোমরপুর ১	,,	,,	,,
পাপড়া ১	২৪।০	৪৫৲	৩৪৲
বেলিয়া ২	২৪৲	৪৪৲	৩৩॥০
বিসমপুর	২৬॥০	৪৭৲	৩৫॥০
সমস্তিপুর ২	২৩৲	৪৪৲	৩১॥০
রোষড়া	২২৲	৪৩৲	৩২৲
গুড়িয়া	২৩৲	৪৪৲	৩২৲
বেণুয়া	২২৲	৪৩৲	৩২৲
রিপিলগঞ্জ	২৪৲	৪৪৲	৩১॥০
নাথপুর ২	২৩॥০	৪৪॥০	২৮॥০
বেলুয়া ২	ঐ	ঐ	ঐ
সাহেবগঞ্জ ২	ঐ	ঐ	ঐ
কেওয়াড়ি ১	২৬৲	৪৬৲	৩[illegible]৲

মুরারীগঞ্জ	২৩৲	৪৪৲	৩১৲
আরা	১৭॥০	৩৭৲	৩০৲
মহারাজগঞ্জ	ঐ	ঐ	ঐ
হোসেনাবাদ	ঐ	ঐ	ঐ
গাড়য়াঁ ২	২৩৲	৩৯৲	৩২৲
চেনারু ১	২৫৲	৪৩॥০	৩৫৲
দোঁরা	১৭॥০	৩৭৲	৩০৲
কাদ্‌নি	ঐ	৩৫॥০	২৮॥০
ডোমরুয়া ২	২৩॥০	৪০॥০	৩০॥০
সাঁতনা ২	ঐ	ঐ	ঐ
দর্লি ২	ঐ	ঐ	ঐ
বক্‌সর ২	ঐ	ঐ	ঐ
বেলিয়া ২	ঐ	ঐ	ঐ
গাজীপুর ২	ঐ	ঐ	ঐ
দ্বারভাঙ্গা	২২৲	৩৭৲	৩১৲
সীতামারি	১৮॥০	২৪॥০	৩৪৲
নগরবাঁশী	ঐ	ঐ	ঐ
কৈরি	ঐ	ঐ	ঐ
বাজিৎপুর ২	২৩॥০	৪৩৲	৩২৲
কোঁচ ২	ঐ	৩৯॥০	৩০৲
কানপুর	২১॥০	৩৪৲	২৮৲
সেকুরাবাদ ১	২৪৲	৪৩৲	৩২৲
হাতরস ১	ঐ	ঐ	ঐ
জসমন্তনগর ১	ঐ	ঐ	ঐ
খুরজা	ঐ	ঐ	ঐ
এটোয়া ১	ঐ	ঐ	ঐ
আগরা ১	ঐ	ঐ	ঐ
আলিগড় ১	ঐ	ঐ	ঐ
বাঁধা ২	২৩৲	৩৯॥০	৩০৲
সাগর	ঐ	ঐ	ঐ
গোরখপুর	২১৲	৩৮৲	৩০৲
বরহজ	ঐ	ঐ	ঐ
ছিরণছাপ্‌রা ২	২৩৲	৩৮॥০	ঐ
শুকন্‌ ছাপ্‌রা ২	ঐ	ঐ	ঐ
ললিতপুর	২২৲	৩৫॥০	ঐ
নান্‌পাড়া	ঐ	ঐ	ঐ
পাটনা	ঐ	ঐ	ঐ
তগুলা ২	২৩৲	৩৯৲	ঐ
জলেশ্বর ১	ঐ	৪২॥০	৩৬৲
গয়া ২	২২৲	৩৮৲	২৮৲
এমামগঞ্জ	ঐ	ঐ	ঐ
চাতরা ২	ঐ	ঐ	ঐ
ঝান্সি	১৭॥০	৩৭৲	ঐ
মছলিবন্দ ১	২৪॥০	৪১॥০	৩৫৲
মতিহারি ২	২৩৲	৪২৲	৩৪॥০

কোঁচ, কানপুর, সেকুরাবাদ, হাতরস, যশোমন্তনগর, খুরজা, এটোয়া, এই কয়টি অঞ্চলে ১০০ সিক্কার ওজন। মুঙ্গের, খাগড়িয়া, পরিহার, রামনাথপুর, সুলতানগঞ্জ, তেকড়া, মনসর সমসার, বেগুসরাই, রামদিনে, চকোর, সাহাপুর, ডোমরপুর, পাপড়া, বেলিয়া, বিনয়পুর, নাথপুর, বেলুয়া, সাহেবগঞ্জ, কেওয়াড়ী, মুরারিগঞ্জ, দ্বারবঙ্গ, সীতামারি, নগরবাসী, কৈরি, বাজিৎপুর—এই কয়টি অঞ্চলে ৮৮ সিক্কার ওজন। সমস্তিপুর, রোষড়া, গুড়িয়া, বেণুয়া, বাঁধা, সাগর, গোরখপুর, বরহজ, ডোমরুয়া, সাতনা, দর্লি, বক্সার, বেলিয়া, গাজীপুর—অঞ্চলে ৮০ সিক্কার ওজন প্রচলিত।

(১) চিহ্নিত অঞ্চল গুলিতে ভাল এবং (২) চিহ্নিত অঞ্চল গুলিতে মাঝারি ঘৃত পাওয়া যায়। বিনয়পুরের ঘৃত অতি উৎকৃষ্ট, রোসড়া, রিপিলগঞ্জ, কাদনি, সীতামারি, নগরবাসী, কৈরি, কানপুরী, গোরখপুর, বরহজ, ললিতপুর, নানপাড়া, পাটনা ও ঝান্সিতে তেলাঘৃত পাওয়া যায়। গুড়িয়ার তেলা ঘি বটে, কিন্তু উহারই মধ্যে ভাল। বেণুয়া, মুরারীগঞ্জ, আরা, দোঁরা, এই সকল অঞ্চলের ঘৃত নরম ঘৃত। দ্বারবঙ্গে ভাল ও নরম দুই প্রকার এবং খুরজায় ভাল ও মাঝারি দুই প্রকার ঘৃত হয়।

মুঙ্গের হইতে মুরারিগঞ্জ এই ২৬টি অঞ্চল এবং বেলিয়া হইতে মট্‌কি করিয়া ঘি আইসে। মট্‌কি কোথাও বড়, কোথাও ছোট। অন্যত্র হইতে কানেস্তারায় আইসে, কেবল মছলিবন্দ হইতে পিপায় ঘৃত আসিয়া থাকে।

উল্লিখিত প্রায় সমুদায় স্থানেই কুপায় করিয়া কাঁচা ঘৃত বাজারে বিক্রয় হয়, অথবা দাদন দিয়া রাখিলে, গোয়ালারা কারখানায় ঘৃত জোগান দিয়া যায়। পাঁচটা কুপা হইতে ৫ ছটাক ঘৃত লইয়া জাল দিয়া দেখিয়া কত জল্‌তি এবং ময়লা মাটী কত বাদ যায়, তাহা সংক্ষেপে নিরূপণ অর্থাৎ ভূষি মালের মত খাদ কষিয়া লইয়া তৎপরে ঘৃতের দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া, কারখানা বাটীতে এইরূপ ৫।৭ দিনের ক্রীত ঘৃত একত্র করিয়া "দাগ" করা হয়, অর্থাৎ বৃহৎ কটাহে করিয়া অল্প গলাইয়া, লবণ জল, কোন কোন স্থানে মৌয়ার তৈল মিশ্রিত করিয়া ঘৃতের পড়তা কম করা হয়। আবার কেহ কেহ কোন কোন স্থানে যেমন বাঁধা এবং সাগর প্রভৃতি দেশে দাগের সময় মহিষের ঘৃতকে সুগন্ধি করিবার জন্য উহার সঙ্গে গাওয়া বা গরুর ঘৃত মাত্রানুসারে মিশ্রিত করিয়া দিয়া থাকে। পরন্তু এই জন্য বাঁধা ও সাগরের ঘৃত দেখিতে লাল এবং খাইতে মিষ্ট লাগে। দাগ হইয়া গেলে কানেস্তারা কিম্বা মট্‌কি পূর্ণ করিয়া, শীতল হইলে, চালান দেওয়া হয়।

সোরার কার্য্য।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

যাঁহারা ছাপরা বা অন্যান্য স্থান হইতে বেশী খাদি মাল লইয়া সেই স্থানেই, ৫ মণ খাদের উপযুক্ত করিয়া,—কলিকাতায় চালান দেন; এবং বরাবর বৈদেশিক বণিক্‌গণকে বিক্রয় করেন, সে সকল মালকে পশ্চিমে ধোয়া ৫ মণ খাদের মাল বলিয়া থাকে। এ সকল মাল প্রায় সাদা রংঙে হয়। পরন্তু কানপুর হইতে যে মাল ৫ মণ খাদের বলিয়া বিক্রয় হইবার জন্য আসে, তাহা কানপুরী নামে পরিচিত হয়। এই কানপুরের মাল দেখিতে কলিকাতার অপেক্ষা কিছু সুন্দর হয়; সে কারণ সর্ব্বদাই এক আধ আনা দর বেশী। অপিচ সুন্দর দানাযুক্ত (কলম) হরিদ্রাবর্ণের সোরা যাহা পশ্চিম হইতে চালান আসে, তাহাও ৫ মণ খাদের উপযুক্ত হইলে,—৫ মণ খাদের

ঢিমে রঙের (50/0 Crude) বলিয়া বৈদেশিক ক্রেতাদিগের নিকট বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহার দরও কলিকাতার পরিষ্কৃত সোরার দর অপেক্ষা কিছু বেশী;—তবে ইহার বিশিষ্ট খরিদ্‌দার না থাকিলে, তাহাও দরের দরে বিক্রয় হয়; শতকরা ৫ মণ খাদের পরিস্কৃত সোরার যে দর, সেই দরে বিকাইয়া যায়। এই ৫ মণ খাদের সোরাই ক্রয় বিক্রয়ে সোরার বাজারে সাধারণ পণ্য। দর কি বলিলেই, শতকরা ৫ মণ খাদের দর বুঝাইবে। এবং এই ৫ মণ খাদের মাল লণ্ডন লিবারপুল, নিউ-ইয়র্ক, মরিশশ্, সানফ্রানসিস্কো প্রভৃতি বিবিধ বন্দরে এবং ঐ সকল বন্দর হইতে পুনর্ব্বার বাণিজ্য-পোতযোগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালান যায়। কারণ ৫ মণ খাদের মাল অতি উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্ব কার্য্যে প্রায় ব্যবহারোযোগী বলিয়া গ্রাহ্য। তবে শতকরা ৬ মণ খাদ হইতে শতকরা ১৫ মণ খাদের মাল সংক্রান্ত ক্রয় বিক্রয়ের যে সকল সওদা-পত্র হয়, তাহা প্রায় Crude সোরায় হইয়া থাকে; এবং ব্যাপারী দ্বারাই তাহা বিক্রীত হয়। কলিকাতার সোরার কারখানাওয়ালারা প্রায়ই সে সকল কাজ করেন না। শতকরা ৫ মণ হইতে ৬ মণ খাদের তফাৎ বড় সামান্য এবং প্রায়শঃ বাজার দরে দুই আনা বাঁটাতে বিক্রীত হয়। অর্থাৎ যদি ৫ মণ খাদের সোরার দর ৭৸৹ হয়; তবে ৬ মণ খাদের ৭॥৶৹ ৭ মণ খাদের দর ৭॥৹ এই প্রকার বাঁধা নিয়ম ধরা আছে।

যদি শতকরা ৫মণ খাদী মালের ক্রয় বিক্রয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পরীক্ষার ফলে সওয়া পাঁচ মণ হয়, বা সাড়ে পাঁচ মণ দাঁড়ায়, তাহা হইলে, প্রত্যেক সিকি মণে বাড়তি-তে প্রত্যেক মণে এক আনা হিসাবে কন্‌ট্রাক্ট বা চুক্তি পত্রের দর হইতে বাদ পড়িবে। যেমন ধরুন আপনি কন্‌ট্রাক্ট করিলেন;—৫ মণ খাদের ৫০ টন ৭৸৹ দরে প্রত্যেক কুটির মণের হিসাবে; কারণ কুটির মনেই সোরা বিক্রয় হইয়া থাকে। রপ্তানি হইল, ২৫ টন বা একটী আন্দাজ ধরুন ৭৫০ মণ এবং আপনার খাদ কষার ফল হয় ত পউনে ৬ মণ হইয়াছে; তখন আপনাকে প্রত্যেক মণ করা ৶৹ আনা ঐ সাত টাকা বার আনা দর হইতে বাদ দিয়া, ৭৫০ মণের দাম চুকাইয়া লইতে হইবে। যদি সওয়া ৫ মণ হয় তো ঐরূপ /৹ আনা মূল দর ৭৸৹ হইতে বাদ দিয়া ঐ ৭৫০ মণ দর কষিয়া দাম চুকাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু বাজার দর শতকরা ৫ মণের দর হইতে শতকরা ৬ মণের দরে মারজিন ৶৹ আনা মাত্র। কিন্তু খাদ বাড়িলে ।৹ আনা যায়। সে জন্য এদেশীয় সোরা

ব্যবসায়িগণের উচিত বিশেষ বুঝিয়া কন্‌ট্রাক্ট করা—করেনও অনেকেই তদ্রূপ। এই প্রকারে ৫ মণ হইতে আট মণ পর্য্যন্ত যে রকম মাল সওদা, তাহার উপর খাদ যে প্রকারে বাড়িবে, তাহার শতকরা প্রত্যেক অঙ্কে চারি আনা বাটার দায়ে কাটা যাইবে। ৮ মণ খাদ হইতে ১০ মণ খাদের সওদায় খাদ বাড়িলে,—প্রত্যেক মণে ৶০ আনা হিসাবে যাইবে,—ইহাই নিয়ম;—১০ মণ খাদের মাল হইতে ১৫ মণ খাদের মাল পর্য্যন্ত ৵০ আনা বাটা হয়; তাহার পর শতকরা ১৬ /০ খাদের মাল হইতে বরাবর শতকরা ৪০ মণ পর্য্যন্ত /০ আনা। কারণ তদূর্দ্ধ খাদের মাল প্রায়-ই কখনও বিক্রীত হয় না; এবং তাহা দ্বারা কোন কর্ম্ম হয় না। যদি তোমার কন্‌ট্রাক্ট করা সওদার সঙ্গে খাদ কষাই ফল ঠিক আসে তো, কন্‌ট্রাক্ট দরে-ই দাম চুকাইয়া পাইবে। কিন্তু খাদ বেশী হইলেই, উপরি লিখিত রূপ বাজার দরে বাটা বাদ দিতে হইবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু, কন্‌ট্রাক্টের নিয়ম অনুযায়ী সে মাল আফিসওয়ালারা অগ্রাহ্য করিতে পারে; এবং তৎপরিবর্ত্তে ব্যাপারীর নিকট হইতে আবার অন্য মাল লইতে পারে; তবে খাদ বাড়িলে, বেশী বাটা বাদ যায়, সে কারণ বৈদেশিক বণিকদিগের পক্ষে লাভ থাকায়, কেহই অগ্রাহ্য করেন না।

চুক্তি পত্রে স্বীকৃত হইয়া গেলে, মুদ্দতের ভিতরও ব্যবসায়ী বা বিক্রেতা মাল দিতে প্রস্তুত হইলে, তাহা তৎক্ষণাৎ ক্রেতাকে লইতে হয়। তখন তাহার মাল রপ্তানীর জাহাজ থাকুক বা না থাকুক। কলিকাতার পরিষ্কৃত সোরার সওদা হইলে, ব্যবসায়ীদিগের কারখানা হইতে মাল লইতে হয়। তবে পশ্চিমে আমদানীর পরিষ্কৃত সোরা বা কানপুরী সোরাও হাবড়া হইতেই লইতে হয়। কখন কখন বাজার হইতেও লইতে হয়।

ওজন লইবার সময় ক্রেতার অতি বিশ্বাসী লোক জন থাকার প্রয়োজন। কারণ প্রত্যেক বস্তা ওজন ঠিক যথাযথ হওয়া আবশ্যক, বিক্রেতার লোকে ওজন করিয়া দিবে, কিন্তু ক্রেতার লোককে সতর্ক হওয়া চাই। প্রত্যেক সোরার বস্তা কাটিয়া তাহার ভিতর বোমা মারিয়া যে মাল বাহির হইবে, তাহা বৃহৎ সরার এক সরা। সেই এক সরা মাল বেশ করিয়া উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া এক মুষ্টি করিয়া ওজন সরকারের পার্শ্বস্থিত একটী নূতন বস্তাতে ফেলিতে হইবে,—এই রূপে যত বস্তা ওজন হইবে, প্রত্যেক বস্তায় বোমা মারিয়া সেইরূপ প্রত্যেক মুষ্টি মাল সেই নূতন বস্তায় ফেলিতে হইবে। তাহার পর ওজন শেষ হইয়া গেলে, সেই পুঞ্জীকৃত নমুনা বস্তা খুলিয়া,—তাহা

হইতে দুটী দুটী করিয়া মাল নমুনার বোতল মধ্যে পূরিয়া তাহা শীল করিয়া আফিসে ওজন সরকার লইয়া যাইবে; সেখান হইতে ডাক্তার আর স্কট-টমশন কোম্পানীর বাটী পাঠাইয়া দিতে হইবে। খাদ ঠিক হইলে, দর ঠিক মত চুকিবে; বেশী হইলে, পূর্ব্বোক্ত রূপে বাটা বাদ দিয়া চুকিবে। খাদের নিমিত্ত কিছু টাকা হাতে রাখিয়া,—কতক অংশ টাকা ব্যবসায়ী ক্রেতার নিকট হইতে পাইয়া থাকে। তাহার পর খাদ কষার ফল আসিলে, হিসাব শোধ হইবে। প্রত্যেক বস্তার টেয়ার—৩।০ সওয়া তিন পাউণ্ড বাদ যাইবে; তবে কানপুরী টিমে বা পশ্চিমে আমদানীর পরিষ্কৃত সোরার বস্তায় বোমা মারিবার রীতি নাই। বস্তা কাটিয়া হাতে তুলিয়া নমুনা দিবে। কেবল মাত্র কলিকাতার ৫ মণ খাদের মালে বোমা মারিতে হইবে। ব্যাপারীর বস্তা ওজন হইলেই তৎক্ষণাৎ নিজের চট দিয়া নিজের মার্কা মারিয়া চালান দিবে। গ্যারাণ্টি বা দায়িত্বের কাজ সচরাচর এই প্রকারে নির্ব্বাহ হয়। বিলাতী পোতযোগে রপ্তানীর কাজ (Shipment) এই প্রকারেই সাঙ্গ হয়।

তবে যে সকল মাল চায়না পিনাং শিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যায়, তাহা অন্য প্রকার—ফরাক্কাবাদ সোরা, লালগঞ্জ সোরা খুব কলমদার হইলে,—এবং খুব সাদা রং হইলে, সে সকল মাল খুব উচ্চ দরে বিনা দায়িত্বে বিক্রীত হয়। কোন বিলাতী ব্যবসায়ী সে সকল কাজ করেন না, তবে নাখোদারেরা সে সকল কাজ করিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ সেপ্টেম্বর মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই চার মাস বিলাতের বাজারে কিছু অধিক মাল যায়। এই সময়ে সকল বৎসর সোরার বাজার বেশ তেজী হয়। বিলাতী ব্যবসায়ীরা এই সময়ে কিছু আউতি সওদার মনোযোগী হন।

সোরা বার মাস আসে। বার মাসই ইহার কাজ কর্ম্ম চলে; পূর্ব্বে এই সোরার ব্যবসায় বেশ লাভজনক অতীব সুখের ছিল। এবং ইহার কল্যাণে অনেকে সঙ্গতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছেন। মহাত্মা রামচাঁদ ক্ষেত্রী—ষষ্ঠীচরণ দাঁ ক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রভৃতি অনেক অনেক মহাত্মা এই সোরার ব্যবসায়ে লক্ষপতি হইয়া গিয়াছেন।

এখন আর সে দিন নাই। সে সকল ব্যবসায়ীও নাই। পূর্ব্বে সোরা হইতে লবণ উৎপন্ন হইত। যে সকল সোরার ক্ষারী লবণ এক্ষণে ফেলা যায়, আগে তাহা হইতেই দেশীয় লবণ প্রস্তুত হইত। বিলাতী লবণের কাটতি কম

হইতে দেখিয়া,—বর্ত্তমান ভারতগবর্ণমেণ্ট তাহার উপর শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং আর কেহ লবণ তৈয়ারী করে না; সে সকল গাদা গাদা সোরার ক্ষারী লবণ এক্ষণে নিজের পয়সা ব্যয় করিয়া, গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিতে হয়। এখন ব্যবসায়ের লক্ষ্মীশ্রী এমনি!

শ্রীপ্রসাদদাস দত্ত।

আখ মাড়া কল।

কলিকাতায় পাঁচ প্রকারের আখ মাড়া যন্ত্র বা আখ হইতে রস বাহির করিবার কল ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। পরন্তু ঐ পাঁচ প্রকার কল কোথায় পাওয়া যায়, অপিচ উহাদের মূল্য কত এবং কোন কলে কত ইক্ষু দিলে, তাহা হইতে কত রস পাওয়া যায়, ইহার পরীক্ষার ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

১ম, প্রকার—ডেথ কোম্পানীর আবিষ্কৃত কল, ইহা ৪ জন লোকে হস্তদ্বারা চালাইয়া, এক ঘণ্টায় ছয় মণ ত্রিশ সের ইক্ষু হইতে ৩/০ মণ রস বাহির করিতে পারে। দাম ৮০৲ টাকা।

২য় প্রকার,—ক্যাণ্টোয়েল কোম্পানির আবিষ্কৃত কল, ইহাকেও ৪ জনে পরিচালিত করিয়া, এক ঘণ্টায় পাঁচ মণ চৌত্রিশ সের ইক্ষু হইতে তিন মণ আটাশ সের রস বাহির করিতে পারে। দাম ৭০৲ টাকা।

৩য় প্রকার,—বরণ কোম্পানীর উদ্ভাবিত কল; দাম ৮০৲ টাকা, ইহাকেও ৪ জন লোক দ্বারা পরিচালিত করিয়া, এক ঘণ্টায় চারি মণ ছাব্বিশ সের ইক্ষু হইতে দুই মণ সাড়ে পঁইত্রিশ সের রস পাওয়া গিয়াছে।

৪র্থ প্রকার,—(ক) টমসন কোম্পানীরা দুই প্রকার ইক্ষু মাড়া কল প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাঁদের এক প্রকার কল বলদের সাহায্যে পরিচালিত হয়, পরন্তু এই কলে এক ঘণ্টার মধ্যে ৬ মণ ২২ সের ইক্ষু পিষিয়া চারি মণ সাড়ে তের সের রস পাওয়া গিয়াছে। ইহার দাম ৮০৲ টাকা। পরন্তু,—

৫ম প্রকার,—(খ) উহাঁদের অন্যবিধ আখ মাড়া কল, যাহা চারি জন মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয়; তাহাতেও এক ঘণ্টায় ৮ মণ ৭ সের ইক্ষু পিষিয়া ৬ মণ ১০ সের রস পাওয়া গিয়াছে। এ কলের দামও ৮০৲ টাকা।

অধিকন্তু উক্ত ৫টী কলে প্রত্যেকটিতে ১৮ সের ইক্ষু মাড়িয়া যে রস পাওয়া গিয়াছে, তাহার তালিকা পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১) ডেথ কোং /৮॥/০; (২) ক্যাণ্টোয়েল কোং ।১।/০; (৩) বরণ কোং ।১।৶০; (৪) টমসন কোং প্রথম প্রকার (মানুষ দ্বারা) ।১॥/০; (৫) তাঁহাদের দ্বিতীয় প্রকার (বলদ দ্বারা) প্রাপ্ত ।১৮৶০; বলদেরই ফল ভাল।

আলফ্রেড নোবেল।

আলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল নরওয়ের রাজধানী ষ্টকহলম নগরে জন্ম গ্রহণ করেন (২১শে অক্টোবর ১৮৩৩)। তাঁহার পিতা ইমানুয়েল নোবেল ২০ বৎসর ধরিয়া সেণ্টপিটার্সবর্গে জাহাজ প্রস্তুতির কলকারখানা চালাইয়াছিলেন। ক্রিমীয় যুদ্ধের পর রুষীয় গবর্ণমেণ্টের অর্থাভাবে নীভা নদী তীরে কল কারখানা কমিয়া পড়িলে, ইমানুয়েল নোবেল ১৮৫৯ অব্দে রুষীয়ার কারবার তুলিয়া দিয়া, ষ্টকহলমে ফিরিয়া আইসেন এবং তথায় পুত্রদিগের সহায়তায় বারুদ, গনকটন প্রভৃতি নানা প্রকার এক্সপ্লোসিভ্‌স (explosives) অর্থাৎ প্রবল বিদারণ-ক্ষম দ্রব্যজাত সম্বন্ধে পরীক্ষাবিধান ও নূতন তথ্য আবিষ্কার সম্বন্ধে চেষ্টা করিতে থাকেন।

তখন পর্য্যন্ত যুদ্ধকার্য্যে বা ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্যে বারুদেরই ব্যবহার হইত। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী দেশে নাইট্রোগ্লিসিরিণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু উহার প্রস্তুতকার্য্য ও রক্ষণ এত বিপজ্জনক ছিল যে, তখন উহা কোন কার্য্যে ব্যবহার হইতে পারিত না।

১৮৬১ অব্দে ইমানুয়েল নোবেল নাইট্রো-গ্লিসিরিণের সহিত অপর দ্রব্য মিলাইয়া উহা কার্য্যে লাগাইতে পারা সম্ভবপর করিয়া তুলিলেন। ১৮৬৩ অব্দে আলফ্রেড নোবেল নাইট্রোগ্লিসিরিণ ও বারুদের মিশ্রণে প্রস্তুত দ্রব্যের পেটেণ্ট (উদ্ভাবিত উপায়ে প্রস্তুতির একচেটিয়া) লইলেন। কিন্তু তখনও কারখানায় সর্ব্বদা দুর্ঘটনা হইত। একবার ব্রসেল্‌সে উহাঁদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ও নয় জন লোক এবং সমস্ত কারখানা উড়িয়া যায়। আলফ্রেডের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপর একস্থলের দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। ইংলণ্ডের নিউকাসল নগরে নাইট্রোগ্লিসিরিণের কারখানা হঠাৎ নষ্ট হওয়া উপলক্ষে শেরিফের মৃত্যু হয়। এই সময়ে অনেক ইয়ুরোপীয় রাজ্যেই এই নূতন "এক্সপ্লোসিভ" ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন করিবার কথা উঠে। ১৮৬৭ অব্দে আলফ্রেড নোবেল "ডাইনামাইট" আবিষ্কার করিয়া পেটেণ্ট (প্রস্তুতির একচেটিয়ার আবিষ্কার স্থির) করিলেন।

ডাইনামাইটের প্রধান উপকরণ নাইট্রোগ্লিসিরিণ। কিন্তু উহা কিসেলগুর নামক অন্য দ্রব্যের সহিত এরূপে মিশ্রিত, যে উত্তাপে উহা ফাটে না, জলো হওয়ায় খারাপ হয় না। পাহাড় কাটাইয়া সাধারণ রাস্তা করা, টনেল (সুড়ঙ্গ) করা, খনির কার্য্য করা, জলমগ্ন পাহাড় উড়াইয়া দিয়া, বন্দর সকলের পথ নিরাপদ করা, প্রভৃতি সহস্র লোকহিতকর কার্য্যে ডাইনামাইট অবিলম্বে ব্যবহৃত হইল। ফলতঃ গিরিবিদারণে নরওয়ের প্রাচীন দেবতা "থরের মুদ্গর" বা আমাদের "ইন্দ্রের বজ্রের" ন্যায় এখন ডাইনামাইট কার্য্য করিতেছে। ১৮৭৬ অব্দে নোবেল ডাইনামাইট প্রস্তুতি সম্বন্ধে আরও একটু উন্নতি করিয়া "জিলাটিনস্ নাইট্রোগ্লিসিরিণের" পেটেন্ট লইলেন। ১৩ বৎসর পরে নোবেল ব্যালিস্টাইট প্রস্তুত করেন।

মিলিনাইট (ফরাসীদের) লিডাইট (ইংরাজদের) প্রভৃতি ধূমহীন বারুদের আবিষ্কৃতি এই ব্যালিস্টাইট হইতে আরম্ভ হইয়া, আধুনিক যুদ্ধ ব্যাপারের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছে। নোবেল কখন প্যারিসে কখন ইটালিতে কখন নরওয়েতে থাকিতেন; অনেক দেশেই তাঁহার ডাইনামাইটের কারখানা। এই ভীষণ বিদারণ-ক্ষম দ্রব্য প্রস্তুতিতে ১২ হাজার লোক দিন রাত তাঁহার কারখানা সকলে কার্য্য করিতেছিল—ডাইনামাইটের ব্যবহার এতই বাড়িতেছে। নোবেল কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবীদিগকে এরূপে বেতন দিতেন ও যত্ন করিতেন যে, ধর্ম্মঘটের লীলাভূমি ইয়ুরোপখণ্ডে ৩০ বৎসর মধ্যে তাঁহার কারখানায় লোকদের মধ্যে কখন ধর্ম্মঘট হয় নাই। নোবেলের গৃহস্থালী করিবার সময় ছিল না। কারখানা ও পরীক্ষাধান গৃহেই তাঁহার সময় যাইত। মধ্যে মধ্যে শেষাবস্থায় কাব্যপাঠ করিয়া আনন্দানুভব করিতেন মাত্র। তিনি বিবাহ করেন নাই। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাতার ৮৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। ঐ কাল যাবৎ মাতৃভক্তিই নোবেলের গার্হস্থ্য জীবনের একমাত্র চিহ্ন ছিল। ১৮৯৬ অব্দে ৬৩ বৎসর বয়সে ইটালীর সানরিমো নগরে আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যু হয়।

নোবেলের ভ্রাতা লুইস বাকু নগরের কেরোসিন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন।

ভীষণ দাহ্য পদার্থেই যেন এই বংশের আনন্দ বোধ। উহাঁদের পিতা এক সময়ে রুষীর গবর্ণমেণ্টের জন্য টরপিডো নামক সামুদ্রিক যুদ্ধের অস্ত্র প্রস্তুত করিতেন।

(ক্রমশঃ)

মহাজনবন্ধু মাসিক-পত্র।
২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। বৈশাখ ১৩০৯ সাল।

শর্করা-বিজ্ঞান।

(লেখক—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়,—M. A, M. R, A. C, and F. H. A. S.)

নবম অধ্যায়—চাষের নিয়ম প্রবন্ধের শেষ অংশ।

বর্ষা পড়িয়া গেলে জমিতে জল না দাঁড়ায়, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। বর্ষার মধ্যে গাছ ৪।৫ হাত উচ্চ হইয়া গেলে পাতা দ্বারা ইক্ষুদণ্ডগুলি আবৃত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সুপক্ক ও শুষ্কপত্রগুলি "মোচড়" দিয়া নমিত করিয়া ইক্ষুদণ্ডের উপর জড়াইয়া বাঁধিতে হয়। যতদূর নিম্ন হইতে বাঁধা আরম্ভ করিতে পারা যায়, ততই ভাল। গাছগুলি মাথা ভারি হইয়া পড়িয়া না যায়, একারণ তিন চারিটী গাছ উপরিভাগে একত্র করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শ্রাবণ মাসে বাঁধাই আরম্ভ করিয়া ভাদ্র মাসে শেষ করিতে না করিতে আবার দেখা যাইবে, আর একবার গাছগুলিতে পাতা জড়ান ও বাঁধন আবশ্যক হইয়াছে।

"হাণ্টার হো" দুইবার ব্যবহার করিতে পারিলে আর পৃথক করিয়া কোদালী দ্বারা গাছের গোড়ায় মাটী চাপাইয়া দিবার আবশ্যক করিবে না। ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ এই তিন মাসে জমী ডুবাইয়া তিন বার যদি জল দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক বারে জল দিবার এক সপ্তাহ পরেই হাণ্টার হো ব্যবহার করা চলিতে পারে। গাছগুলি দুই ফুট উচ্চ হইয়া গেলে উহার মধ্য দিয়া গরু চালাইয়া হাণ্টার হো ব্যবহার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। দুইবার বা তিনবার উক্ত যন্ত্র ব্যবহার করিবার পরে যদি জমি নরম অথচ কর্দ্দমময় নহে,—এরূপ ভাবে পাওয়া যায়, তাহা হইলে "হাতে চালান হো" ব্যবহার করা চলিতে পারে। যদি কলম লাগাইবার এক মাস পরে দেখা যায় যে, জমিতে ঘাস জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে হাণ্টার-হো বা হাতে চালান-হো ব্যবহার না করিয়া খুর্পি বা নিড়ানি দ্বারা ক্ষেত্র নিড়াইয়া পরিষ্কার করা আবশ্যক। পরে গাছগুলি ভাল করিয়া বাহির হইলে, সার দিয়া জল সেচন পূর্ব্বক একবার হাণ্টার-হো

ব্যবহার করিবার পর যখন গাছগুলি এক হাত উচ্চ হইয়া যাইবে, তখন আর একবার জল দিবার পরে হ্যাণ্টার-হো চালাইলে, গাছের গোড়ায় দুইবার মাটী চাপান হইয়া যাইবে। ইহার পরে প্রত্যেক বার জলসেচনের পরে একবার করিয়া হাতে চালান হো ব্যবহার করা উচিত। বিলাতি নিয়মে যদি ছয়ফুট অন্তর দুইখানি করিয়া কলম এক হাত ব্যবধানে লাগান হয়, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া বলদসংযুক্ত হ্যাণ্টার-হো চালান যাইতে পারে। শ্রাবণ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত দুইবার পাতা বাঁধিয়া দিবার পরে, মাঘ মাস অবধি আর কিছু করিবার আবশ্যক করে না। তবে আশ্বিন মাসেই যদি বর্ষা শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের মধ্যে দুইবার জলসেচন ও দুই বার "কোদালি" দ্বারা জমি উস্কান আবশ্যক হইতে পারে। ক্ষেত্রের মধ্যে শায়িত অবস্থায় অনেক ইক্ষু থাকিবার কারণ বর্ষান্তে "হো" চালানর পক্ষে বাধা জন্মে। জমির অবস্থা বুঝিয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মাঘ মাসে যখন সমস্ত পাতা শুকাইয়া আসিয়াছে, দেখা যাইবে, তখন গাছ কাটা আরম্ভ হইবে। গাছের তেজ আছে এবং জমিও সিক্ত রহিয়াছে, এরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইলে, মাঘ মাসে আখ কাটা আরম্ভ না করিয়া ফাল্গুন মাসে আরম্ভ করা ভাল। সাহেবরা যে যে দেশে ইক্ষুর চাষ করিয়া থাকেন, সেই সেই দেশে আখকাটা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আখের মাথাগুলি কাটিয়া দিবার (topping) নিয়ম আছে। ইহাতে ইক্ষুদণ্ডে শর্করার ভাগ অধিক হয় এবং উপরিভাগস্থ অঙ্কুরগুলি গাছে থাকিয়াই প্রস্ফুটিত হইবার উপক্রম হয়। এইরূপ উপরিভাগস্থ ইক্ষুদণ্ড হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কলম হয়। এক বিঘা জমির আখ কাটিতে ও ঝুড়িতে দুই জন লোকের দশদিন লাগে, অথবা ২০ জন লোক এক দিনে এই কার্য্য সমাধা করিতে পারে। কোদালি দ্বারা জমি ঘেঁসিয়া আখ কাটা উচিত। ইহাতে দুইটি উপকার আছে; ১ম—যত অধিক পরিমাণ ইক্ষু কাটিয়া লইতে পারা যায়, ততই ভাল। ২য়—"মুড়াকাটা" বা "চাঁদিমারা" করিয়া আখ কাটিয়া লইতে পারিলে সেই গোড়া হইতে অধিক তেজে গাছ বাহির হয়। যদি একই গোড়া হইতে ৩।৪ বৎসর ইক্ষু জন্মান হয়, তাহা হইলে যতদুর সম্ভব গোড়া ঘেঁসিয়া ইক্ষু কাটা আবশ্যক।

ইক্ষুদণ্ডগুলি কাটিয়া ও ঝুড়িয়া পরিষ্কারভাবে লইয়া আসিয়া মাড়াইকার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। এক বিঘা জমির আখ মাড়িতে এদেশে চারি হইতে আট দিবস লাগিয়া থাকে। দুই জোড়া বলদ, একটা চারি রোলার বেহিয়া মিল, গোটাকতক কলসী বা টিন, গোটাকতক ঝাঁজরি, দুইখানা বড় কড়া, দুইটা উকৃড়িমালা, দুইটা নাদ, খানিক চূণ, এক বোতল ফস্ফরিক এসিড, কয়েকখানা লিটমস পেপার ও একটা তাম্র আচ্ছাদিত তাপমান যন্ত্র (৩০০ ডিগ্রী অবধি তাপ দেখা যায় এরূপ তাপমান যন্ত্র), এই কয়েকটী সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আখমাড়াই আরম্ভ করিতে হয়। চারি রোলার বেহিয়া মিল প্রায় সমস্ত দিবস (অর্থাৎ নয় ঘণ্টা) চালাইলে কেবলমাত্র ২৫ মণ ইক্ষু মাড়াই করিতে পারা যায়। ২৫ মণ ইক্ষু হইতে ১৫।১৬ মণ আন্দাজ রস নির্গত হয় এবং এই রস হইতে ২॥০ মণ আন্দাজ গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। সমস্ত দিবস উনান জ্বলিতে থাকিলে ৫ ফুট ব্যাসের কড়া হইতে চারি বারে ২॥০ মণ গুড় নামিবে, অপর দুইখানি কড়া ব্যবহার করিলে ৬।৭ ঘণ্টায় ২॥০ মণ গুড় নামাইতে পারা যায়। ছয় ফুট ব্যাসের কড়া হইতে প্রত্যহ ৩॥০ মণ গুড় নামান যায়। লোহার কড়া অপেক্ষা মৃত্তিকা-পাত্রে করিয়া রস জ্বাল দিলে গুড় অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায় এলুমিনিয়ম কড়ায় গুড় জ্বাল দেওয়া। মান্দ্রাজ স্কুল অব আর্টসএ এলুমিনিয়মের নাদ, কড়া এবং ঝাঁজরি কিনিতে পাওয়া যায়। পরন্তু আজকাল কলিকাতার মুর্গীহাটাস্থ দোকানদারদিগকে অর্ডার দিলে এ সব পাত্র পাওয়া যায়; পরন্তু ঝাঁজরা এবং কড়া অনেক দিন হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে। বৃহদায়তনে কার্য্য করিতে হইলে বেহিয়ামিল ব্যবহার করাও ঠিক নহে। এককালীন ৬০০ শত বিঘা ইক্ষু লাগাইয়া দুই মাসের মধ্যে এই ইক্ষু মাড়াই করিয়া গুড় প্রস্তুত করিতে হইলে ষ্টীম এঞ্জিন, হরিজণ্টাল রোলার মিল, ও ভেকুয়াম প্যান ব্যবহার করা আবশ্যক। ষ্টিম এঞ্জিন কিনিতে ১৫।১৬ হাজার টাকা ব্যয় হয়। পরন্তু ৬ শত বিঘা ইক্ষুর আবাদের জন্য অন্যান্য সরঞ্জাম কিনিতেও ৫।৬ হাজার টাকা ব্যয় হয়। এই সকল সরঞ্জাম বার্লিন সহরের সাঙ্গার হাউসার এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হয়। বেহিয়ামিলে এককালীন ৩।৪ গাছামাত্র ইক্ষু পেষিত হইয়া থাকে। এই কলের রোলারগুলির ব্যাস ৬ বা ৯ ইঞ্চি। হরিজণ্টাল রোলার মিলের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট এবং প্রত্যেক রোলারের ব্যাস প্রায় ৩০ ইঞ্চি। ৪০ হর্স পাওয়ার এঞ্জিনে

এই রোলার মিল চালাইতে পারিলে প্রত্যহ ৩ হাজার মণ ইক্ষু হইতে ৩০০ শত মণ গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। পরন্তু দুই মাসের মধ্যেই ৬০০ শত বিঘাস্থ ইক্ষু অনায়াসে মাড়িয়া তদ্দ্বারা গুড় প্রস্তুত হইতে পারে।

[ক্রমশঃ।

টাকশাল।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে টাকা প্রস্তুতের জন্য টাকশাল বসাইবার সংকল্প করা হয়। তৎপরে ৫ বৎসর মধ্যেই টাকশালের বাটী নির্ম্মাণ এবং উহার কল ইত্যাদি আনিয়া ফেলা হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে উহাতে টাকা ঢালাই আরম্ভ হয়। তৎপরে ভারতে পর পর তিনটি টাকশাল খোলা হয়। প্রথমটী কলিকাতায়, দ্বিতীয়টী বোম্বাই এবং তৃতীয়টী মান্দ্রাজপ্রদেশে। উপস্থিত দুইটী টাকশাল আছে। মান্দ্রাজেরটী ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে বন্ধ রহিয়াছে।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম যখন এদেশের টাকশালে টাকা ঢালাই হয়, তখন এদেশ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর শাসনাধিকারে ছিল। তবে এখন যেমন ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের শাসনাধিকারভুক্ত, এইরূপ মাত্র। নচেৎ সে সময় ইংলণ্ডের শাসনভার মহারাণীর, তাই ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর আমলেও ভারতের টাকায় মহারাণীর মুখ অঙ্কিত ছিল। এই প্রতিমূর্ত্তিতে মহারাণীর মস্তকে মুকুট নাই, কেবল খোপা বাঁধা চুল এবং মুখ হইতে গলা পর্য্যন্ত আছে। সাধারণতঃ এই টাকাকে "বড়কলের টাকা" বলে। ইহার শব্দও এখনকার টাকাপেক্ষা অন্য সুরের। ১৮৪০—৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই টাকা প্রস্তুত হয়। এখনও এই টাকা অনেক দেখা যায়। এক শত মুদ্রা গণনা করিতে অন্ততঃ ৮।১০টা পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই টাকাই ছিল; কিন্তু ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে এই টাকার অন্য একটি সংস্করণ বাহির করা হয়।

ইহারও মূর্ত্তি অবিকল "বড়কলের" টাকার মত, কিন্তু ইহা দেখিতে একটু ছোট আকারের মাত্র। অধিকন্তু এই টাকা এখন আর প্রায় দেখা যায় না। পরন্তু গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের করেন্সি অফিসে এই দ্বিবিধ টাকা অনেক ধরিয়া উহা গালাইয়া নূতন আকৃতি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখনও ইহা ধরা হয়, অর্থাৎ করেন্সিতে ইহা গেলে, তথা হইতে বাজারে ইহাদের আর ছাড়া হয় না। তবে বড়কলের নূতন সংস্করণ যত কুড়ান হইয়া গিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে "বড়কলের" টাকা এখনও তত কুড়ান হয় নাই, তাই অদ্যাপি ইহা কুড়ান হইতেছে। পরন্তু বাজারে ও বড় বড় ধনী লোকেরা ইহা বাছিয়া লয়েন না, তাহাও দেখা যায়।

যাহা হউক, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর নিকট হইতে মহারাণী নিজ হস্তে ভারত-শাসনভার গ্রহণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে রাজ্য সম্বন্ধে উক্ত পরিবর্ত্তনের জন্য টাকার ছাপও পরিবর্ত্তন করা হয়, অর্থাৎ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে টাকার "ডাইস" বদলাইয়া দেওয়া হয়, এবার হইতে মহারাণীর সমুকুট-মস্তকযুক্ত টাকা করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে টাকা ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই এই টাকা। পরন্তু এ টাকার গাত্রে "কুইন ভিক্টোরিয়া" বলিয়া লেখা আছে।

এখানে আর একটি কথা আছে। আমরা যেমন প্রত্যহ তারিখ ব্যবহার করি, বৎসরের শেষ হইলে, নূতন বৎসর গণনা করি, পূর্ব্বে টাকশালে কিন্তু এ নিয়ম ছিল না; অর্থাৎ টাকার ডাইস প্রতিসন বদলাইয়া দেওয়া হইত না। এইজন্য ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে টাকা ঢালাই হইয়াছে, উহার গাত্রে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দই লেখা হইয়াছে। তাহার পর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে যখন ডাইস পরিবর্ত্তন করা হইল, তখন হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে টাকা প্রস্তুত হইয়াছিল, উহার গাত্রে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দই লেখা হইয়াছে। এ নিয়ম কিন্তু ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়, অর্থাৎ এই সন হইতে টাকার গাত্রে প্রস্তুতির সন প্রতি বর্ষ লিখিবার পদ্ধতি করা হয়।

তাহার পর, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী সম্রাজ্ঞী হয়েন। এই বৎসর আবার টাকার "ডাইস" বদলাইয়া দেওয়া হয়। এবার টাকার আকৃতির বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। কেবল কয়েকটি টাইপমাত্র অর্থাৎ "কুইনভিক্টোরিয়া" লেখার পরিবর্ত্তে "এম্প্রেস ভিক্টোরিয়া" লেখা হয়। এই টাকাই বাজারে এখন প্রচুর পরিমাণে চলিতেছে।

১৮৯৪ হইতে ৯৬ সালে ভারতে দুইটী টাকশালের কার্য্য রীতিমত চলিয়াছিল। ১৮৯৫ সাল হইতে স্বুবর্ণ-মুদ্রার প্রচলন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর চেষ্টা করিতে থাকেন। এই চেষ্টা আর একবার ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। যাহা হউক, ১৮৯৭ হইতে ১৮৯৮ সালে টাকশালে কার্য্য অল্প হয়। ১৮৯৯ সালে টাকা প্রস্তুত আদৌ হয় নাই। ১৯০১ সালে কলিকাতায় স্বুবর্ণ-মুদ্রা

পোষ্টাপিস বিভাগ হইতে চালান হয়। উপস্থিত শুনা যাইতেছে, পোষ্টাপিস হইতে গিনি দেওয়া বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু করেন্সি খোলা আছে। পরন্তু ১৯০০ সালের টাকা প্রস্তুতের হিসাব গতবর্ষের অগ্রহায়ণ মাসের "মহাজনবন্ধু"তে বলা হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, ভারতের টাকশাল গুলি হইতে যে টাকা এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, উহার মধ্যে ৩৫৫ কোটি টাকা ভারতের চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। বাকী অনেক টাকা গহনা প্রস্তুত হইয়াছে এবং বিদেশে চলিয়া গিয়াছে।

সাধারণ প্রজারা রূপা দিলে, টাকশালে টাকা করিয়া দেওয়া হয় না। কিন্তু মিত্র বা করদরাজ্যের রাজারা টাকশালের খরচা এবং রূপা দিলে টাকা প্রস্তুত করিয়া দিবার নিয়ম আছে। "জয়পুর" "বিকানীর" ষ্টেটের টাকাও টাকশালে প্রস্তুত হয়। কিন্তু ঐ সকল দেশের টাকাতেই "মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তির" ছাপ একদিকে থাকে, এবং উল্টাদিকে ষ্টেটের নাম লেখা এবং তাঁহাদের ভাষায় এক টাকা বলিয়া লেখা থাকে।

ভারতের টাকশাল হইবার পূর্ব্বে চতুর্থ উইলিয়মের প্রতিমূর্ত্তিযুক্ত টাকা এদেশে আসিত। এখনও এ টাকা ২।১টা সাধারণ টাকার সঙ্গে পাওয়া যায়। পরন্তু পূর্ব্বে টাকার ধারে কাঁকর কাটার নিয়ম ছিল না। তখন পয়সার মত ধার ছিল। কিন্তু জুয়াচোরেরা উহা চাঁচিয়া রৌপ্য বাহির করিয়া লইত বলিয়া, বিলাতের প্রসিদ্ধ গণিতবেত্তা সার আইজক নিউটন সর্ব্ব প্রথম ধার কাটা টাকার প্রচলন করেন। টাকশালে টাকা প্রস্তুতের সময় প্রতি টাকায় প্রায় পাঁচ পয়সা খাদ দেওয়া হয় অর্থাৎ অন্য ধাতু এবং শুনা যায়, কিছু বালুকা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। নচেৎ খাঁটিরূপার টাকা শীঘ্র দুমড়াইয়া যাওয়া সম্ভব। তাই খাদ দিয়া টাকার ধাৎ শক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

মালদহের গুটীপোকা।

এখানে রেশমকীটের ভোজ্য তুঁত পত্রের আবাদ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ কোয়া ভেদ করিয়া রেশম কীট নির্গত হইয়াই স্ত্রী পুরুষে জোট লাগিয়া যায়। এই সম্মিলন হইতে ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক বিচ্যুত না করিলে, ইহারা এইরূপ অবস্থাতেই প্রাণাত্যয় ঘটাইয়া থাকে। পুংকীটকে স্ত্রীকীট হইতে বিযুক্ত করিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিতে হয়, এবং সযত্নে একটী ডালায় ঐ স্ত্রীকীট রাখিয়া দিলে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব প্রসব করে। পক্ষী প্রভৃতি ডিম্ব প্রসব করিয়াই যেরূপ তাহার উপর উপবেশন পূর্ব্বক তাপ প্রদান করিতে থাকে, ইহারা সেরূপ করে না; বরং ডিম্বগুলিকে প্রসূতি হইতে দূরে রক্ষা করাই অধিকতর নিরাপদ। এইরূপে ২।৩ দিন গত হইতে না হইতেই ঐ সকল ডিম্ব ভেদ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা নির্গত হয়। এই পোকা তৎকালে আকারে নেত্রলোম হইতে বৃহৎ হইবে না। অতঃপর নূতন কচি তুঁতপত্র অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে কর্ত্তন পূর্ব্বক ঐ সকল পোকার উপরিভাগে ছড়াইয়া দিলে উহারা তাহা ভক্ষণ করিয়া ক্রমে পুষ্ট হইতে থাকে। প্রথম দিন পত্র উপরে ছড়াইয়া দিতে হয়; কিন্তু পরদিন দেখিতে পাওয়া যায়, পোকাগুলি সমস্ত উপরে উত্থিত হইয়াছে। তখন সযত্নে তাহাদিগকে বিভিন্ন স্থানে রক্ষা করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট পত্রগুলি পরিত্যাগ করতঃ পুনর্ব্বার নূতন পত্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে কর্ত্তন পূর্ব্বক গোলাকারে কিছু পুরু ভাবে স্থাপন করিয়া কীটগুলিকে তাহার উপর রাখিয়া দিতে হয়। এইরূপে সপ্তাহ অতীত হইলে তাহাদের শরীরের একটী পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সময় ইহারা একদিন আহার ত্যাগ করে এবং দেখিতে অপেক্ষাকৃত শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে।

এই প্রকারে তিনবার পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে, আর পত্র কাটিয়া দিতে হয় না। তখন পোকাগুলি সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ হইয়া যায়। এই অবস্থায় সপ্তাহ অতীত হইলে ইহারা একবারে আহার পরিত্যাগ করে এবং সম্পূর্ণ স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে। এইরূপ অবস্থাকে পোকা "পরিপক্ক" হইয়াছে বলা হইয়া থাকে। যে গুলির বর্ণ উক্তরূপ না হয়, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া খোপ বিশিষ্ট ডালায় রাখিয়া দেওয়া হয়।

অনন্তর এই সকল কীট অনবরত ঘুরিতে থাকে ও লালা নির্গত করিয়া তদ্দ্বারা আপনাদিগকে আবৃত করিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরেই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক কীট এক একটী স্বর্ণবর্ণ-কোষ-গর্ভস্থ হইয়াছে। ইহাকেই "কোয়া" বলা যায়।

এইস্থানে কোয়াগুলিকে অগ্নির উত্তাপ না লাগাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করা

হয়। নচেৎ কোষগর্ভ বিদীর্ণ করিয়া পোকা বহির্গত হইলে আর তাহা হইতে সূত্র প্রস্তুত করা যায় না। দেখা গিয়াছে, একমণ কোয়া শুষ্ক হইলে বার সের ওজনে হইয়া থাকে। বার সের কোয়ায় দুই সের মাত্র সূত্র প্রস্তুত হয়।

এই জেলার শিবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এই সূত্র দ্বারা সুন্দর সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কার্য্য বিশেষ সাবধান হইয়া করিতে হয়, নচেৎ সমস্ত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম বৃথা হইয়া যায়।

রেশম কীটের মধ্যে এমন এক জাতীয় পোকা আছে, যাহারা পূর্ব্বোক্ত কীটদিগের ন্যায় ঘূর্ণিত হয় না এবং অন্য কীট নষ্ট করিয়া ফেলে। সেই জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত এই জাতীয় কীট বাছিয়া ফেলিতে হয়।

এথানে রেশমবিদ্যাবিৎ একটি সাহেব আসিয়া রেশমপ্রস্তুতকারীদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

শ্রীপার্ব্বতীনাথ চক্রবর্ত্তী।
মালদহ।

দড়ির কারখানা।

আজকাল কলে অনেক প্রকার দড়ি হইতেছে বটে, যদিও কাছি দড়ি কলে হয় বটে, কিন্তু পাটের গাঁইট বাঁধা দড়ি এবং সূতার বাণ্ডিল বাঁধা দড়ির কল অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। অর্থাৎ উক্ত দুই প্রকার দড়ি কলে প্রস্তুত করিলে, কম মজবুত হয়; কারণ কলে পাট ধুনিয়া তূলার ন্যায় করায় পাটের আঁশ নষ্ট হয়। সুতরাং তাহার টান সহিবার শক্তিও কমিয়া যায়। কাজেই কম পোক্তা হয় বলিয়া, উহা হস্তে প্রস্তুত করিলে, আঁশ বজায় থাকায় বিশেষ মজবুত হয়; তাই অদ্যাপি এই শ্রেণীর দড়ির কারখানা এদেশীয়দিগের হস্তে আছে।

কলিকাতার সন্নিকটে ঘুসুড়িতে এই শ্রেণীর দড়ির কারখানা অনেকগুলি আছে। পরন্তু যেখানে জানিবেন, পাটের কিম্বা সূতার কল আছে, সেই স্থানেই এই শ্রেণীর দড়ির কারখানা অনেক আছে। কারণ এই

সকল কারখানায় যে দড়ি প্রস্তুত হয়, তাহা কলওয়ালারাই ক্রয় করিয়া লইয়া থাকেন। অর্থাৎ কলওয়ালাদের কনট্রাক্ট মতই ইহারা এই কারখানায় কাজ কর্ম্ম করেন। প্রতিযোগিতা নাই বলিয়া, এ কার্য্যে প্রায়ই লোকসান হয় না। তবে পাটের বাজার পড়িয়া গেলে, অর্থাৎ পাটের দর কমিলে কিম্বা সূতার দর কমিলে, ইহাদের লাভের ইতরবিশেষ হইতে পারে; পাটের দরে দড়ির পড়তা বাড়িলে কিছু কিছু ক্ষতিও হইতে পারে। অবশ্য এ ক্ষতি যাঁহারা দেন, তাঁহারা এই কারখানা বড় গোছের করেন। শ্রমজীবীদিগের ক্ষুদ্র কারখানায় প্রায় ক্ষতি হয় না।

এই দড়ির কারখানা ১০।২০ হাজার টাকা হইতে ২০।২২ টাকার মূলধন লইয়াও হইতে পারে। যাঁহাদের ১০ হাজার ২০ হাজার টাকার মূলধনের কারবার, তাঁহারা ১০০ শত ২০০ শত লোক খাটাইয়া থাকেন, এবং ইহারা সময়মতে ৫।৭ হাজার বা ততোধিক টাকার পাট ক্রয় করিয়া গুদামে মজুত রাখেন, এবং কলওয়ালা সাহেবদিগের নিকট অতিরিক্তভাবে কনট্রাক্ট লইয়া থাকেন; কাজেই ইহাদের কারবার বড়ভাবে চলে। নচেৎ মাঝারি গোছের দড়ির কারখানা ৫০।৬০ জন শ্রমজীবী লইয়া, ৫০০।৬০০ শত টাকা মূলধন লইয়াও চালান যায়।

দড়ি পাকাইবার জন্য ইহারা পূর্ব্বে এদেশীয় বুদ্ধি অনুসারে একপ্রকার কল ব্যবহার করিতেন। তাহাকে “ঘুড়ঘুড়ি” কল বলা হইত। এখনও ইহা সামান্য ভাবে আছে। পরন্তু এই কলের নানাবিধ সংস্করণ আজকাল বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে; এবং ইতিমধ্যে কলিকাতাস্থ জোসেফ এণ্ড কোম্পানী প্রভৃতির লৌহ-কারখানায় উক্ত বিলাতী কলের অনুরূপ এদেশী কলও প্রস্তুত হইতেছে। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত বিলাতী কলের মূল্য ২০৲ টাকা মাত্র এবং দেশী কলের মূল্য আরও অনেক কম। তবে বিলাতী কলের সঙ্গে এদেশী কলের প্রভেদ এই যে, বিলাতী কলগুলির সমুদয় অংশ লৌহনির্ম্মিত, পরন্তু দেশী কলগুলির কতক অংশ লৌহময় মাত্র।

যাহা হউক, উক্ত দড়ি পাকাইবার কলের অবস্থা এই যে, মনে করুন, আমরা মাছ ধরিবার যে হুইল ব্যবহার করি, উক্ত হুইলের যে হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া, সূতা জড়াইয়া থাকি, সেই হ্যাণ্ডেল যে পৃষ্ঠে আছে, উহার অপর পৃষ্ঠে যদি একটী গুণছুঁচের মত ক্ষুদ্র দণ্ডে ছিদ্র করিয়া

দিয়া, সেই ছিদ্রে পাট বাঁধিয়া যদি হুইলের হ্যাণ্ডেলটী ঘুরাইতে থাকি, তাহা হইলে কি হয়? দড়ি পাকান হইয়া যায়। যদিও দড়ি পাকান যন্ত্র মৎস্যধরা হুইলের মত নহে, তবে আমরা উদাহরণস্বরূপ এই বলিতেছি যে, উক্ত মৎস্যধরা হুইলের পরবর্ত্তী কারণেই দড়ি পাকান যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। উহার আকৃতি এইরূপ ;—

টাকার ধারে যেমন কাঁকরকাটা দাগ আছে। ঐ শ্রেণীর দাগগুলি উচ্চে বড় করিলে কি হয়? দাঁতওয়ালা চাকা হয়। এই শ্রেণীর এক খানি বড় চাকা চারিপার্শ্বে মালান করিয়া অপর চারিখানি অপেক্ষাকৃত ছোট দাঁতওয়ালা চাকা, কৌশলে সাজাইয়া দিলে কি হয়? বড় চাকাখানি ঘুরাইলে ছোট চারিখানি চাকা ঘুরিতে থাকে। পরন্তু উক্ত পাঁচখানি চাকাতেই পাঁচটী ছুচের মত দণ্ড আছে, তাহাদের গাত্রে পাট বাঁধিয়া দিয়া ঘুরাইলে একবারে পাঁচ থাই বা পাঁচ গাছা দড়ি পাকান হয়। ইহা হইল "এক তারের" দড়ি ; এইরূপে তার বেশী করিয়া ইঞ্চি হিসাবে দড়ির স্থূলতা করা হয়। এই শ্রেণীর কলে গাঁট বাঁধা দড়ি হইতে বড় বড় কাছিদড়ি পর্য্যন্ত হইতে পারে।

দড়ির কারখানাগুলি বারইয়ারীতলার আটচালার মত খুব লম্বা ভাবের ঘর। দীর্ঘে ১০০ শত হস্ত এবং প্রস্থে ৩২ হস্ত আটচালা বাঁধা ঘর হইলে, তাহাতে অন্ততঃ উক্ত কল ১৬টা বসান চলে। পরন্তু ১৬টা কল ঘুরাইতে ১৬টা কুলি বা শ্রমজীবী ব্যক্তি চাই। প্রত্যেক শ্রমজীবীতে প্রত্যহ ২০।২২ গাছা ৪ তারের দড়ি পাকাইতে পারে। অধিকন্তু এই দড়ি পাকাইবার শ্রমজীবীদিগকে ২।১ দিন এ বিষয় কিছু শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ইহারা একার্য্যে পারদর্শী হইয়া উঠে। এই সকল শ্রমজীবীদিগের মাহিনা নাই, ইহারা ফুরাণে কার্য্য করে। ১৭ বাম দীর্ঘ এক গাছি ৪ তারের দড়ি পাকাইয়া দিলে, দুই পয়সা (বাঙ্গালা পয়সা) মজুরি পায়। অতএব কুড়ি গাছা দড়ি পাকাইতে পারিলে দশ আনা পায়, অর্থাৎ ইহারা প্রত্যহ এক একজনে আট বা দশ আনা উপায় করে।

মানুষের দুই হস্ত লম্বা করিলে (উর্দ্ধদিকে নহে দক্ষিণ বাম দিকে) যত বড় হয়, তাহাকে "বাম" বলে। বোধ হয়, এই "বাম" হইতেই "বাঁও" কথার উৎপত্তি হইয়াছে। এদেশের অনেক স্থানের মাঝিরা "বাঁও" শব্দ

ব্যবহার করে। এখানে "বিশ বাঁও" জল, এরূপ আমরা শুনিয়াছি। ফলে বাম বা বাঁও পরিমাণে কিন্তু ৩॥০ হস্ত। দড়ির কনট্রাক্টে বাম লেখা থাকে। প্রত্যেক গাছি দড়ি ১৭ বাম দীর্ঘ হয়। পরন্তু এই এক গাছি দড়ির মূল্য কনট্রাক্ট রেটে কখন ছয় আনা, সাড়ে ছয় আনা এবং বড় জোর ।৶০ আনা হয়। অধিকন্তু ১৭ বাম দীর্ঘ একগাছি দড়ি প্রস্তুত করিতে অন্ততঃ /২ সের পাট লাগে। অতএব ধরুন, একজন শ্রমজীবী একদিন ১৭ বাম হিসাবে ২০ গাছা দড়ি পাকাইল। তাহার হিসাব,—

খরচ।—	
প্রত্যেক গাছায় /২ হিসাবে ২০ গাছায় পাট লাগে ১/০ মণ দাম	৪॥০
শ্রমজীবীর মজুরি প্রত্যেক গাছায় ৴১০ হিসাবে … …	॥৵০
মোট	৫৵০
জমা।—	
উপস্থিত কনট্রাক্টরেট প্রত্যেক গাছা ।৶০ হিসাবে ২০ গাছায় …	৮৸০
লাভ	৩॥৵০

ইহা একটা কলের এবং একজন শ্রমজীবী দ্বারা প্রাপ্য মনে রাখিতে হইবে। ৪ গাছা দড়ি যখন একটা কলে একবারে হয়, তখন একটা লোকে সমস্ত দিনে ২০ গাছা দড়ি পাকাইবে কেন? বরং বেশী পাকাইবে? তাহা নয় ; উক্ত কলের প্রত্যেক হুইলের প্রত্যেক নিডিলের অর্থাৎ ছুচের গায়ে লাগাইয়া যে পাট পাকান হয়, উহা ছুচের ছিদ্রের তারতম্যানুসারে দড়িও স্থূল সূক্ষ্মের তারতম্য হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ প্রথম পাকের দড়িকে ১ তার বলে। কলিকাতার গরীব দুঃখীর বিধবা স্ত্রীলোকে টেকো দিয়া পাটের দড়ি যাহা করিয়া দেয় এবং যাহাতে বেণের দোকানে মশলার ঠোঙ্গা বাঁধা হয়, ইহাই ১ তার দড়ি। আবার ঐ তার খুলিয়া, উক্ত কলের নিডিল বদ্‌লাইয়া দিয়া উহার দুই তার একত্র পাকাইতে হয়। এইরূপ ক্রমে ৪।৬ তার বা ততোধিক তার পাকান চলে। অর্দ্ধ ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চি বা ততোধিক ইঞ্চি যেমন অর্ডার দিন, সেইমত স্থূলের দড়ি উক্ত কলে পাকান যাইতে পারে। কিন্তু আমরা ৪ তার স্থূল এবং ১৭ বাম দীর্ঘ দড়ির পড়নের পরিশ্রম উপরে লিখিলাম।

ঘুড়ঘুড়ী কল দুইচির বাঁশের খুঁটী খাড়া করিয়া পুঁতিয়া তাহাতে কয়েকটী ছাঁদা করা হয়। একটী ছাঁদায় তল্‌দাবাঁশের নল, অপরটীতে নলযুক্ত

টাকু বা গুনছুচের ন্যায় একটী লৌহ-শলাকা থাকে। পাকটী একাভিমুখ বা একানুবর্ত্তী হইবার জন্যই উপরের তল্‌দাবাঁশের নলটীর প্রয়োজন। বামহস্তের দড়ির টানেও টাকু যে দিকে ঘুরিবে, দক্ষিণহস্তের দড়ির টানেও টাকু সেই দিকে ঘুরিবে। এই একানুবর্ত্তনে ঘূর্ণন সৌকার্যার্থক টাকুর উপরে একটী লেদা বাঁশের নলের সহিত টানারজ্জুর ফের করা হয়। এই উভয় রজ্জুই একই আবর্ত্তে অনুবর্ত্তিত হইয়া সূত্রে পাক লাগাইয়া থাকে। যেমন বিলাতী কলের সাহায্যে একবারে ৫ গাছি দড়ি বা কাছি প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তেমনই একটী ঘুড়্‌ঘুড়ী কলেও অনেক টাকু ঘুরিয়া বিভিন্ন টানারজ্জুর যোগে একবারে একজনে ৪ হইতে ৬টী পর্য্যন্ত সূত্র প্রস্তুত করিতে পারে।

সিমেণ্ট ও বিলাতীমাটী।

যে সকল পাথরে শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ কর্দ্দম, চাখড়ি, মরিচা (Oxide of iron) ও কার্ব্বনেট অব ম্যাগনেসিয়া থাকে, তাহা উত্তমরূপে পোড়াইয়া যে সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়, তাহাকে স্বাভাবিক সিমেণ্ট বলে। চূণে পাহাড়ে এই শ্রেণীর প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উহা ঈষৎ ধূম্রবর্ণের এবং উহার অণুগুলি দৃঢ় সংবদ্ধ উহার ভগ্নস্থান পরীক্ষা করিলে কঠিন মৃত্তিকা বলিয়া বোধ হয় এবং পোড়াইলে ২ অংশ ভার কমিয়া যায়। এই প্রস্তরের সিমেণ্ট খুব শীঘ্র দৃঢ় হয় বটে, কিন্তু শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প। ভাঁটিতে পোড়াইবার সময় অধিক উত্তাপ পাইলে গলিয়া চাপ বাঁধিয়া যায়। অতিরিক্ত লৌহ থাকিলে এইরূপ ঘটে। পাথর পোড়ান হইলে তাহাকে উত্তমরূপে গুড়া করিয়া ও বায়ুশূন্য পাত্রে রাখা হয়। দৃঢ়বদ্ধ কাঠের পিপায় সিমেণ্ট প্যাক করিয়া রাখা হয়। এই প্রস্তরের সিমেণ্টের একটী দোষ এই যে, উহার উপাদান পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয়। সুতরাং উহার বস্তুগত গুণের পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

রোমান সিমেণ্ট স্বভাবজাত সিমেণ্টের মধ্যে প্রধান। স্পর্শ করিলে নরম বোধ হয়, আঙ্গুলের মধ্যে স্পৃষ্ট করিলে ময়দার মত বোধ হয় এবং জিহ্বাগ্রে লাগিয়া থাকে। অনাবৃত স্থানে রাখিলে দ্রাম্লাঙ্গার বায়ু হইতে টানিয়া লয় এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ রোমান সিমেণ্ট প্রতি বুসেল ৭৫ পাউণ্ড ওজনের হইয়া থাকে। ইহার বিশিষ্টগুণ এই যে, শীঘ্র দৃঢ় হয়। সুতরাং জল মধ্যে ইহার ব্যবহার কার্য্যকর। সময় সময় মিতব্যয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া,—সিমেণ্টের সহিত ১৷০ হইতে ১ ভাগ পর্য্যন্ত বালি মিশ্রিত করা হয়।

কৃত্রিম সিমেণ্ট,—ভারতে সিমেণ্ট প্রস্তুত হয় না। তাহার প্রধান কারণ এতদ্দেশে সিমেণ্টের উপযোগী উপকরণ সামগ্রী পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডে টেম্‌স্‌ ও মেড্‌ওয়ে নদীর কর্দ্দম হইতে কৃত্রিম সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়। এই নিমিত্ত সাধারণ লোকে ইহাকে বিলাতী মাটী কহে। জেনারেল প্যাস্‌লে ইহার আবিষ্কারক।

কৃত্রিম সিমেণ্টের উপাদান ঃ—

(১) ওজন অনুসারে ৪ ভাগ বিশুদ্ধ চা-খড়ি।

(২) ” ” ৫.৫ ” মেডওয়ে নদীর নীলাভ কর্দ্দম।

অথবা একের ৯০ ভাগ ও দুইয়ের ১৩৶০ ভাগ; প্রতি ঘনফুট কর্দ্দমের ওজন ৯০ পাউণ্ড ও শুষ্ক চা-খড়ি চূর্ণ ৪০ পাউণ্ড।

সতর্কতা,—উক্ত কর্দ্দম ১৮ ইঞ্চি পাঁকের তলা হইতে লইতে হয়, ও তাহা টাট্‌কা হওয়া দরকার।

এক এক তাল কর্দ্দম ও খড়ি মিশ্রিত করতঃ “পগমিলে” সম্পূর্ণরূপে সংস্পৃষ্ট ও মিশ্রিত করিতে হয়। তৎপরে উক্ত কাঁচা সিমেণ্টের ২৷০ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত গুলি পাকাইয়া ভাঁটিতে কোক্ কয়লা ও গুলি সমুদায় স্তরে স্তরে সাজাইয়া পোড়াইতে হয়। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল পোড়াইলেই যথেষ্ট। পরে তলা হইতে পোড়ান ভাঁটাগুলি লইয়া হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্বারা পোড় পরীক্ষা করিতে হয়। তৎপরে খুব সূক্ষ্মভাবে ঐ গুলি গুঁড়া করিলেই সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়। পরে বাক্সের মধ্যে পুরিয়া উত্তমরূপে বন্ধ করিলেই হইল।

এই প্রথা ভিন্ন অন্য উপায়ে উহা করা চলে, তাহাতে খরচা কম পড়ে। খড়িমাটি পোড়াইয়া চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিতে হয়। পরে পূর্ব্বোক্ত কর্দ্দমের সহিত মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে গুলি পাকাইয়া পোড়াইতে হয়।

নিম্নলিখিত সিমেণ্ট প্রস্তুত-প্রকরণকে Wet Process কহে;—৪ ভাগ

খড়িচূর্ণ ও এক ভাগ কর্দ্দম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘোলের মত তরল মিশ্রণ করিতে হয়। পরে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভাসমান অণুগুলিকে থিতাইতে দিতে হয়। নিম্নস্থ সারভাগ জমাট বাঁধিয়া শক্ত হইলে উপরের জল ফেলিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে "পগমিলে" ফেলিয়া মিশ্রিত ও ভাঁটিতে দগ্ধ ইত্যাদি করিলেই হইল। ইহাকে "পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট" কহে। ইহার রং পাথরের মত। ইহা অত্যুৎকৃষ্ট কৃত্রিম সিমেণ্ট। ইহা ভিন্ন কৃত্রিম সিমেণ্ট আরও বিবিধ উপায়ে প্রস্তুত হয়। তাহার বিস্তৃত বিবরণী "শিবপুর কলেজ পত্রিকায়" লিখিত হইয়াছে।

শিবপুর কলেজ,—শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ছোট আদালত।

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন পরিবর্ত্তিত হইবার কথা হইয়াছে। কি ভাবে তাহা সঙ্ঘটিত হইবে, তাহার পাণ্ডুলিপি ইণ্ডিয়া এবং স্থানীয় গেজেট সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব জুলাই মাস হইতে এই পাণ্ডুলিপি স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এবং বিভিন্ন হাইকোর্ট হইতে বড়লাট বাহাদুরের নিকট দাখিল হইবে। তৎপরে অবসরপ্রাপ্ত কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি রাম্পিনী মহোদয় ভারতে আসিয়া কিছুদিনের জন্য এই আইনের প্রবর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিবেন এবং যথাকালে আইন পাস হইবে। অধিকন্তু উক্ত পাণ্ডুলিপিতে ডাকে সমনজারীর একটা ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইয়াছে। এখন যেরূপ সমনজারীর ব্যবস্থা আছে, তাহা সেইরূপই রাখা হইয়াছে,—প্রভেদ কেবল শ্রেণীবিশেষের বা সকল মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমনাদি ডাকে জারি হইবে। ভারত-গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা-সচিব মাননীয় রালে মহোদয় মনে করেন, তাহা হইলে নষ্টবুদ্ধি দুষ্ট পেয়াদাদিগের উৎকোচের সাহায্যে অন্যায় কার্য্য আর সংঘটিত হইবে না।

ডাকে সমনজারী হওয়া উচিত, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। মহাজন এবং জমীদার পক্ষে আদালতের পেয়াদাদিগের আব্দার বড়ই ভয়ঙ্কর; বিশেষতঃ কলিকাতার আদালতগুলির পেয়াদারা যেন গুরু দেবের মত! অথবা ইনিই যেন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা! সমনের গায়ে লেখা আছে, ঘুস দেওয়া বা ঘুস লওয়া জানিতে পারিলে উভয়েরই দণ্ড হইবে। তবু যে ইহা হয়, তাহা যে রালে বাহাদুর জানিয়াছেন, ইহাই ভারতবাসীর সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু ডাকপিয়নে সমনজারী করিলে স্বতন্ত্র পিয়ন কেবল আদালতের জন্য থাকিবে; নচেৎ এ কার্য্য হওয়া সম্ভব নহে। তাহা হইলেই এখন যাহারা আছেন, তাহারাও যে সেইরূপ হইবে না, তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, বর্ত্তমানের পেয়াদাগুলিকে পিয়নের পোষাক পরাইয়া দিলেই রালে মহোদয়ের মতানুসারে ঠিক কার্য্য হইবে। ভগবান জানেন কি হইবে। ফলে আদালতের পেয়াদার অত্যাচার বড়ই অসহ্য। প্রতীকার প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য-বস্ত্রাদি।

আমাদের পাখীর মত পাখা বা পশুর ন্যায় লোম নাই, এ জন্য বস্ত্রাদির আবরণ আবশ্যক। কাপড় লজ্জানিবারণ ব্যতীত শীতকালে শীত নিবারণ করে। বায়ু অধিক উষ্ণ হইলে তাহার তাপ ও রৌদ্রের সময় বাহিরের উত্তাপ শরীরে প্রবেশ করিতে দেয় না। শীতকালে গা ঢাকা থাকিলে শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ শীতল বায়ু দ্বারা নষ্ট হইতে পারে না। কাপড় নিজে উত্তাপের অপরিচালক নহে। উহার ছোট ছোট ছিদ্রের মধ্যে যে শুষ্ক বায়ু থাকে, তাহা অত্যন্ত অপরিচালক। এ জন্য যে কাপড়ে যত অধিক বায়ু থাকে, তাহা তত অধিক অপরিচালক। তূলার লেপ, কম্বল, ফ্লানেল-কাপড় প্রভৃতি এই কারণে শীত নিবারণ করিতে অধিক উপযোগী। কাপড় দেহে অল্প ঢিলাভাবে ব্যবহার করিলে, শরীর ও বস্ত্রের মধ্যে যে স্থান থাকে, তাহাতে কতকটা শুষ্ক বায়ু আবদ্ধ থাকে, এ জন্য অধিক টান অপেক্ষা কিছু ঢিলা বস্ত্রে অধিক শীত নিবারণ করে। রবার ও চর্ম্মের কাপড়ের ভিতর দিয়া বায়ু একবারে চলাচল করিতে পারে না; এ জন্য ঐ কাপড় গায়ে থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শীত নিবারণ হয়। তুরস্ক ও অন্যান্য দেশে শীতকালে চর্ম্মের বস্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়।

শরীর গরম আছে এমন সময় হঠাৎ শীতল বায়ু গায়ে লাগিলে বিবিধ প্রকার পীড়া হইতে পারে, কিন্তু শরীর কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকিলে তাহা হইতে

পারে না। কার্পাস, রেশম, তসর, রবার ও চর্ম্ম কাপড়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। অসভ্য দেশের লোক গাছের ছাল, পাতা ও জন্তুর চর্ম্ম ব্যবহার করিয়া থাকে। যোগীরা এইজন্য ভস্ম লেপন করেন।

কার্পাস বস্ত্র—ইহা সুলভ, দৃঢ় ও সহজে জল শোষণ করে না, জল লাগিলে সঙ্কুচিত হয় না ও অধিক দিন ব্যবহার করা যায়। এই সকল গুণ আছে বলিয়া, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয়। কার্পাস পশম অপেক্ষা অধিক উত্তাপ-পরিচালক। কিন্তু পাটের কাপড় (লিনেন) কম পরিচালক।

পশম—ইহা উত্তাপের মন্দ পরিচালক, অধিক জল-শোষক। ইহার প্রত্যেক সূত্রের মধ্যে ও দুই সূত্রের মধ্যবর্ত্তী, এই দুই স্থানেই জল শোষণ করে। উত্তাপের মন্দ পরিচালক ও জলশোষক এই দুইটি অতি প্রয়োজনীয় গুণের জন্য ইহা পাট ও কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পশমের মধ্যে অনেকটা শুষ্ক বায়ু আবদ্ধ থাকে, এ জন্য বাহিরের শীতল বায়ু উহার মধ্য দিয়া পরিচালন দ্বারা শরীরের উত্তাপ নষ্ট করিতে পারে না। এই কাপড়ের দোষ এই যে, ধৌত করিলে সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হয় এবং কিছুদিন ব্যবহার করিলে সূত্র সকল কঠিন ও সঙ্কুচিত হয়, তখন উহা উত্তমরূপে জল শোষণ করিতে পারে না ও অপরিচালকতা গুণ কম হওয়াতে শীত নিবারণ ভালরূপ হয় না, এ জন্য পুরাতন পশম বা ফ্ল্যানেল নূতন অপেক্ষা অনেক কম জল-শোষক ও শীতনিবারক। পাঠকগণ যেন পুরাতন ফ্ল্যানেল ও পশম ব্যবহারকালে এই কথা মনে রাখেন। অনেকের বিশ্বাস, ফ্ল্যানেল ও পশম অত্যন্ত গরম, কিন্তু উহাদের নিজের গরম গুণ কিছুই নাই। ইহারা অপরিচালক, এ জন্য গায়ে থাকিলে শরীরের উত্তাপ অধিক নষ্ট হইতে পারে না, এ জন্যই প্রকারান্তরে গরম।

মেরুণো—কার্পাসের সহিত শতকরা ২০'৫০ অংশ পশম মিলাইলে মেরুণো প্রস্তুত হয়, ইহার গুণ কার্পাস ও পশমের মধ্যবর্ত্তী। এই কাপড়ে গেঞ্জিফ্রক হয়। ইহা উত্তম ঘর্ম্ম-শোষক, কিন্তু গায়ে টানভাবে থাকা উচিত নহে।

লিনেন (পাটের কাপড়)—ইহা তিসি বা মসিনা জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের ত্বক (ছাল) হইতে প্রস্তুত হয়। এই কাপড় কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা কিছু অধিক উত্তাপ পরিচালক, জলশোষক ও কোমল (মলায়েম)। সাহেবরা কাপড়ের ভিতর ইহা অধিক ব্যবহার করে।

জুট—ইহাও লিনেনের ন্যায় এক প্রকার গাছের ছাল। ইহা লিনেনের মত বটে, কিন্তু কিছু মোটা।

তসর ও গরদ—এই প্রকার বস্ত্র অত্যন্ত দৃঢ়; এ জন্য অনেক দিন ব্যবহার করা যায়। ইহার কাপড় উত্তম; কিন্তু মূল্য এত অধিক যে, অনেক লোক ব্যবহার করিতে পারে না।

চামড়া ও রবার—বৃষ্টির সময় এই প্রকার বস্ত্র অত্যন্ত উপকারী। অত্যধিক শীত নিবারণ জন্য ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ইহাদের মধ্য দিয়া ঘর্ম্ম বহির্গত হইতে পারে না ও বায়ু চলাচল হয় না; এ জন্য অন্যান্য সময় অত্যন্ত সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

এ ভিন্ন অন্যান্য অনেক প্রকার কাপড় আছে, কিন্তু তাহার সচরাচর ব্যবহার হয় না। পরিশ্রমের পর মোটা কাপড় গায়ে দিলে, ঘর্ম্ম বাষ্পাকারে নির্গত ও বস্ত্রে ঘনীভূত হইয়া জল হয়। বাষ্প জল হইবার কালে তাহা হইতে গুপ্ত তাপ বাহির হয়। ঐ তাপ দ্বারা শরীর বেশ গরম হয়। পরিশ্রমের পর কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা হাল্কা পশমী কাপড় অথবা পশম ও সূতার দ্বারা প্রস্তুত কাপড় (মেরুণো) অধিক উপকারী। যে সকল ব্যক্তির সর্ব্বদা সর্দ্দি হয়, অথবা যাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল, শীতকালে তাহাদের গায়ে প্রথমে ফ্ল্যানেল দিয়া তাহার উপর একখণ্ড (সেময়িজ) ছাগচর্ম্ম বন্ধন করিলে অধিক উপকার হয়। ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় এক টুকরা ফ্ল্যানেল কাপড় পেটের উপর বান্ধিয়া রাখিলে অনেকের মতে তাহা ওলাউঠার আক্রমণ নিবারণ করে। ইংরাজীতে ইহার নাম 'কলেরা-বেল্ট'। রাত্রিকালেই শৈত্য লাগিবার অধিক ভয় এবং রাত্রিকালেই অধিকাংশ ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হয়; এ কারণ উক্ত ফ্ল্যানেল কেবল রাত্রিকালে বন্ধন করিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হয়। বিবিধ প্রকার কাশী ও সর্দ্দি প্রভৃতি রোগে ফ্ল্যানেলের পিরাণ ও উলের মোজা অত্যন্ত উপকারী। শিরঃপীড়া রোগে উলের মোজা বিলক্ষণ উপকার করে।

শীত নিবারণ—এই কার্য্যে পাট ও কার্পাস অপেক্ষা পশম অধিক উপকারী। অত্যধিক শৈত্যে চামড়া ও জল-বায়ু-রোধক রবার প্রভৃতি অধিক প্রয়োজনীয়।

উত্তাপ নিবারণ—সাক্ষাৎভাবে সূর্য্যের কিরণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বস্ত্রের নির্ম্মাণ অপেক্ষা বর্ণের দিকে লক্ষ্য করা অধিক আবশ্যক। শ্বেত

বর্ণের বস্ত্র উত্তাপ-বিকীরণ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তৎপরে পাঁশুটে, পীত, ঈষৎ গোলাপী, নীল ও পরিশেষে কৃষ্ণ। কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রাদি অত্যন্ত উত্তাপ-পরিচালক, এজন্য উষ্ণপ্রধান দেশে ব্যবহার করা ভাল নয়। সাদা কাপড় গরম দেশের জন্য অতি উত্তম। ধূসর বর্ণও মন্দ নহে। ছাতা ও টুপি সাদা কাপড়ের হইলে অধিক উপকারী।

ঘর্ম্মশোষক—পশম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

গন্ধশোষক—এই ধর্ম্ম বস্ত্রের বর্ণের উপর অনেকটা নির্ভর করে। কাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তৎপরে নীল, লাল, হরিৎ ও পীত; শ্বেতবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা কম গন্ধ শোষণ করে। যে সকল বস্ত্রে আর্দ্রতা শোষণ করে, গন্ধও তাহাতে অধিক শোষণ করে। এজন্য পশম অন্যান্য বস্ত্র অপেক্ষা অধিক গন্ধশোষক।

ম্যালেরিয়া-নিবারক—খালি গায়ের উপর ফ্ল্যানেল ব্যবহার করিলে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ অনেক কম হয়। আফ্রিকা দেশে বহুবিধ পরীক্ষায় ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

শৈত্য, উত্তাপ, আর্দ্রতা ও আলোক হইতে মস্তক রক্ষা করিবার জন্য কোন প্রকার আবরণ আবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গদেশের লোক এ বিষয়ে পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। মাথায় একটী সাদা কাপড়ের টুপি অথবা পাগড়ী ব্যবহার করা উচিত। মাথার আবরণ এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে মাথায় চাপ না পড়ে, ও ঘর্ম্ম সহজে বহির্গত হইয়া যাইতে পারে। মাথার চুল ও আবরণের মধ্যে একটু ফাঁক থাকিলে ও আবরণ হাল্কা হইলে এবং উহা আবশ্যকমতে বড় হইলে সকল উদ্দেশ্য সাধন হয়।

বস্ত্র ব্যবহার বিষয়ে কয়েকটী সাধারণ নিয়ম।

(১) কাপড় সর্ব্বদা পরিষ্কার ও শুষ্ক হওয়া আবশ্যক। (২) বর্ণ সাদা অথবা ঈষৎ রঞ্জিত হইবে। (৩) ঘর্ম্ম লাগিয়া ভিজিলে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা উচিত। (৪) সংক্রামক রোগীর (হাম, বসন্ত, ওলাউঠা ইত্যাদি) নিকট যাইতে হইলে রেশম, পশম প্রভৃতি প্রাণীজ ও রং করা, বিশেষতঃ কাল বর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করিবে না। এই প্রকার বস্ত্র সংক্রামক বিষ অধিক আকর্ষণ ও সংশোষণ করে। (৫) কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্র যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল। (৬) অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র ও গামছা কখনও ব্যবহার করিবে না। (৭) নূতন কাপড় ধৌত না করিয়া ব্যবহার নিষিদ্ধ। (৮) সর্ব্বদা দেহ ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। নিদ্রাকালে এ বিষয়ে মনোযোগ করা আবশ্যক। (৯) বস্ত্রাদি বেশ ঢিলাভাবে থাকা উচিত। টান হইলে অঙ্গ-পরিচালন, রক্ত-চলাচল, শ্বাস প্রশ্বাস ও পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। (২০) ভিজে কাপড় ব্যবহার অপেক্ষা উলঙ্গ থাকা অনেক ভাল, অর্থাৎ কদাচ ভিজে কাপড়ে অনেক ক্ষণ থাকিবে না। (১১) আজকাল উলের টুপি ও কমগোর্টার অনেকে ব্যবহার করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, উলের মোজা ইত্যাদি দ্বারা পা গরম না রাখিলে শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। (১২) আমাদের দেশে হঠাৎ বায়ুর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়, এজন্য বস্ত্রাদির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। তাহা না হওয়ায় অনেকের সর্দ্দি, কাশী, জ্বর, পেটের ব্যারাম প্রভৃতি রোগ জন্মে। (১৩) বস্ত্রাদির অসচ্ছলতা বা অযথা ব্যবহারে আমাদের দেশীয় লোকের অনেক রোগ জন্মে। ধুতি, পিরাণ, উড়ানি স্বাস্থ্যের পক্ষে যেরূপ উপযোগী, টান কোমরবন্ধ, টান গলাবন্ধ, সটান পাজামা, টান কোট (নাগপাশ) সেরূপ উপযোগী নহে। স্ত্রীলোকদের শাটী (সাড়ী) শত সহস্র গুণে বিলাতী অপ্সরা ফ্যাসানের গাউন ও টান কোমরবন্ধ অপেক্ষা স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক উপযোগী। তথাপি মন মানে না, বাঙ্গালী নকল সং সাজিতে (কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া কাচের আদর করিতে) অধিক ভালবাসে। ইডেন গার্ডেনে (স্বর্গীয় উদ্যানে) বেড়াইতে গেলে মাঝে মাঝে দেখা যায় যে, ইয়ুরোপীয়ান মহিলা-মহলে ধীরে ধীরে সাড়ীর আদর বাড়িতেছে, আর পোড়া বাঙ্গালা দেশের সকলই অদ্ভুত! সুশিক্ষার এমনই মহিমা যে, কোন কোন সুশিক্ষিতা মহিলার প্রিয়তম স্বামী এই মেম-টান-কাপড়ের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন ও অনেকে গুরুতর রোগাক্রান্ত হইয়া থাকেন, এরূপ ঘটনা-সম্বলিত সংবাদ মাঝে মাঝে সংবাদপত্রাদির শ্রীঅঙ্গ শোভিত করে।

শ্রীচুনীলাল রায়।

বৈদ্যুতিক ট্রাম।

বিগত ২৭ মার্চ্চ (১৯০২) ১৩ই চৈত্র (১৩০৮) বৃহস্পতিবারের বারবেলায় কলিকাতার খিদিরপুর লাইনে বিদ্যুৎ-শক্তি সংযোগে ট্রামগাড়ী চালান হইয়াছে। ক্রমে সমুদয় লাইনে এই গাড়ী চলিবে। বৈদ্যুতিক উপায়ে শকট পরিচালন চিন্তা প্রথম যাঁহার মনে উঠে, সেই মহাত্মার নাম রবার্ট ডেভিডসন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা ও গ্লাসগো রেলপথে তিনি প্রথম বৈদ্যুতিক শকট পরিচালনা করেন; দুই বৎসর অতীত না হইতেই রুশিয়ার সেণ্টপিটার্স নগর নিবাসী মহাত্মা জেকবী নেভা নদীর উপর গ্লোবস্‌ ব্যাটারীর সাহায্যে বোট সুন্দররূপে পরিচালনা করিয়া দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। গ্যালভানিক ব্যাটারী হইতে এইরূপ শকট-পরিচালন-শক্তি উৎপন্ন করা দুঃসাধ্য না হইলেও ইহার ব্যয় এত অধিক যে তাহা নির্ব্বাহ করিয়া কেহ যে লাভবান হইবেন, সে আশা দুরাশা। এই কারণে ৪০ বৎসর কাল এ কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। অবশেষে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ওয়ার্ণার সিমেন্‌স্‌ বার্লিন প্রদর্শনীতে সুলভ বৈদ্যুতিক রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়া সকলের প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন। ধরিতে গেলে, ইহাই বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক শকট পরিচালনার প্রারম্ভ। যে প্রণালীতে এই রেলগাড়ী পরিচালিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'ডাইনামো মোটর' প্রণালী। ডাক্তার সিমেন্‌সের বৈদ্যুতিক প্রণালীর সফলতা উপলব্ধি করিয়া লোকে তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে যখন প্রস্তুত হইল, তখন তিনি ১৮৮১ সালে লিচটার ফিল্ড, ১৮৮২ সালে সাক্সনির অন্তর্গত জ্যাঙ্কারোড এবং ১৮৮৩ সালে হোহেন জলারেন্ড কয়লার খনিতে এই রেলপথ নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে আয়র্লণ্ডে পরটাস হইতে বুসমিলের পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক ট্রাম খোলা হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের সর্ব্বত্রই বৈদ্যুতিক শকট পরিচালনা আরম্ভ হইয়াছে। আমেরিকাও ইংলণ্ড হইতে কোন অংশে হীন নহে, বরং ১৮৮৩ সালে সিকাগো প্রদর্শনীর পর হইতে এই দেশে অনেক বৈদ্যুতিক রেলপথ খোলা হইয়াছে। যুক্তরাজ্যে বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক ট্রাম সংখ্যা বিংশতির অপেক্ষাও অধিক। সুবিখ্যাত এডিসন ইহার অনেকগুলির পেটেণ্ট নিজেই উদ্ভাবন করিয়া দিয়াছেন।

যেখানে যত প্রকার বৈদ্যুতিক ট্রাম বা রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, শ্রেণী বিভাগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে দুইটী বিভিন্ন প্রণালীতে বৈদ্যুতিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। একটী প্রণালীর নাম 'ষ্টোরেজ সিষ্টেম'—ইহাতে ব্যাটারী প্রত্যেক শকটে সন্নিবিষ্ট থাকে এবং প্রত্যেক শকটই স্ব ইচ্ছায় চলিতে পারে। আজ কাল কলিকাতায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে মোটর কার নামক যে দুই একখানি শকট দ্রুতবেগে চৌরঙ্গী পথে ছুটিতে দেখা যায়, তাহার কার্য্যপ্রণালী এই ষ্টোরেজ সিষ্টেমের অন্তর্গত। দ্বিতীয় প্রণালীতে আমাদের ঐ খিদিরপুরের ট্রাম চলিতেছে। এই প্রণালী দুই অংশে বিভক্ত, ইহাতে যেখান হইতে বৈদ্যুতিক সঞ্চার হইবে, তাহার ষ্টেসন দূরে রহিয়াছে, আর গাড়ী অন্ত স্থানে রহিয়াছে। বৈদ্যুতিক ষ্টেসন বেনিয়াপুকুরে স্থাপিত হইয়াছে, আর ট্রামের গাড়ীতে 'মোটর' দেওয়া হইয়াছে। রাজপথের নীচে দিয়া বড় বড় নল বসাইয়া সেই বৈদ্যুতিক তেজ চালাইয়া আনা হইতেছে, আর তাহাকে উপরে তুলিয়া তারের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইতেছে! ট্রামের রাস্তার ধারে যে তার আছে, তাহাতেই বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চালিত হয়। এই তারের সহিত গাড়ীর যোগ সাধন করিবার জন্য গাড়ীর উপর হইতে একটা মাথায় চাকাওয়ালা মাস্তলের মত উঠিয়া উপরের তার স্পর্শ করিয়া ক্রমাগত ছুটিতেছে। এই মাস্তলের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি নামিয়া মোটরে গতি উৎপন্ন করে, আর সেই শক্তিতে গাড়ী চলিতে থাকে। ইহাকে "বাঁধো" বলিলেই ড্রাইভার একখানি চক্র টিপিয়া দিলে গাড়ীর সম্মুখের চাকায় ব্রেক বাঁধা হইয়া পড়ে; তাহাতে তারের সংস্পর্শশূন্য হয় না, অথচ গাড়ী অমনি থামিয়া পড়ে। বাঁকা স্থানে দড়ি টানিলে, হাতা উঠিয়া তারের গায়ে লাগাইলে গাড়ী চলে। পরন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার অধোদেশেও একটী যন্ত্র আছে, ইহারও বলে চক্র চলে। গতি হ্রাস বৃদ্ধি করিবারও উপায় আছে। উপস্থিত সরল পথে ৮ মাইল এবং বক্রপথে ঘণ্টায় ৪ মাইল যাইবে। প্রথম শ্রেণীর গাড়ীগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। প্রত্যেক গাড়ীর ভিতরে ২৪ জন এবং বাহিরে ৩ জন বসিবার স্থান হইয়াছে। অধিকন্তু প্রতি গাড়ীতে ৬টী করিয়া বৈদ্যুতিক আলোক দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। বর্ষাকালে যাহাতে গাড়ীর উপর বজ্রাঘাত না হয়, তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। স্বীকার করিলাম, এ সম্বন্ধে সমুদয় ব্যবস্থা সুন্দর হইয়াছে; কিন্তু মান্দ্রাজে বৈদ্যুতিক ট্রাম চালাইয়া বন্ধ করা হইল কেন? ঐ যে তার খাটান হইয়াছে,

উহাতে সর্ব্বদাই যেমন গ্যাসের পাইপে গ্যাস থাকে, ঐ তারেও সেইরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে, তাহাকে ইংরাজীতে “করেন” বলে। খিদিরপুর লাইন মাঠের পথ, কিন্তু ইতিমধ্যেই ঝড়ে একটা গাছ-পড়িয়া ঐ তার মৃত্তিকা-শায়ী হয়; তৎপরে সেই তারে একটা ঘোড়া মরিয়াছে এবং ঘোড়াকে বাঁচাইতে গিয়া একজন লোক জখম হইয়াছে। কারণ উক্ত তারে তখন “করেন” ছিল। একটা গ্লাসে জল রাখিয়া তাহার ভিতর একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া যদি ঐ জলে বৈদ্যুতিক “করেন” বিশিষ্ট তার সংযোগ করা যায় এবং কাহাকেও যদি জল হইতে ঐ টাকাটী তুলিতে বলা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীতে এমন লোক নাই যে, জল হইতে ঐ টাকা তুলে। বৈদ্যুতিকশক্তির এমনই ভয়ঙ্কর অবস্থা আরও শুনা গিয়াছে যে, মুসলমানের মহরম পর্ব্বের নিশানগুলি ঐ ট্রামের তার সংস্পর্শে পুড়িয়া গিয়াছে। মাঠের রাস্তাতেই এ দুর্ঘটনা, তখন না জানি চিৎপুর রোডে এ তার কত দোতালা বাটীর নিম্নে রহিয়াছে, উহাতে কত কাপড় ইত্যাদি পড়িয়া ভস্মীভূত হইবে এবং উক্ত তার স্পর্শে কত লোকের কত দুর্ঘটনা হইবে! অতএব এ বিষয়ের জন্য আমাদের কর্ত্তৃপক্ষেরা এখন হইতেই সাবধান হইবার চেষ্টা করিবেন। অনেকে বলিতেছেন, হিন্দুরা ডিঙ্গান দ্রব্য আহার করেন না, এবং পথের নেকড়া-কানি ডিঙ্গাইতে হিন্দু স্ত্রীলোকেরা সন্তানাদিকে নিষেধ করিয়া দিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে হিন্দুরা তাহাই করিবেন। যে স্থানে বারাণ্ডার নীচে দিয়া তার গিয়াছে, তথায় বেশী দুর্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা। অতএব সেই সকল গৃহস্থকে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণের জানা উচিত, উক্ত তার ডিঙ্গাইতে যাওয়া বা স্পর্শ করা নিষিদ্ধ; নচেৎ প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বারাণ্ডার নিকট দিয়া যে তার গিয়াছে, উহার “করেন” ধরিয়া আলোক জ্বালা, পাখাটানা ইত্যাদি কার্য্য করাইবেন বলিয়া উপহাসচ্ছলে তাঁহারা এই কথার গুজব তুলিতেছেন। কি সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে ত “করেন” চুরি হইবারও সম্ভাবনা বেশ দেখা যাইতেছে। অতএব ষ্টোরেজ সিষ্টেমে ট্রাম চালাইলে কি হয়? বোধ হয় খরচা বেশী পড়ে; কিন্তু তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস উল্লিখিত সমস্ত দুর্ঘটনায় হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। ফলে ষ্টোরেজ সিষ্টেমে যাহাতে লাভ হয়, তাহাই করা ট্রাম কোম্পানীর কর্ত্তব্য।

আলফ্রেড নোবেল।

(২)

মৃত্যুকালে আলফ্রেড নোবেলের ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি জমিয়াছিল। আমাদের হিসাবে ৩ কোটি টাকা। মৃত্যুর পূর্ব্বে নোবেল তাঁহার বন্ধুদের বলিয়াছিলেন—“আমি দেখিয়াছি যে, যাহারা উত্তরাধিকার-সূত্রে অধিক সম্পত্তির অধীশ্বর হয়, তাহাদের সুখ হয় না। তাহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। উহারা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে বা উদ্যম অবলম্বনে নিজের সর্ব্ববিধ অবস্থা উন্নত করিতে পারে না, অলস হইয়া পড়ে। ছেলে পিলেদের “সামান্য কিছু” দেওয়া উচিত, যেন জীবন সংগ্রামের জন্য সজ্জিত হইতে মাত্র পারে। অতিরিক্ত সম্পত্তি সমাজের জন্যই ব্যবহৃত হওয়া উচিত।”—ধন মুখ্যত সমাজের সাহায্যেই সংগৃহীত হইতে পারে—নচেৎ লুঠ হইয়া যাইত। সুতরাং উহা সমাজেরই হিতার্থে দানের জন্য,—আলফ্রেড নোবেল এই উচ্চ আর্য্যনীতি “পালন” করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন কেহই প্রকৃতপ্রস্তাবে দুঃস্থ না থাকায় তিনি কাহাকেও কিছু দেন নাই। সমস্ত সম্পত্তিতে একটী সাধারণ ফণ্ড করিয়া গিয়াছেন। ঐ ফণ্ডের আয় হইতে প্রতি বৎসরে ৫টী করিয়া প্রাইজ দেওয়া হইবে। প্রত্যেক প্রাইজের পরিমাণ ৮ হাজার পাউণ্ড বা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। প্রাইজগুলি নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রদত্ত হইবে। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত “মনুষ্য” এই নোবেল-প্রাইজ পাইতে অধিকারী।

১। ফিজিক্যাল সায়ান্স বা পদার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে বৎসর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আবিষ্ক্রিয়া জন্য।

২। রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে ঐরূপ বৎসরকাল মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আবিষ্ক্রিয়া বা উন্নতি জন্য।

এই দুইটি প্রাইজের উপযুক্ত লোক সুইডেনের একাডেমি অফ্ সায়েন্স স্থির করিবেন।

৩। ফিজিওলজি বা চিকিৎসা সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আবিষ্ক্রিয়া জন্য। এই প্রাইজের লোক স্থির করিবেন—ষ্টক হলমের “কারোলাইন ইনষ্টিটিউট”।

৪। সাহিত্যক্ষেত্রে উন্নত আদর্শের কাব্য জন্য। এই প্রাইজের লোক ঠিক করিবেন—ষ্টক হলম একাডেমি।

৫। শান্তিসংস্থাপন জন্য।—যিনি বিভিন্নজাতীয়দিগের ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি ও

আন্তর্জ্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য বৎসরকালে করিতে পারিবেন, তাঁহারই এই পুরস্কার প্রাপ্য। এই প্রাইজের লোক ঠিক করিবেন—নরওয়ের মহাসভার (ষ্টরথিং) দ্বারা নির্ব্বাচিত পাঁচ জন সভ্য।

নোবেল যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে যুগপরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য যে আত্মগ্লানি বশতঃ শান্তির সম্বন্ধে এরূপ প্রাইজ দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার বিশ্বাস যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অতি ভীষণ অস্ত্র সকল প্রস্তুত হইলেই যুদ্ধ থামিবে। একজন যুদ্ধে প্রস্তুত, অপরে দুর্ব্বল বা "নিরস্ত্র", প্রায় জগতে এইরূপ থাকাতেই যুদ্ধ ঘটে। সকলেই "খুব মারিতেই সক্ষম" এরূপ মহাস্ত্রে সজ্জিত থাকিলে যুদ্ধ উঠিয়া যাইবে। যুদ্ধ করিয়া কাহারও আর পোষাইবে না।—তিনি শান্তিপ্রিয় বরাবরই ছিলেন।

ইউরোপের নানা দেশে কারখানা থাকায় তাঁহার সকল জাতির সহিতই সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। নোবেল উদ্যমশীল পরীক্ষাবিধানকারী বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পজাত বিক্রয়কারী কারখানাওয়ালা ছিলেন বটে, কিন্তু কাব্যরসাস্বাদনেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুখ পাইতেন।

নোবেল কৃত্রিম "গটাপারচা" প্রস্তুতের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, উহার ব্যবসায়ে একদিন খুব লাভ হইবে সন্দেহ নাই। তিনি বলিতেন যে, যাহারা পরীক্ষা-বিধানে মন প্রাণ দিয়া পড়ে, উহাদের অনেকেরই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় বুদ্ধি যুটে না। বিজ্ঞাপনের আবিষ্ক্রিয়া ব্যবসায়ে প্রযুক্ত হইতে হয় ত এক পুরুষ কাটিয়া যায় এবং আবিষ্কারক দারিদ্র্য কষ্টে—হয় ত অন্নকষ্টেই—জীবন যাপন করেন। এই সকল উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি সমাজের যে পালন কর্ত্তব্য আছে, তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য জন্যই তিনি বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা, কাব্য ও শান্তি সংস্থাপনের সম্বন্ধে এই পাঁচটী ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করিয়া প্রাইজ স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই ভিন্ন লোকে প্রাইজ পাইবেন।

আল্‌ফ্রেড নোবেলের অপেক্ষা ধনশালী মহারাজ সকল এ দেশে আছেন। বিজ্ঞান, চিকিৎসা কার্য্য প্রভৃতির জন্য এরূপ বৎসর ৬ লক্ষ টাকার প্রাইজ দেওয়াও দু চারিজনের পক্ষে অসম্ভব নয়; কিন্তু কখন কাহারও এমন কথা মনেও হইয়াছে কি? ধনীর মধ্যে একমাত্র মহাত্মা টাটাই এদিকে দৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবান এদেশেও একটু উদ্যম ও উচ্চমন পাঠাইয়া দিন!!

এডুকেশন গেজেট।

মহাজনবন্ধু মাসিক-পত্র।
২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ সাল।

শর্করা বিজ্ঞান।

(লেখক শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়,—M. A, M. R. A. C, and F. H. A. S.)

দশম অধ্যায়—ইক্ষু-চাষের আয়-ব্যয়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে এক্ষণে ইক্ষু-চাষের আনুক্রমিক ব্যয়ের তালিকা দেওয়া যাইতে পারে। এই তালিকাতে চারি আনা হিসাবে মজুরের রোজ ধরা গেল।

আলু উঠাইবার পরে বিঘা প্রতি মৈ দিবার খরচ	৶০
দ্বিপক্ষ লাঙ্গল দ্বারা ভিলি প্রস্তুত করা	।০
৩০০০ কলম খরিদ	৬৲
কলম গর্ত্তের মধ্যে সাজাইয়া জাগ দিবার খরচ	॥০
কলমকে মসলা খাওয়াইবার খরচ (অর্থাৎ সেঁকোবিষ, ছাই, চুণ, হরিদ্রা-চূর্ণ ও রেড়ির খোল মাখাইবার খরচ)	২৲
কলম বসাইবার খরচ (৮ জন মজুর)	২৲
৫ বার জল সেচনের খরচ (ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখে ৩ বার এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষে ২ বার)	৫৲
৫ মণ রেড়ির খোল	১০৲
হাণ্টার-হোর দ্বারা মাটী চাপাইবার পূর্ব্বে ২বার সারপ্রয়োগের খরচ	২৲
দুইবার হাণ্টার-হো চালাইবার খরচ	॥০
একবার নিড়াইবার খরচ	১॥০
চারিবার হাতে চালান হো দ্বারা মাটী উস্কান	১৲
২০ জন লোক আক কাটিবার ও ঝুড়িবার জন্য	৫৲
আক মাড়াই করিবার জন্য ৬ দিবস একজন	১॥০
বলদ চালাইবার জন্য ৬ দিবস একজন	১॥০
দুই জোড়া বলদের ভাড়া ৬ দিবস	২॥০
দুইজন লোক রস জ্বাল দিবার জন্য ৬ দিবস	৩৲

প্রথম দুই দিবসের জন্য জ্বালানী কাষ্ঠ	॥০
৩০টী কলসী	১॥০
বেহিয়া মিলের ও ১ জোড়া কড়ার ভাড়া ৬ দিবসের	৭৲
৪টী নাদ	২৲
মোট	৫৫।৵০
উৎপন্ন ২০৴ মণ গুড় ৩॥০ টাকা হিসাবে	৭০৲
বিঘা প্রতি লাভ ১৪॥৵০ এবং জমীর খাজনা বাদে কেবল	১২৲ মাত্র।

একাদশ অধ্যায়—গুড় প্রস্তুত কার্য্যের উন্নতি।

ষ্টীম এঞ্জিন, হরিজণ্ট্যাল রোলার মিল, ভেকুয়াম প্যান, এ সমস্ত এ দেশে প্রচলিত করা নিতান্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া দুরূহ। ধনী ব্যক্তি ইক্ষুচাষে হস্তার্পণ করিলে বিঘা প্রতি ১২।১৪ টাকার পরিবর্ত্তে ২০।২৫ টাকা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু ঐককালীন ২৫।৩০ হাজার টাকা মূলধন ব্যয় করা অনেক বিশ্বাস ও সাহসের কার্য্য। কৃষি-ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে এ দেশের ধনী লোকের বিশ্বাস এখনও জন্মে নাই। মোটের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস, এদেশে চাষারা যাহা করিতেছে, তাহাই চরম। উহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় ধনী ব্যক্তি কখনই লাভবান হইতে পারিবে না।

চাষীরা অনুকরণ করিতে পারে, অথবা যে সকল মধ্যম শ্রেণীর লোক আজ কাল সহস্র মুদ্রা পুঁজির উপর নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য্যে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইতেছেন, সেই সকল লোক অনুসরণ করিতে পারেন, এরূপ কোন প্রণালী গুড়-প্রস্তুত-কার্য্যে প্রযোজ্য কি না, ইহাই এখন বিবেচ্য।

শিবপুর-কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে এক অভিনব উপায়ে গুড় প্রস্তুত করিয়া ছাত্রদের দেখাইয়া দিয়াছি, কেমন করিয়া বর্ত্তমান প্রণালী হইতে অতি সামান্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন দ্বারা অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। গুড়ের রংয়ের উন্নতি মাত্র লাভ করা এ উপায়ের এক উদ্দেশ্য নহে। গুড়ের সারভাগ এই উপায় দ্বারা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া থাকে, মাৎ অতি পরিষ্কার হয় ও কলসী ফুটা করিয়া দিলে অতি সহজে এক মাসেরও কম সময়ে সমস্ত মাৎটী নির্গত হইয়া যায়। কলসীর মধ্যে যে সারভাগ অবশিষ্ট থাকে, উহা বর্ষার সময়ও দুর্গন্ধ হইয়া যায় না।

উহা রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেঁকিতে বা হামামদিস্তায় কুটিয়া লইলে কাশীর চিনির ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইয়া থাকে। *

বর্ণিতব্য উপায়ে যে গুড়, সার, মাৎ ও চিনি প্রস্তুত হয়, উহা সাধারণে যাহাতে দেখিতে পায়, এ জন্য কলিকাতার যাদুঘরের ইকনমিক্যাল সেক্‌সনে ঐ সকলের নমুনা পাঠাইয়া দিয়াছি। এই উপায় অবলম্বনে কার্য্য করিলে একমণ গুড় প্রস্তুত করিতে এক পয়সা মাত্র অধিক ব্যয় হয়, কিন্তু যে গুড় প্রস্তুত হইবে, উহার মূল্য মণ প্রতি ॥০ আনা বা ১৲ টাকা অধিক পাওয়া যাইবে। এই অভিনব উপায়ে চিনি প্রস্তুত করিবার খরচ মণ প্রতি চারি আনা মাত্র।

(ক্রমশঃ)

চা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—কলম কাটা।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, গাছ ছাটা বা কলম করিবার উদ্দেশ্য কি? অতএব দেখা যাইতেছে যে, দ্বিবীজ বা বহুবীজ দল কাষ্ঠময় বৃক্ষগুলিকে যত ছাটা যায়, ততই উহার পাতা বাহির হয়; আমাদের যেমন নখ চুল কাটিলে আবার নূতন নখ চুল বাহির হয়, উহাদের সম্বন্ধেও তাই। যাহা হউক, চা-গাছে তিনটী উদ্দেশ্যে "কলম" কাটা হয়। প্রথম উদ্দেশ্য—কলম কাটিলে নূতন পাতা বাহির হয়; প্রতি বৎসর নূতন পাতা না হইলে পুরাতন পাতায় "চা" হয় না। কলম কাটার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—প্রতি বৎসর কলম অর্থাৎ ডাল কাটিয়া না দিলে এ শ্রেণীর গাছ বড় হইয়া যায়, কাজেই ইহার পাতা ছিঁড়িবার সময় মানুষের হস্ত নাগাল

---

* আমরা এ চিনি লেখকের নিকট শিবপুরে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি, মান্দ্রাজ বা আর্কট পিটি চিনির মত উৎকৃষ্ট চিনি হইয়াছে। আমাদের দেশে অনেক সময়ে উৎকৃষ্ট দানাদার চিনি অপেক্ষা এই শ্রেণীর পিটি চিনির দর বেশী থাকে। এ দেশীয় লোকে চিনি বলিলেই "পিটি অর্থাৎ পেষা" চিনিকেই চিনি বলিয়া বুঝে! দানাদার চিনিকে এদেশীয়েরা কাঁচা খাইতে ভালবাসে না। এই জন্যই পিটি চিনির দর অনেক সময় বেশী থাকে। মঃ বঃ সঃ।

পায় না। তৃতীয় উদ্দেশ্য—এইরূপে ডাল ছাঁটিয়া দিলে, বৃক্ষের বর্দ্ধিত শক্তি উচ্চে না গিয়া গাছ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া আশপাশে বাড়িয়া ঝাঁকড়াল হয়; অতএব ইহা দ্বারা পাতার সংখ্যা বেশী পাওয়া যায়।

যাহা হউক, ইহার মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্যটী সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। কারণ যে ডালগুলি নূতন এবং দেখিতে বেশ সতেজ হইয়াছে, তাহা কাটিতে নাই। দেখা উচিত, যে ডালগুলি মরা মরা রকম, গায়ে সাদা দাগ পড়িয়াছে, সেই গুলি কাটিয়া দিতে হয়। আবার দেখা যায় যে, কতকগুলি সরু লতার মত ডাল বাহির হইয়াছে, ইহা দ্বারা ২।৪টী পাতা পাওয়া যায় বটে; কিন্তু ইহা হইতে বিশিষ্ট ডাল হয় না, বরং এ সকল ডাল হইতে অধিকাংশ স্থলে ঘন ঘন কতকগুলি ডাল বাহির হইয়া একটী শক্ত গ্রন্থি হয়। অপিচ পর বৎসর ইহা হইতে আর সতেজ ডাল বাহির হইবে না, তাহা নিশ্চয়। তবেই স্থির হইল যে, লতার মত ডালগুলি দূর করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থিগুলিও কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

সকল গাছের অবস্থা সমান নহে; সুতরাং এক নিয়মানুসারে সকল গাছ কাটা উচিত নয়। এইরূপ যত বিচার করিতে যাইবে, ততই সন্দেহ আসিবে; সকল কাজের ইহাই দস্তুর। সাধারণতঃ এই প্রশ্ন মনে উদয় হয় যে, গত বৎসর যত উচ্চ করিয়া কলম কাটিয়াছি, এ বৎসর তাহাপেক্ষা নীচে বা উপরে কাটিব কি না! যদি গত বৎসর কাটার উপর এ বৎসর সতেজ নূতন ডাল হইয়া থাকে, এবং তাহা লেডপেন্সিলের মত বা তদধিক মোটা হয়, তাহাতে দুই তিন চোক (Bud) রাখিয়া কলম কাটা উচিত। আগামী বৎসর এই সকল চোক হইতে সতেজ নূতন ডাল বাহির হইতে পারে। পাতা অত্যন্ত বেশী ছেঁড়া হইলে বা অন্য কোন কারণ বশতঃ নূতন ডালগুলি যথেষ্ট মোটা না হইলে, বিশেষতঃ এক একটী গ্রন্থি হইতে যদি অনেক গুলি সরু ডাল বাহির হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব বৎসরের কলম কাটার ২।১ ইঞ্চ নীচে কলম কাটিতে হইবে। সাধারণতঃ বাগিচা ভাল মত চলিতে থাকিলে ৩।৪ বৎসর উপর কলম এবং এক বৎসর নীচু কলম দিতে হয়। নচেৎ দেখা গিয়াছে যে, ২।১ বৎসর অন্তরই নীচু কলম কাটিয়া দিলে গাছ সত্বর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে মাপ কাটির কথা বলিয়াছি, তাহা গাছের মধ্যস্থলে রাখিয়া গাছগুলি মেজের (Table) মত ভাবে করিতে হইবে, এই বুঝিয়া ডালগুলি কাটিতে বলিবে। এই ভাবে করিতে গিয়া গাছের মেজের উপরে যেখানে গাছের গাঁট (Scrubs) এবং সূক্ষ্ম লতার মত ডাল যাহা পড়িবে, তাহা কাটিয়া দিবে। ছুরি অত্যন্ত ধারাল হওয়া চাই এবং উহা চালাইবার সময় নীচের দিক হইতে উপরের দিকে চালাইতে হয়। ছুরি ভোঁথা হইলে এবং তাহা দিয়া গাছ কাটিলে কাটাস্থানের ২।৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়। কোন কোন বাগিচায় অগ্রে একদল লোক গাছগুলি মেজের মত করিয়া কাটিয়া যায়, তৎপরে অন্য দল আসিয়া লতার মত ডালগুলি কাটে।

তৃতীয় অধ্যায়—পত্র চয়ন।

পত্র চয়নের মোটামুটী হিসাব এই যে, কলম কাটার পর ৫।৬টী পাতা বাহির হইলেই পাতা ছেঁড়া চলিতে পারে। অন্য সময় পাতা ছিঁড়িতে কোন গোল নাই, কিন্তু বৎসরের আরম্ভে পাতা ছিঁড়িতে হিসাব চাই। সর্ব্বোচ্চ মোড়ন (Bud) পাতাটী খুলিবে খুলিবে বোধ হইবার অন্ততঃ ২।১ দিন পূর্ব্বেই পাতা ছেঁড়া উচিত। গাছের নিস্তেজ ডগগুলির পাতা একবারে কুড়াইয়া বা মুড়াইয়া দেওয়া ভাল, অর্থাৎ তাহাতে যেন আর একটীও পাতা না থাকে। অপিচ রুগ্ন ডালগুলির পাতা প্রসবের ক্ষমতাও হয় না, উহারা প্রায়ই বন্ধ্যা হয়। রুগ্ন ডালের সমুদয় পাতা ছিঁড়িয়া লইলে আর একটী এই উপকার হয় যে, গাছের ভিতর আলো এবং বাতাস চলাচলের পথ অপেক্ষাকৃতরূপে পরিস্কৃত হয়। নূতন গাছের পাতা অল্প ছেঁড়া ভাল, কারণ প্রথমটা পাতা অল্প ছিঁড়িলে পর-বৎসর কলম কাটিবার সুযোগ সুবিধা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়—পাতা শুটা।

কোন কোন অঞ্চলে প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত কুলীরা পত্র সঞ্চয় করে। আর কোথাও ৭টা হইতে ১২টা এবং ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পাতা ছিঁড়ে। প্রথম প্রণালী দার্জিলিঙ্গ অঞ্চলে। তথায় কুলী-সম্পর্কে কোন আইন নাই। সুতরাং কুলীরা প্রত্যহ ১০।১১ ঘণ্টা কাজ করিলে কেহ বাধা দেয় না। আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে কুলীসম্পর্কীয় আইন রহিয়াছে। সুতরাং তথায় কুলীরা ৯ ঘণ্টার বেশী খাটিতে

পারে না। দার্জিলিঙ্গ অঞ্চলে সমস্ত দিনের পাতা একেবারে সন্ধ্যার সময় লইয়া আসে। কিন্তু আসামাদি প্রদেশে কুলীরা একবার ১২টার সময় আবার সন্ধ্যার সময় পাতা লইয়া আসে। আসাম ও কাছাড় দার্জিলিঙ্গ অপেক্ষা অনেক বেশী গরম। সুতরাং পাতা না আনিলে তাহা টুকুরিতে গরম হইয়া উঠে, এবং কিছুটা লাল হইয়া যায়। পাতা এইরূপ গরম হইলে তাহাতে ভাল চা হয় না। পাতা গরম হওয়া অর্থাৎ লাল হওয়া বা পচিয়া যাওয়া একই কথা। এ বিষয়ের জন্য সবিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। যে সকল কুলীরা অনেক পাতা ছিঁড়ে, তাহারা টুকুরিতে পাতা ঠাসিয়া ভরিতে থাকে। ইহাতে পাতা গরম হইয়া উঠে। সুতরাং যাহারা বেশী পাতা ছিঁড়ে, তাহাদিগকে খুব বড় টুকুরী দেওয়া উচিত। পাতা ছিঁড়িয়া কুঠীতে আনিতে বিলম্ব হইলে, তাহা বাগানের ছায়াযুক্ত স্থানে কাপড়ে বিছাইয়া ঘাঁটিয়া রাখা উচিত। ইহাতেও পাতা লাল হইলে, তাহা বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত।

ম্যানেজারের স্বহস্তে পাতা ওজন করা উচিত। পাতা ওজন করিবার সময় টুকুরি ঘাঁটিয়া দেখা উচিত। যদি কেহ চা'র অনুপযুক্ত শক্ত পাতা আনে, তখন তাহা ধরা পড়ে। বিশেষতঃ এ সময়ও গরম পাতা বা লাল পাতা ধরা পড়িয়া বাছাই হয়।

পাতা কুঠীতে আসিলেই তাহা চালুনীতে ঘাঁটিয়া দেওয়া উচিত। এই জন্য পূর্ব্বেই যেন লোক ঠিক করিয়া রাখা হয়। যদি কুলীরা টুকুরি হইতে পাতা ঢালিতেই তাহা ঘাঁটিয়া না দিয়া গাদা করিয়া রাখে, তবে পাতা আরও গরম হয়। সুতরাং সে পাতার চা ভাল হয় না। পাতা চালুনীতে ঘাঁটিয়া দিতে যত বিলম্ব হইবে, চা তত অধম হইবে। সুতরাং যাহাতে পাতা ঘাঁটিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না হয়, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বেই পাকা বন্দোবস্ত করা উচিত।

চালুনী সাধারণতঃ দুই প্রকারের। গোল ও চতুষ্কোণ; তন্মধ্যে গোল চালুনীই অধিক সুবিধাজনক। কারণ তাহা ভাঙ্গে কম। এবং একটীর এক-তৃতীয়াংশ অপর চালুনীর উপর রাখিলেও বায়ু-সঞ্চালনে বাধা হয় না। অনেক স্থানে লোহার জালের ও ঘন কাপড়ের চালুনী আছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেতের চালুনী সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

(ক্রমশঃ)

কষ্টিক পটাস।

"কষ্টিক পটাস" সাবান প্রস্তুত করিবার একটী প্রধান উপাদান। এই দ্রব্যটী পাড়াগাঁয়ে অতি সহজে অল্প মুলধনে প্রস্তুত হইতে পারে। পাড়াগাঁয়ে গুল্ম, শুক্না পাতা, কলার বাসনা, লতা ও তদ্বিধ অন্যান্য দ্রব্যাদি বিনা-ব্যবহারে নষ্ট হইয়া যায়। কেহ তাহাদের খোঁজ রাখে না। "কষ্টিক পটাস" প্রস্তুত করিতে হইলে এই প্রকার শুষ্ক ও হালকা জিনিসগুলি এক স্থানে গাদা করিয়া পোড়াইতে হয়। পোড়াইলে ইহা হইতে এক প্রকার সাদা ছাই বাহির হয়। কাল ছাইগুলি অন্যান্য দ্রব্যের সহিত পোড়াইবার জন্য রাখিয়া দিবে। সাদা রঙ্গের ছাইগুলি একত্র করিয়া কোন চীনামাটীর পাত্রে অথবা দেশীয় মাটীর পাত্রে জল দিয়া গুলিয়া লও। ছাইগুলি জলে মিশাইবার পর ঐ মিশ্রের মধ্যে প্রতি /৫ সের জলে ৵০ ছটাক হিসাবে কলি চুণ মিশাইয়া দাও। তার পর বেশ করিয়া জল চুণ একত্র করিয়া নাড়িয়া ঘোলাইয়া দাও। এক ঘণ্টার পরে দেখিতে পাইবে, উপরে পরিষ্কার জল, কিন্তু নীচে সাদা ও কতকগুলি দ্রব্য স্থির হইয়া রহিয়াছে।

এখন যাহা নীচে রহিয়াছে, তাহা চক বা চা-খড়ি চুণ, এবং উপরের দ্রব্য "কষ্টিক পটাস" দ্রব্য বই আর কিছুই নহে। তারপর অন্য আর একটা মৃৎপাত্রে "কষ্টিক পটাস" দ্রব্য ঢালিয়া পৃথক করিয়া লও। না হয়, খুব ঘন কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলেও চলিতে পারে। তাহাতে চক-চূর্ণগুলি ঐ কাপড়ের মধ্যে আঁটিয়া যাইবে ও ঐ কষ্টিক পটাস দ্রব্য কাপড়ের মধ্য দিয়া পাত্রান্তরে পড়িতে থাকিবে। কাপড়খানি খুব পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। আর একটী কথা এই যে, কাপড়খানি ব্যবহারের অনতিবিলম্বেই উত্তম করিয়া ধুইয়া ফেলা উচিত। না হইলে কাপড়খানি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে।

"কষ্টিক পটাস" দ্রব্য সমুদায় সংগৃহীত হইলে উত্তম মৃৎপাত্রে করিয়া সূর্য্যের উত্তাপে রাখিয়া দাও। যদি কোন রং বিকৃত করিবার পদার্থ উহার মধ্যে থাকে ত শোধরাইয়া যাইবে। অবশেষে ঐ জল একটী এনামেল-পাত্রে করিয়া অগ্নির উপর রাখিয়া জ্বাল দিতে হইবে। আজ

কাল এনামেল-পাত্র সংগ্রহের জন্য আর বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। কলিকাতায় বাজারে এনামেল করা জলের বাটী হইতে আরম্ভ করিয়া এনামেলের কড়া পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। জ্বাল দিতে দিতে ক্রমে জল মরিয়া যাইবে। তখন ঘন আঠার মত এক প্রকার পদার্থ কড়ার নীচে থাকিবে। আগুণের জ্বালে যখন ঐ পদার্থ গাঢ়তর হইয়া লালবর্ণ হইবে, তখন ইহা উপযুক্ত পাত্রে ঢালিয়া ফেল। কিছুকাল পরে জমিয়া কঠিন হইবে। তারপর ছাঁচ হইতে তুলিয়া লইয়া সাবধানে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দাও।

ইহারই নাম “কষ্টিক পটাস।” এই দ্রব্য কলিকাতার ঔষধ-বিক্রেতা-দিগের দোকানে বিক্রীত হইতে পারে।

মনে কর সঠী গাছ। উহার মূলে পালো পাওয়া যায়। পাতাগুলি শুকাইয়া লইতে হয়। মনে কর, হলুদের গাছ, কিম্বা আদার গাছ। ডাইলের গাছ, ধানের খড়, আলুর পরিত্যক্ত লতা, কুমড়া, ফুটী, তরমুজ প্রভৃতির শুষ্ক লতা প্রভৃতি সমস্ত হইতেই প্রভূত কষ্টিক পটাস পাওয়া যায়। সমস্ত প্রকার লতা পাতা কিম্বা গুল্ম বা ওষধিজাতীয় শুকাইয়া পোড়াইতে হয়।

প্রথম একবার গাদা করিয়া পোড়াইতে হয়। তারপর পূর্ব্বোক্ত জলে জ্বাল দিবার জন্য বাকী মজুদ লতা পাতা ইত্যাদি পোড়াইতে পারা যায়। এই ভাবে করিলে জ্বালানি কাষ্ঠের খরচ লাগিবে না।

কৃষক।

কেঁড়াগাছীর চিনির কারখানা।

কেঁড়াগাছী জেলা ২৪ পরগণায়; কিন্তু ইহা খুল্‌নার প্রায় নিকট, ভায়া বসিরহাট বলিয়া পত্রাদি দিলে শীঘ্রই পাওয়া যায়। এখানকার ওজন আপনাদের কলিকাতার সঙ্গে মিল আছে। পূর্ব্বে এ প্রদেশে অনেক চিনির কারখানা ছিল। আমাদের নিত্যানন্দকাটী গ্রামে পূর্ব্বে ১২টা চিনির কারখানা ছিল, এ বৎসর ৫টা হইয়াছে। আমরা “মোকাম তলার” গুড়ের হাট হইতে গুড় ক্রয় করিয়া থাকি।

মোকামতলা আমাদের দেশে বিখ্যাত জায়গা। এখানে সপ্তাহে দুইদিন হাট হয়। হাটে নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়; তন্মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস হইতে চৈত্র মাসের দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই হাটে অপর্য্যাপ্ত গুড় ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ইহা খেজুরে গুড়। আমরা এ কার্য্য বহুদিন হইতে করিতেছি। গুড়ের দর খুব কম দুই টাকা চারি আনা হইতে উচ্চদর বড় জোর তিন টাকা বার আনা হইতে দেখিয়াছি। আমাদের কারখানা ছোট। প্রতি বৎসর ২।৩ হাজার মণ গুড় ভাঙ্গিয়া আমরা চিনি প্রস্তুত করি। আমাদের অপেক্ষা বড় কারখানাও এ প্রদেশে ছিল; এখন আর নাই। কারখানা বড় করিলে চিনির পড়তা সুবিধা হয়; দশ হাজার টাকা মূলধনের কারখানায় ১২।১৩ জন লোক রাখিতে হয়। কিন্তু ছোট কারখানা করিলেও প্রায় ঐরূপ লোক রাখিতে হয়। তবে ২।১ জন লোক কম রাখিলেও চলে; ফলে ইহাতে কারখানার খরচা বড় কমে না, তবে টাকার ব্যাজ ইত্যাদির কিছু সুবিধা হয় মাত্র। কারখানার লোকের বেতন ৭৲ হইতে ১২৲ পর্য্যন্ত উচ্চ মাহিনার লোক থাকে জানিবেন। যে ব্যক্তি গুড় জ্বাল দিয়া গোড় চিনি করে, তাহাকে “পসারি” বলে। পসারি চিনির কারখানার মধ্যে উচ্চ কর্ম্মচারী। আমাদের গ্রামের নিকট সোনাই নদী আছে। নদী বটে, কিন্তু ইহার স্রোত নাই। এই নদীতে বিস্তর পাটা শেওলা হয়; তাহা দ্বারা আমরা গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করি।

হাট হইতে আমরা গুড় আনিয়া উহার পাত্র ভাঙ্গিয়া চুবড়ীতে উহা রাখি এবং গুড় গুঁড়াইয়া দিয়া থাকি। প্রত্যেক চুবড়ীতে দুই মণ—আড়াই মণ গুড় ধরে। উহাকে একটা গামলার উপর “তেকেটে” দিয়া বসাইয়া উহাতে পাটাশেওলা চাপা দিয়া রাখি। ইহার ফলে চুবড়ী হইতে গুড়ের রস ঝরিয়া গামলায় পড়ে। সাত দিনের পর শেওলা তুলিয়া আট দিনের দিন উক্ত চুবড়িস্থ শুষ্ক গুড় কাঁকিয়া বাহির করিয়া যে চিনি পাওয়া যায়, তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া বস্তাবন্দী করি, ইহাকে “দলো” চিনি বলে। এই রূপ এক চুবড়ী গুড় ৭ দিন অন্তর শেওলা বদলাইয়া ক্রমে ক্রমে চিনি কাটিতে এক মাস হইতে দেড় মাসের মধ্যে শেষ হয়। কারখানায় এই রূপ বিস্তর চুবড়ীতে গুড় রাখা হয়। তৎপরে এই চুবড়ীর গুড় হইতে দলুয়া চিনি হইয়া গেলে, ইহার তলদেশের গামলায় গুড়ের যে রস পাওয়া যায়, তাহা জ্বাল দিয়া, নাদে ফেলিয়া শীতল করিয়া পুনরায়

উহাকে গুড় করা হয়। আমরা ইহাকে “দানাবাঁধা” বলি। এই গুড় নাদ হইতে তুলিয়া একটা থোলের উপর রাখিয়া তাহাকে নিংড়াইয়া জাঁতা (চাপবিশেষ) দিয়া ২।১ দিন রাখিয়া বেশ করিয়া রস ঝরাইয়া কিছু গুড় পাওয়া যায়। পরন্তু এই গুড়কে পুনরায় জলে গুলিয়া জ্বাল দিয়া আবার নাদে ফেলিয়া শীতল করা হয় ও তাহার পর এই নাদ পাত্রকে একটা গামলার উপর বসাইয়া উহার তলদেশের ছিদ্র খুলিয়া দিতে হয় এবং নাদের উপর পাটা শেওলা চাপা দিয়া রাখা হয়। পরন্তু ইহাকেও সেই পূর্ব্বোক্ত ভাবে ৭ দিন অন্তর শেওলা বদলান এবং ৮ দিনের দিন চিনি কাটিতে হয়। অধিকন্তু এই চিনিকে গোঁড় চিনি বলে। ইহা ভিন্ন আমাদের দেশের কারখানায় অন্যবিধ কোন চিনি হয় না। গোঁড় হইয়া গেলে উহার যে রস পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা আর চিনি হয় না, উহাকে “চিটে” বলে। কারখানায় যে ৮।১০ জন লোক থাকে, তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কার্য্য করে, অর্থাৎ চিনির কারখানায় ত্রিবিধ কার্য্যই প্রধান। এই জন্য এক শ্রেণীর লোকেরা কেবল “গুড়জ্বাল দেওয়া” কার্য্য করে, অপর দল চুবড়ী হইতে চিনি কাঁকিয়া বাহির করে এবং আর এক দল কেবল চিনির শুকান এবং বস্তাবন্দী প্রভৃতির কার্য্য করে।

আমরা ৪৴০ মণ গুড় হইতে ১৴০ মণ চিনি পাই—

উপস্থিত উহার দর	৫।০
উক্ত ৪৴০ মণ গুড় হইতে গোঁড় চিনি পাই ।৫ সের—	
দর ৪॥০ হিসাবে	১॥৶০
পরন্তু উক্ত ৪৴০ মণ গুড় হইতে চিটে গুড় পাই ২।০ মণ	
দর ২৸০ হিসাবে	৬৵০
বাকী ।৫ সের জল্‌তি অর্থাৎ আর কিছু পাই না।	
মোট আদায় ৪৴০ মণে	১৩৴০

অতএব জমা হইল তের টাকা এক আনা। এখন খরচের কথা বলি,—

গুড় ক্রয় ৪৴০ মণ ৩॥০ হিসাবে	১৪৲
তৎপরে উহা আনিতে গাড়ীভাড়া, কাষ্ঠ, শেওলা, মাহিনা, ব্যাজ, আড়ত ইত্যাদি মোট মণকরা ॥৵০ হিসাবে	২॥০
খরচ—	১৬॥০

খরচ—	১৬॥০
কিন্তু জমা—	১৩৴০
অতএব ক্ষতি ৪৴০ মণে—	৩৷৶০

আমাদের এ শ্রেণীর কারখানা আর বাঁচিবেনা। আপনাকে গত বর্ষের হিসাব দিলাম।

শ্রীসীতানাথ বিশ্বাস।
নিত্যানন্দকাঠির চিনির কারখানা।

মানভূমে কয়লার খনি।

ছয় মাস হইল, আমি কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়া ২৫ শত টাকায় ১ শত বিঘা জমি এখনকার রাজা অর্থাৎ জমিদারের নিকট হইতে কন্‌ট্রাক্ট লইয়াছি। এই জমিতে কয়লার খাদ আছে। উদ্দেশ্য—কয়লার খনির কার্য্য করিব। উপস্থিত যেরূপে সামান্য ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি।

আমি যে স্থানে রহিয়াছি, তাহা কলিকাতা হইতে মেলে ৮ ঘণ্টার পথ। হাবড়া হইতে কর্ডলাইনে “ধানবাঁধ” ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিতে ২৶৫ ভাড়া লাগে। এই ধানবাঁধ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, আমার খনি “কুজেমা মহুরবাঁন্দ” গ্রামে আসিতে হইলে, দেড় ক্রোশ হাঁটিতে হয়, অথবা গরুর গাড়ি পাওয়া যায়, তাহার ভাড়া আট আনা লাগে। এ দেশটী পাহাড় এবং জঙ্গলে পূর্ণ। পাহাড়ীরা এবং যাহারা কয়লার খনিতে কাজ করে, সেই সকল অসভ্য কুলিরা এইস্থানে বাস করে। কয়লার খনির কার্য্যের জন্য এখানে কতকগুলি বাঙ্গালী, কয়েকটী ডাক্তার এবং কতকগুলি ইংরাজের বাস হইয়াছে। পানীয় জল ভাল নহে। কয়লার খাদের জল ফুটাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। খাদ্য দ্রব্যের অবস্থাও তথৈব চ।

কয়লার খনির জন্য এ স্থানটী ক্রমেই প্রসিদ্ধ হইতেছে এবং হইবে। এখনও এখানে অনেক কয়লাপূর্ণ জমি পাওয়া যায়। এস্থানটী মানভূম জেলার অন্তর্গত; পোষ্টাপিস ঝড়ে।

জমি কনট্রাক্ট করিয়া লইবার সময় যে টাকা চুক্তি হয়, তাহা দিতে

হয়। স্বত্ব এইরূপ যে, যতদিন জমিতে কয়লা থাকিবে, ততদিন জমি আমার থাকিবে, অথচ জমিদার উহার খাজনা দিবে। কয়লা নাই বুঝিলে, যখন আমি ছাড়িয়া দিব, তখন সে জমি পুনরায় জমিদারের প্রাপ্য হইবে। আমি ইচ্ছা করিলে ২ শত বৎসর পর্য্যন্ত উহা হইতে কয়লা তুলিব, বা ইচ্ছানুসারে অথবা আমার অবস্থানুসারে উহাতে খনি করিব, কয়লা তুলিব, তাহাতে জমিদার কোন কথা কহিতে পারিবেন না, বা আমার স্বত্বের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেন না। কিন্তু ২ শত বৎসর পরে উহাতে কয়লা থাকুক বা নাই থাকুক, সে জমি এবং উহার উপর ইমারত আদি থাকিলে, তাহাও জমিদারের প্রাপ্য হইয়া যাইবে। ইহা ভিন্ন জমিদারের সঙ্গে আর একটী সর্ত্ত এই যে, উক্ত জমি হইতে যত টন কয়লা উঠিবে, প্রতি টনে দুই আনা হিসাবে কমিশন জমিদার পাইবে। এইজন্য খাদ হইতে প্রতিদিন যত কয়লা উঠে, তাহার রিপোর্ট প্রত্যহ জমিদারের বাটীতে দিতে হয়।

স্কুলের ম্যাপ আঁকার অভ্যাস এবং জ্যামিতির অঙ্ক এই কার্য্যে বিশেষ প্রয়োজন। জমিদারের নিকট জমি লইয়া তাহার ম্যাপ করিয়া রাখা চাই। জমীর সীমা লইয়া কোন্ গোল বাঁধিলে, অথবা কোন নূতন খাদ কাটাইতে ইচ্ছা করিলে, ঘরে বসিয়া ম্যাপ দেখিয়া তাহা করা যায়। জমি লইবার পূর্ব্বে টাকাগুলি জলে ফেলিতেছি, একার্য্যে ইহাই ভাবা উচিত। তৎপরে অদৃষ্টক্রমে মাটীর ভিতর হইতে টাকায় টাকা উঠিতে পারে, অথবা কেবল মাটী ও জল বাহির হইতে পারে। আমরা অদৃষ্টবাদী হইলেও মন বুঝে না বলিয়া, তবু জমি লইবার অগ্রে সে জমির পার্শ্বে কাহারও খাদ আছে কি না, তাহা দেখি। যদি থাকে, সে খাদে কত নিম্নে কিরূপ ভাবে কয়লা উঠিতেছে, তাহা অনুমান করিয়া, আমারও ঐরূপ হইবে ভাবিয়া জমি লইয়া থাকি। অন্ততঃ আমি ত এইরূপেই লইয়াছি। নচেৎ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বা বাবুরা আসিয়া জমির গভীর দেশ পর্য্যন্ত লৌহ শলাকা প্রবেশ করিয়া দিয়া, কয়লা প্রাপ্তির মীমাংসা করিয়া দিয়া থাকেন। একার্য্যে ব্যয় বলিয়া আমি তাহা করি নাই।

আমি দেখিতেছি, জমির ভিতর কয়লা দুই ভাবে থাকে। প্রথমতঃ পর্ব্বতের মত উচ্চভাবে অর্থাৎ নিম্নে প্রশস্ত, উপরে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া মুখটী যেন সূচিকাকার ধারণ করিয়াছে। এই সূচিকাকার মুখের উপরের মৃত্তিকাও

উচ্চভাবে স্ফীত হইয়া যেন "ঢিপি" মত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ সমতলভাবে নদীর জলের মত মৃত্তিকার ভিতর কয়লার স্তর শায়িত থাকে।

তৎপরে পুষ্করিণী বা ইঁদারা কাটার ভাবে খাদ কাটিতে হয়। এই খাদ কাটিবার সময় যদি প্রস্তরের কঠিন আবরণ পড়ে বা পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে সকল স্থানে ডিনামাইট বা বারুদ দিয়া সেই প্রস্তর স্তর ফাটাইয়া, পাথর তুলিয়া, তবে খাদ কাটিতে হয়। ইহা প্রায় সচরাচর হয় না। বারুদ দিবার লোকও স্বতন্ত্র। তাহাদের ডাকিয়া আনিয়া ইহা করাইতে হয়। যে খাদ পুকুরের মত করিয়া কাটা হয়, তাহাকে আমরা "পুকুর খাদ" বলি। এই শ্রেণীর খাদের জন্য ইংরাজ-রাজের কোন আইন ইত্যাদি নাই। কেবল গভীরতানুসারে উহাতে মৃত্তিকাদি পড়িয়া অথবা দ্ব্যম্ল অঙ্গারক গ্যাস বাহির হইয়া কুলিদের অসুখ না হয়, সেই বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হয়। সরকারী ডাক্তার ইহা পরীক্ষা করে। গভর্ণমেণ্ট এই সকল ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ইহাদের বেতন আমাদিগকে দিতে হয়।

পুকুরে খাদ ভিন্ন "পিক্‌খাদ" এবং "সিড়ি খাদ" নামে আর দুই প্রকার খাদ আছে। পিক্ খাদ ইঁদারা অথবা পাৎকুয়ার (পাতাকুব) মত ভাবে প্রথমটা কাটিতে হয়, শেষে ভিতরে ইন্দুরগর্ত্ত বা বিবরের বাসার মত অথবা সুন্দরের সুড়ঙ্গের মত তাহার ভিতর পথ ঘাট সবই করা হয়। এই শ্রেণী খাদের উপরে শস্যক্ষেত্র বা ময়দান। এই মাঠের ৫০ ফুট অন্তর অন্তর এক একটা বৃহৎ গর্ত্ত করিয়া খাদের তলদেশের সহিত সাধারণ প্রাণবায়ুর সংযোগ করিয়া দিতে হয়, নচেৎ উহার ভিতর কুলিরা বাঁচিবে কেন? কপিকল এবং এঞ্জিনের সাহায্যে এই শ্রেণীর খাদের সেই ইঁদারা মত মুখ হইতে জল এবং কয়লা তোলা হয়। মানুষও উহার ভিতর এই দ্বার দিয়া কপিকলের সাহায্যে প্রবেশ করে। উপরের জমি দমিয়া না যায়, এজন্য উক্ত সুড়ঙ্গের ভিতর কুলিরাই কয়লা কাটিয়া "থামের" মত পিল্লে করিয়া দেয়। পরন্তু এই পিল্লে ভাঙ্গিয়া যখন কয়লা বাহির করা হয়, তখন ঐ পিল্লের অল্প অল্প স্থান ভাঙ্গিয়া, তথায় ইষ্টক দিয়া গাঁথিয়া দিতে হয়। এই শ্রেণীর খাদের জন্য ইংরাজ-রাজের অনেক আইন আছে, দুর্ঘটনাও এই শ্রেণীর খাদে যথেষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে আলো লইয়া উলঙ্গ হইয়া কুলিরা কার্য্য করে। পুস্তকাদিতে এই শ্রেণীর

খাদের কথা আমরা অনেক পাঠ করিয়াছি। অনেক টাকা না হইলে. পিক্ খাদ করা যায় না। সিড়ি খাদও পিক খাদের মত। ইহার মুখ খুব প্রশস্ত। সেইস্থানে সিড়ি করিয়া ক্রমে সুড়ঙ্গের সঙ্গে এবং মাঠের সঙ্গে সমান করা হয়। এই সিড়ি দিয়া গাড়ীর সাহায্যে অথবা কুলিরা হাঁড়ুয়া কয়লা তোলে। আমি অল্প মূলধনে কার্য্যারম্ভ করিয়াছি, এজন্য পিক খাদ বা সিড়ি খাদ করি নাই। পুকুর খাদ করিয়াছি, এবং সিঙ্গি দিয়া জল ফেলিতেছি। ক্রমে একার্য্য বড় করিব, ইচ্ছা আছে।

পিক খাদে কুলী-আইন রীতিমত আছে, আমাদের পুকুর-খাদে উহার ঝঞ্ঝাট নাই। পিক খাদে কোন দুর্ঘটনা বশতঃ কুলী মারা পড়িলে, ম্যানেজারকে তজ্জন্য দায়ী হইতে হয়। আমাদের খোলা বাতাসে পুকুর-খাদে মন্দ বায়ু জন্মিবার সম্ভাবনা প্রায় নাই। তবে যে প্রকার খাদ হউক না কেন, সমুদায় খাদের কুলীদিগের অসুখ করিলে, তাহার জন্য আমাদিগকে ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে, এরূপ নিয়ম আছে, এবং পথ্য, ঔষধের মূল্য ও ডাক্তারের দর্শনী বা বেতন আমাদিগকে দিতে হয়।

প্রায় অধিকাংশ কুলী রোজে খাটিয়া থাকে। উহাদের কতক বিষয়ে ঠিক বাঁধাবাঁধি মজুরী নাই। সচরাচর পুরুষ-কুলীকে চারি আনা এবং মেয়ে-কুলীকে ৵১০ রোজ দিতে হয়। খাদ কাটা এবং গাদা দেওয়া কার্য্যে কুলীর মজুরী বাঁধা আছে। ১০ ফুট দীর্ঘ, ১০ ফুট প্রস্থ এবং ১ ফুট উর্চ্চ, এইরূপ গর্ত্ত কাটিতে উহারা যত জনেই খাটুক, আমরা ছয় আনা দিব। যখন খাদ হইতে কেবল কয়লা উঠিবে, তখনও ঐ হার থাকিবে।

খাদের কয়লা তুলিয়া, উহা কত নম্বরের কয়লা, তাহা উহারাই বাছাই করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে গাদা দিয়া রাখে। অবশ্য এ সময় ম্যানেজারকে তাহা দেখিয়া লইতে হয়। আমাদের কাঁটা এবং বাটখারা ইত্যাদি নাই। গাদাটী ১০ ফুট দীর্ঘ এবং ১০ ফুট প্রস্থ এবং ১ ফুট উচ্চভাবে সাজাইয়া দিলে, উহা আমরা ফিতা দিয়া মাপিয়া লই। এই মাপের কয়লা ওজন করিয়া জানা গিয়াছে যে, ২৷৷০ টন হয়। অতএব আর ওজন করিতে হয় না, ঐ মাপেই মাপিয়া ২৷৷০ টন ধরিয়া বিক্রয় করা হয়। এইরূপ একটা গাদা সাজাইতে কুলীরা ৷৷৶০ আনা লয়। গাদার মাপ হইয়া গেলে, তখন উহাকে ডিপোয় রাশীকৃত ভাবে রাখা অথবা রেল-গাড়িতে বোঝাই দেওয়া হয়। রেলগাড়িতে বোঝাই দিবার সময় আবার কুলী-খরচা হয়। আমরা ঐরূপ গাদা মাপিয়া টনের হিসাব করি। ১ টন কলিকাতার মণে ২৭/৮৷৷৵০ ধরা হয়। এই টনের উপর কয়লার দর হয়। আমি ষ্টীম কোক প্রতি টন ১৸/০ দরে বিক্রয় করিয়াছি।

আমরাও কন্‌ট্রাক্ট সর্ত্তে মাল বিক্রয় করি। কেহ কেহ এত ফুট দীর্ঘ এবং এত ফুট প্রস্থ এই স্থানের মধ্যে যত কয়লা উঠিবে, তাহা লইব, এই সর্ত্তে কন্‌ট্রাক্ট করেন; যদি না উঠে, তিনি ও আমি দু'জনেই খালাস হই। কেহ কেহ বা এত দিনের মধ্যে এত টন কয়লা লইব, এই সর্ত্তে কন্‌ট্রাক্ট করেন। কেহ কেহ বিবিধ প্রকার কয়লা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দরে কন্‌ট্রাক্ট করেন। এইরূপ বিবিধ সর্ত্তাদির জন্য প্রত্যেক সর্ত্তে কয়লা এক হইলেও দর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া যায়।

কলিকাতায় বাসা খরচের জন্য যে কয়লা আসিত, তাহাতে ছোট বড় এবং কড়ির মত ও ধূলিবৎ বিবিধ আকারের কয়লা এক সঙ্গে এক মণের ভিতর দেখিয়াছি। এখানেও প্রায় ঐরূপ; তবে উহা বাছাই করা হইয়া দর এবং উহাদের নাম স্বতন্ত্র হয় মাত্র। ইহা ভিন্ন কৃত্রিম উপায়ে দুই প্রকার কয়লা করিয়া দেওয়া হয়, তাহাদের দর বেশী। যে কয়লার আঁচ বেশী এবং ধূম কম হয়, তাহাই ভাল কয়লা। এই শ্রেণীর কয়লাই এঞ্জিন ইত্যাদির জন্য সাদরে ব্যবহৃত হয়।

(ক্রমশঃ)

মহাজন-উক্তি।

কোন ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে, যে সকল নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হয়, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটী নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে। এই নিয়মগুলি ব্যবসায়ে "উন্নতিশীল" কয়েকজন ইউরোপীয়ের অভিজ্ঞতা-প্রসূত; ব্যবসায়ে-প্রবৃত্তদলের উপকারার্থ "ইয়ংম্যান" নামক পত্র হইতে বিলাতের "রিভিউ অফ রিভিউস্" পত্রিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

স্যার টমাস লিপটন বলেন "উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্যে প্রকৃত ফললাভ ঘটে না। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া যদি কেহ কোন ব্যব-

সায়ে প্রবৃত্ত হয় এবং উহার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করে, সুবুদ্ধি-পরিচালিত ভাবে যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করে, রাতারাতি বড়মানুষ হইব, এমনটুকু মনে না থাকে, অন্যের দ্বারা নিজেরা যেরূপ ব্যবহৃত হইতে ইচ্ছা করে, অন্যের প্রতিও যদি সেইরূপ ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহার ব্যবসায়ে উন্নতিলাভের পথে আর কোনরূপ আশঙ্কার কারণ থাকে না।”

টাইম্‌স্ পত্রের ম্যানেজার মিঃ মোবারলি বলেন “প্রথমেই লাভালাভ খতাইওনা। মইখানি কত উচু, লোকে তাহাই দেখে; মইয়ের প্রথম ধাপের উচ্চতা দেখে না, দেখিবার আবশ্যকতাও হয় না। তোমার নিজের কাজটুকু যখন বেশ বুঝিতে পারিবে, তখন তোমার উপরিস্থ ব্যক্তির কাজটুকু শিখিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতে যত্ন করিও। তোমায় যদি কোন রাস্তা ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিতে হয়, তবে এমন করিয়া সেই রাস্তা ঝাঁট দিবে, যেন তেমন পরিষ্কার ঝাঁটান রাস্তা আর কোথাও দেখিতে না পাওয়া যায়। ফল কথা, কাজকর্ম্ম এমনই সুচারুরূপে কিছু নূতনত্বভাবে সম্পন্ন করিবে।”

সার জর্জ লিউনিস এই গুলির সংক্ষেপ করিয়া একটি কথায় তাঁহার পরামর্শ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, “জগতে কোন কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে, লোকে নিজের আমোদ প্রমোদ সুখ সচ্ছন্দতা বিষয়ে যেরূপ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, উহাতেও সেইরূপ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিবে।” মিঃ পিয়ার্সন বলেন, “ছেলেরা খেলার সময় যেমন সকল কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া লয়, পড়ার সময় সেরূপ করে না; ক্রিকেট খেলার সময় তাহারা খেলিবার উপকরণ সামগ্রীগুলি যথাযথ ব্যবস্থিত করিয়া রাখে। ব্যবসায়ের স্থলে তোমাকে ছেলেদের এই ক্রিকেট খেলার বিষয় স্মরণে রাখিয়া সমস্ত কাজ কর্ম্মের সুব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। এমন একটি ব্যবসায় নিজের জন্য নির্ব্বাচন করিয়া লইবে, যাহার জন্য কাজ কর্ম্ম করিতে শেষে তোমার বিরক্তি বোধ না হয়। যে ব্যবসায়টি তোমার পক্ষে বেশ উপযোগী বলিয়া বোধ হইবে, সেইটি অবলম্বন করিয়া আঁটুলির ন্যায় উহাতে লাগিয়া থাকিবে। উহার বিষয়ই সতত চিন্তা করিবে এবং যতদিন না উহাতে সফলতা লাভ করিতে পার, ততদিন অবসর খুঁজিও না।”

অল্‌ডারম্যান টিলোর বলেন, “তোমার কার্য্যের অন্তর্গত সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবে। সার রিচাড টাঙ্গিও নির্ব্বন্ধ সহকারে এই রূপই পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার ব্যবসায়ের অন্তর্গত অতি সামান্য সামান্য কাজ কর্ম্মের প্রতি তাঁহার সততই মনোনিবেশ থাকিত বলিয়াই, তিনি উহাতে সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কথা এই যে, নিজে দেখিবার আবশ্যক হয় না, এমন কোন কার্য্য কোন কারবারের মধ্যে থাকে না। কোন কার্য্য যতই কেন সামান্য হউক না, নিজে সে বিষয় দেখা ভাল।”

মিঃ জে, এস ফ্রাই বলেন, “যখন যে কাজটী করিতে হইবে, তখন অন্য আর কোন কাজে মন না দিয়া সেইটীর উপরই মনের সম্পূর্ণ নির্ভর দিয়া করিতে হইবে। সফলতা প্রধানতঃ এই নীতিটির উপরই নির্ভর করিয়া থাকে।”

স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র দত্ত।

কুশদ্বীপ-কাহিনী হইতে আমরা স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কলিকাতাস্থ অনেক মহাজনদিগের দ্বারা এই মহাপুরুষের ব্যবসায় সম্বন্ধীয় অনেক উক্তি চলিত কথায় অদ্যাপিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইনি জাতিতে তাম্বুলি।

৺মহেশচন্দ্র দত্ত বৈঁচি হইতে খাঁটুরায় আসিয়া বাস করেন। মহেশচন্দ্রের পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনের পুত্র রামরাম। রামরামের পুত্র দীননাথ, শঙ্কর, রঘুনাথ ও বিজয়রাম। তন্মধ্যে দীননাথ ও শঙ্কর নিঃসন্তান। (বিজয়রামের কোন উল্লেখ নাই ?) রঘুনাথের পুত্র ফকিরচাঁদ।

ফকিরচাঁদ দত্ত মহাশয়ের তিন পুত্র; কালীকুমার দত্ত, আনন্দমোহন দত্ত ও বৈদ্যনাথ দত্ত। তন্মধ্যে কালীকুমার দত্তের ছয় পুত্র। গিরিশচন্দ্র দত্ত, প্রসন্নকুমার দত্ত, মঙ্গলচন্দ্র দত্ত, হারাণচন্দ্র দত্ত, হরিশ্চন্দ্র দত্ত এবং বিজয়চন্দ্র দত্ত।

এ প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিষয় বলা উদ্দেশ্য। ইনি ৺কালীকুমার দত্ত মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র ছিলেন। ১২৩৭ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ শনিবারে হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হয়। বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করেন। ইঁহার পিতা ধনবান্ ছিলেন। তাঁহার অনেক কীর্ত্তিকলাপ ছিল। ঋষিতুল্য বুদ্ধিমান ছিলেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হরিশ-

চন্দ্র, গোবরডাঙ্গায় তাঁহার পিতার যে কারবার ছিল, সেই কারবারে কর্ম্ম শিক্ষার্থ প্রেরিত হন। তথায় হরিশ্চন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রসন্নকুমারের নিকট পাঁচ বৎসর কাল থাকিয়া ব্যবসায় সম্বন্ধীয় লেখা পড়া ও দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে হরিশ্চন্দ্র তাঁহার পিতার নিকট কলিকাতায় নিজে একটী ব্যবসায় করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া কালীকুমার তাঁহার বড়বাজারস্থ নিজ অট্টালিকার দ্বিতল গৃহে কাপড়ের দোকান করিয়া দেন। ঐ সময় কলিকাতায় লবণের সুরতি খেলা হইত। ইনি তাহা খেলিয়া ৬ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। সুচতুর হরিশ্চন্দ্র সেই টাকা পাইয়া জীবনে আর সে খেলা খেলেন নাই। ঐ ছয় হাজার টাকা এবং তাঁহার মাতার নিকট হইতে দশ হাজার টাকা একুনে ষোল হাজার টাকা মূলধন লইয়া হরিশ বাবু কাপড়ের কাজ আরম্ভ করেন। উপর্য্যুপরি তিন বৎসর কাল কাপড়ের ব্যবসায় সুন্দররূপে চলিয়াছিল। তাহাতে ইনি বিশেষরূপ লাভবান্ হন। এই সময় কালীকুমার দত্ত এবং বৈদ্যনাথ দত্ত দুই ভ্রাতায় মনোমালিন্য হওয়ায় উভয়ের ব্যবসায় পৃথক পৃথক ভাবে চলিতে থাকে। কালীকুমার দত্ত মহাশয় পুত্রের ব্যবসায়-সম্বন্ধে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা অবলোকনে বড়বাজারের সমস্ত কার্য্যভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে হরিশ বাবু নির্ব্বিবাদে প্রায় বার বৎসর কাল বড়বাজারে কার্য্য করিয়া পিতাকে দুই লক্ষ টাকা লাভ করাইয়া দেন। এই সময়ে মহাত্মা কালীকুমার দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার নিকট চারি লক্ষ টাকা ছিল এবং অন্যান্য পুত্র ও ভ্রাতাদিগের নিকট প্রচুর অর্থ ছিল। ইঁহার শ্রাদ্ধে তাঁহার পুত্রগণ ৩৫। ৩৬ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ১২৬৯ সালের পৌষ মাসে হরিশচন্দ্রের জননী ইহধাম পরিত্যাগ করেন। মাতৃবিয়োগের অনুমান এক মাস মধ্যেই দুর্ভাগ্য-লক্ষ্মী অলক্ষ্যে আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে গ্রাস করিল। পশ্চিমদেশস্থ পাটনা, বাড় প্রভৃতি মোকাম হইতে তাঁহাদিগের সোরা, চিনি, ঘৃত প্রভৃতি নৌকা-যোগে আমদানী হইত। ভাগ্যক্রমে ঐ সময় ঐ সকল মাল নৌকাসমেত জলমগ্ন হয়। তাহাতে ইঁহাদের ষাট হাজার টাকা ক্ষতি হয়। তৎপরে ১২৭১ সালের মাঘ মাসে অগ্রজ গিরিশচন্দ্র দত্তের মৃত্যুতে ইনি দারুণ মনস্তাপ প্রাপ্ত হয়েন। ১২৭২ সালে অষ্টম লাটে ইঁহাদের জমীদারী বিক্রয় হইল। সেই জমীদারীতে কলিকাতা জানবাজারস্থ সুপ্রসিদ্ধ রাণী রাসমণির মালিকান স্বত্ব ছিল এবং অদ্যাবধিও আছে। ১২৭২ সাল হইতে এই মোকদ্দমা আরম্ভ হয় এবং ১২৭৮ সালে বিলাতে ইহার মীমাংসা হয়। জজ-কোর্ট হইতে বিলাত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই মোকদ্দমায় হরিশ বাবু জয়লাভ করেন। দীর্ঘকাল মোকদ্দমার খরচবহন, সাংসারিক ব্যয়, পৈতৃক ক্রিয়াকলাপাদির ব্যয়, পুত্র কন্যাদির বিবাহ ইত্যাদি ব্যয়ে হরিশ বাবু জর্জ্জরীভূত হইয়া পড়িলেন। কারণ মোকদ্দমা তদ্বিরের জন্য ব্যবসায় বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। ব্যবসায়ের উপায় ও জমীদারের আয় সমস্ত বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ক্রমশঃ ইনি একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। এরূপ অবস্থাতে কাহারও নিকট এক কপর্দ্দকও ঋণগ্রস্ত ছিলেন না। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন থাকে নাই। তিনি ক্রমে ক্রমে পুনরায় অতুল অধ্যবসায়ে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

কর্পূর।

চীন, বোর্ণিও এবং সুমাত্রা উপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে কর্পূর বৃক্ষ জন্মে। ইহা কাষ্ঠময় বৃক্ষ। আমাদের দেশের কুল গাছের মত বড় বড় গাছ হয়। গাছের পাতাও প্রায় কুল-পাতার মত। এ গাছের পত্র-কক্ষ হইতে পুষ্প দণ্ড বাহির হইয়া তাহাতে পুষ্প হয়। কিন্তু সকল পত্রকক্ষ হইতে পুষ্প হয় না। কোনটী হইতে পুষ্প এবং কোনটী হইতে পত্র, মুকুল বা বৃক্ষশাখা প্রকাশিত হয়। কর্পূরের পুষ্প গুচ্ছাকার এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ঠিক যেন তুলসী-বৃক্ষের মঞ্জরী। এই বৃক্ষের কাষ্ঠকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া জলে ভিজাইয়া, সেই জল এবং কাষ্ঠ সহিত ঊর্দ্ধে পাতিত করিলে কর্পূর পাওয়া যায়। সিন্দূর যেমন ঊর্দ্ধ পাতিত করিয়া প্রস্তুত হয়, কর্পূরও সেই ভাবে ঊর্দ্ধপাতন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এ অবস্থায় কর্পূর অপরিশুদ্ধ থাকে। পরে উক্ত কর্পূর চূণের সঙ্গে পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধপাত করিয়া পরিষ্কার করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে কর্পূর রিফাইন করা বলে।

কর্পূর জলাপেক্ষা লঘু, তাই জলে ভাসে। ইহা জলে দ্রব হয় না।

সুরা, ইথার এবং তৈল এবং ক্লোরাফর্ম্মের সহিত একত্র করিলে কর্পূর গলিয়া যায়। পরন্তু ৩৪৭° তাপাংশে ইহা গলে। ৪০০° তাপাংশে ইহা ফুটিতে থাকে। রাসায়নিক মতে তিনটি মূল বস্তু কর্পূরে পাওয়া যায়—কার্ব্বণ ২০ অংশ, হাইড্রোজেন ১৬ অংশ, অক্সিজেন ২ অংশ।

কর্পূরের গুণ।

কর্পূর মস্তিষ্ক-উত্তেজক, আক্ষেপ-নিবারক, বেদনা-নাশক, নিদ্রাকারক, স্বেদজনক, জননেন্দ্রিয়ের উগ্রতানাশক। অধিক মাত্রায় খাইলে মর মর হইতে হয়। কিন্তু মরে না। কয়েক ঘণ্টা অচেতন থাকিয়া পরে চৈতন্য হয়। ইহা সাদাসিদে ঘুমের অচেতনতা নহে; অনেক উপসর্গের সহিত ইহা প্রকাশ পায়। ফল কথা, বিকারের সহিত অচেতনতা হয়। স্থল-বিশেষে মারাও পড়ে। ২০ গ্রেণ কর্পূর খাইয়া একটী শিশু মারা পড়িয়াছিল। এ ভিন্ন কর্পূর সেবন দ্বারা অদ্যাবধি আর কোন মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

কর্পূরের ব্যবহার।

জ্বরের উপর ইহা ফিবার মিক্সচারের সঙ্গে চলে—এখানে স্বেদজনক, নিদ্রাকারক গুণের জন্য দেওয়া হয়। অপরত্র শৈত্যকর, স্বেদকর এবং নিদ্রাকর ঔষধের সঙ্গে দেওয়া হয়।

কর্পূর বিসূচিকা রোগের মহৌষধি। সকল প্রকার উদরাময় রোগেও ইহার ব্যবহার হয়। নাকে ঘা এবং সম্মুখের কপালে বেদনা থাকিলে কর্পূর খাইতে এবং আঘ্রাণ লইতে দিবে।

সূতিকা উন্মাদরোগে, স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ বা জরায়ুর রোগে, হৃদ্‌পিণ্ডের রোগে, স্নায়ুসম্বন্ধীয় রোগে—যথা হিষ্টিরিয়ায় মূত্র-যন্ত্রের বিবিধ রোগে, নিম্ফোম্যানিয়া (স্ত্রীলোকের কামোন্মাদ) রোগে, স্যাট হিরিয়েসিস (পুরুষের কামোন্মাদ) রোগে, শুক্রমেহ রোগে, পুরাতন বাতরোগে, গ্রন্থিবাতে, সর্দ্দির প্রথমাবস্থায়, ক্ষুদ্র স্ফোটক প্রকাশের প্রথমাবস্থায়, এবং দুষ্ট ক্ষত রোগে কর্পূর ব্যবহৃত হয়।

উপরে যে সমস্ত রোগে কর্পূরের ব্যবহার বলা হইল, ঐ সমস্ত রোগের অপরাপর ঔষধের সঙ্গে কর্পূরের আরক মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়, নচেৎ কেবল কর্পূর দেওয়া হয় না। স্ফোটক বাহির হইতেছে, এমন সময় অর্দ্ধ গ্রেণ পরিমাণ কর্পূর দিবসে তিনবার খাইবে এবং অল্প তৈলে একটু কর্পূর মিশাইয়া স্ফোটকের উপর মলমরূপে প্রয়োগ করিবে। তাহা হইলে স্ফোটক উত্থিত হওয়া রহিত হইবে।

নাসিকা দিয়া কাঁচা জল বাহির হইতেছে, মাথা কামড়াইতেছে বা চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে, হাঁচি হইতেছে, কাসিও অল্প আছে—এই সকলই সর্দ্দির প্রথম অবস্থা। এই অবস্থায় কর্পূরের পুঁটলি করিয়া কেবল আঘ্রাণ লইবে এবং সময়ে সময়ে কর্পূরের নস্য লইবে; তাহা হইলে রোগ এককালে সারিয়া যাইবে। মাত্রা ১ হইতে ১০ গ্রেণ।

কর্পূরের শিল্প।

দশ ফোঁটা মদে বা ইথারে ২৫ গ্রেণ কর্পূর গলাইয়া উহার সঙ্গে ১৫ ফোঁটা গঁদের জল দিয়া মাখিতে থাক, তাহা হইলে কর্পূর কাদার মত হইয়া যাইবে। এই কর্দ্দমবৎ কর্পূরকে ছোট ছোট গুলি পাকাইয়া ছুচ দিয়া বিঁধিয়া মালা কর, এবং এই মালাকে শুষ্ক করিয়া লও। শুষ্ক হইলে ইহা ঠিক মুক্তার মালার মত দেখিতে হইবে।

কর্পূরকে কর্দ্দমবৎ করিয়া উহা দ্বারা বিবিধ ছাঁচের খেলানা হইয়া থাকে।

চিনির ডিউটি।

বিগত বর্ষের ফাল্গুন মাস হইতে বিট্ চিনির দর কমের জন্য চীন এবং মরিশস্ চিনির কার্য্যে বিশেষ ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়; জর্ম্মণ এবং অষ্ট্রেলিয়া বিট্ চিনির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্রমে চীনদেশীয় চিনি আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। মরিশস্ চিনি সময়ে সময়ে ২।১ জাহাজ সামান্যভাবে বরাবর ক্ষতি স্বীকার করিয়া আসিয়াছে; কারণ মারিশের একমাত্র ব্যবসায় চিনি। উক্ত চিনি তথা হইতে পৃথিবীর মধ্যে ইংরাজ-অধিকৃত অনেক পোর্টে চালান যায়। পরন্তু যে সকল পোর্টে এই চিনি চালান যায়, সেই সকল পোর্ট হইতে আদান প্রদান ভাবে ইহাঁরা চিনি দিয়া অপর দ্রব্য লইয়া থাকেন। এইজন্য কলিকাতা-বন্দরে মারিশ চিনি বিক্রয় করিয়া, ইহাঁরা চাউল, দাউল এবং গৃহপালিত পশু, নানাবিধ ফল ইত্যাদি লইয়া থাকেন; কাজেই মারিশ চিনিতে ক্ষতি হইলেও ঐ সকল দ্রব্যের জন্য ইহাঁদের জাহাজ এ পোর্টে আনিতে হইয়াছে। শুধু জাহাজ আসে না, সুতরাং

চিনি আনিতে হইয়াছে,—চিনি ভিন্ন সে পোর্ট হইতে আর কি আসিবে? চীনের দানাদার চিনির দর ৭৸০ হইতেই আমদানী বন্ধ হইয়া যায়; মরিশস্ দানাদার চিনি ৭।০ দর পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া ইহাঁরা স্ব স্ব গুদামে চিনি মজুত রাখেন। উক্ত ৭।০ দরে যাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে, তিনিই লইয়াছেন। বিট্‌চিনির দর কয় মাস ধরিয়া ৬।৴০ বিক্রয় হইয়াছিল। বিট্ চিনির দর ৬।৴০ হইলেও মরিশস্ চিনি উক্ত সময়ে ৭।০ দরে বিক্রয় হইতেছিল, কিন্তু অতি অল্প। কাজেই এই চিনিদ্বয়ের জন্যই বিট্‌চিনির উপর "আবার অতিরিক্ত ডিউটি" বসাইতে হইল। চিনি-ব্যবসায়ীদিগের প্রাণে প্রাণ আসিল!

এই এক্সট্রা ডিউটি দ্বারা "ভারতের চিনির" উপকার হইবে, ইহা যেন কেহ না ভাবেন। "ভারতে চিনির" কার্য্যের উপকার হইবে, ইহা ভাবা চলে। "ভারতের চিনি" বলিলে এদেশীয় কাঁচা চিনিকে বুঝায়; এ সকল কারখানার উন্নতি আর কিছুতেই হইবে না। এই শ্রেণীর নানা-দেশীয় কারখানার পরিচয় প্রায় প্রতি মাসে "মহাজন-বন্ধুতে" প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ক্ষতির কথা বলিয়াছেন এবং ক্ষতির হিসাব দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ যুদ্ধাস্ত্র ঢাল তরবাল যেমন বন্দুকের সমকক্ষ হইতে পারে না, সেইরূপ কলের নিকট হাতে তৈয়ারী দ্রব্য কখনই সমকক্ষতা লাভ করিবে না। অনেকে বলিতে পারেন, "কেন, এ দেশে ত চিনির কল হইয়াছে?" হইলেও উহা এদেশীয় গুড় এবং কাঁচা চিনির দরের বশীভূত! কারণ চিনির কলে গুড় এবং কাঁচা চিনি (দলুয়া, গোঁড়) রিফাইন হয় মাত্র। কাজেই এদেশীয় গুড় রীতিমত ভাবে সুলভ না হইলে অন্ততঃ এক টাকা, দেড় টাকা মণ না হইলে এদেশীয় চিনির কল বাঁচিতে পারে না। কাশীপুরের কলের সাহেবরা এই জন্য জাবা হইতে "র-সুগার" বা কাঁচা চিনি আনাইয়া শস্তা দরে গ্রে মার্কা চিনি করিয়া এই দেশেই বিক্রয় করেন। পরন্তু ভারতের কাঁচা চিনি লইয়া তাঁহারা যে দানাদার চিনি করেন, তাহা অন্য পোর্টের দানাদারের মত তত ভাল হয় না; এবং তাহাদের সঙ্গে দরেও শস্তা নহে। অতএব প্রকৃতপক্ষে "ভারতের চিনি"র উপকার করিতে হইলে, এই শ্রেণীর ভারতের কলগুলিকে বাঁচাইতে হয়। এই কলগুলি বাঁচিলেই ভারতে এদেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত কারখানা গুলিও অপেক্ষাকৃত সজীবতা লাভ করে। ভারতের চিনির কল বাঁচাইতে গেলেই যেমন জর্ম্মণ এবং অষ্ট্রেলিয়া বিট্‌চিনির উপর এক্ষণে ঘন ঘন অতিরিক্ত ডিউটি বসাইয়া চীন এবং মরিশস্ চিনিকে বাঁচান হইতেছে, সেইরূপ ঘন ঘন মারিশ এবং চীন চিনির উপর অতিরিক্ত ডিউটি বসাইতে হয়; তাহা হইলে "ভারতের চিনির" প্রকৃত উপকার হয়। কিন্তু তাহা হইবার নহে। আমরা বিশেষরূপে জানিয়াছি, ইহাতে ইংরাজরাজ বলেন, "দেশী চিনির কার্য্যে সুবিধা হউক বলিলে" ইংরাজরাজ এই মনে করেন যে, যেমন ভারতবর্ষ আমাদের দেশ, সেইরূপ চীন এবং মরিশস্ দ্বীপও আমাদের দেশ।" রাজার মত কথা বটে! সাধারণে ইহা ভাবিবেন। বেশী বলিব না, কেবল এইমাত্র বলিব যে, এক পিতার পাঁচ সন্তান থাকিলে, তাহাদের প্রতিপালন এবং বিবাদ সেই এক পিতাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে করিতে হয়। যাহা হউক, ইংরাজ দ্বারা পরিচালিত চিনির কল যখন বাড়িবে, সে সময় ইংরাজের কলে ক্ষতি হইলে, তখন তাঁহারাই যদি চীন এবং মরিশস্ চিনির উপর অতিরিক্ত ডিউটি বসাইয়া উহার আমদানী বন্ধ করিতে পারেন, তবেই এদেশী চিনির মঙ্গল! কিন্তু ২।১টী ইংরাজের কলে ইহা হইবে না, বেশী ইংরাজ চাই। চীনে যাহাই হউক, মারিশ বেচারি ভারতের অন্ন বা চাউল না পাইয়া মারা পড়ে, ইহাও ভাবা ত উচিত।

এক্ষণে সকলে এই বুঝিবেন যে, যাঁহারা বলেন "দেশী চিনির কার্য্যে ডিউটির দ্বারা সুবিধা হইল।" বস্তুতঃ তাঁহারা ভুল বলেন। তাঁহাদের বলা উচিত এই যে, "ভারতে ইংরাজ-অধিকৃত অন্যান্য দেশের যে সকল চিনি আসিয়া বিক্রয় হইত, সেই সকল চিনিকে যে সকল দেশ ইংরাজ-অধিকৃত নহে, সেই সকল দেশের চিনি (যথা বিট্-মূলোৎপন্ন চিনি) আসিয়া হারাইয়া দিতেছিল; এইজন্য আমাদের ইংরাজরাজ দয়া করিয়া উহাতে অতিরিক্ত ডিউটি বসাইয়া দিয়া ভারতের চিনিব্যবসায়ীদিগের কার্য্যে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।" এই শ্রেণীর চিনিব্যবসায়ীর সঙ্গে এবং এদেশী চিনির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ইহাঁরা বিদেশী চিনি আনেন এবং ভারতের হাটে বসিয়া তাহা বিক্রয় করেন। ইহাদেরই জন্য ড়িউটি হইয়াছে।

চিনির ডিউটির অপরাপর কথা আগামী মাসে বলিব।

সংবাদ।

বিগত ১৪ই চৈত্রের মিহির ও সুধাকর পত্রে মক্কাপ্রবাসী তথাকার মুদ্রায় এই হিসাব দিয়াছেন,—

"ভারতীয় টাকা মক্কা, মাজ্জমা, তায়েফ এবং জেদ্দাতে ২১ কোরস এবং রাবকে ২০ কোরস হিসাবে চলে, আবার মদীনা এবং মনুওয়ারাতে উহা ২৪ কোরস হিসাবে চলিয়া থাকে। এখানে ফর্দ্দানীয় (পোয়া পয়সার) চলন নাই। অন্যান্য দেশের অচল মুদ্রা ঐ সকল দেশে চলিয়া থাকে। তবে উহার মধ্যে ছিদ্রযুক্ত টাকা থাকিলে তাহা ৪ কোরস কমে বিক্রয় হয়।"

বিগত ১লা এপ্রিল হইতে এক টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত মণিঅর্ডার এবং পার্শেল, ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইতে এক আনা খরচায় যাইতেছে। দরিদ্র দেশের মত উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে।

মার্বোটানির যন্ত্র তন্ত্র কলিকাতায় আসিয়াছে। উহা কলিকাতার বড় টেলিগ্রাফ আফিসে আছে। পরন্তু এই যন্ত্র দ্বারা বিনা-তারে আলিপুরের মিস্ত্রিখানা হইতে জেনারেল পোষ্টাফিসের সঙ্গে সংবাদ চলাচল করিবে। এই পরীক্ষার পরে নানাস্থানেই বিনা-তারে টেলিগ্রাফ চালাইবার ব্যবস্থা হইবে। মার্বোটানি সাহেব এই যন্ত্র আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে ইহার জন্য অনেকের সাহায্য পাইয়াছিলেন। শুনা যায়, তন্মধ্যে আমাদের বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসু মহাশয়ও আছেন। এ কাজের প্রথম যুক্তি ইনিই মার্বোটানিকে বলেন। অতএব সকলের জানা উচিত যে, বাঙ্গালী কাণ্ডতে (মূলে) আছেন ; কিন্তু কারখানায় (ব্যবসায়ে) নাই। যাহা হউক মার্বোটানি মহোদয় এ জন্য সকলকেই ধন্যবাদ দিয়াছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইন সাড়ে নয় শত ক্রোশ বিস্তৃত। এপক্ষে ভারতের রেল প্রায় ইংলণ্ডের এবং আমেরিকার সমকক্ষ হইয়াছে। পরন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের দশ হাজার পাঁচ শত আঠার খানা গাড়ী আছে। এ পক্ষে লণ্ডনের রেলওয়ের গাড়ীর সংখ্যা অনেক বেশী ; তথায় তেষট্টি হাজার নয় শত আটখানা গাড়ী আছে। ভারতবাসী ঘেঁস লয়, লণ্ডনবাসীরা সাহেব ! তাই এখানে গাড়ী কম। কিন্তু এ কম আর থাকিবে না। গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের তীব্রদৃষ্টি পড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই হুকুম হইয়াছে, ইণ্টার এবং থার্ডক্লাশ গাড়ীতে পায়খানা করিতে হইবেক। এবার হইতে পায়খানা এবং গাড়ী এক হইবে। অতএব ভারতবাসীর খুব সুবিধা।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
২য় খণ্ড ; ৫ম সংখ্যা। আষাঢ়, ১৩০৯ সাল।

শর্করা বিজ্ঞান।

(লেখক শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়,—M. A, M. R. A. C, and F. H. A. S.)

একাদশ অধ্যায়, ২য় প্রবন্ধ।

আক মাড়াই করিয়া যে রস বাহির হইবে, উহা মৃত্তিকা বা এলুমিনিয়ম্ নির্ম্মিত বৃহদাকারের নাদের মধ্যে রাখিয়া, কাল-বিলম্ব না করিয়া, ঐ নাদ চুলার উপর স্থাপিত করিয়া রস গরম করিতে হইবে। রস চুলার উপর চড়াইয়া দিয়াই উহার মধ্যে জল-মিশ্রিত ফস্‌ফরিক এসিড্ মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক কেরোসিন-টিনপূর্ণরসের ওজন প্রায় অর্দ্ধ মণ হইয়া থাকে। যদি নাদের মধ্যে এককালীন ৪ টিন অর্থাৎ দুই মণ রস দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ রসের মধ্যে এক বোতল জলে ৪০ ফোটা ফস্‌ফরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া ঐ জল ঢালিয়া দিতে হইবে। পরে তাপমান যন্ত্র ব্যবহার দ্বারা দেখিতে হইবে, উষ্ণতা ১৩০ ডিগ্রি (ফারেন্‌হিট্) পরিমাণ হইয়াছে কি না। রস এই পরিমাণ উষ্ণ হইলেই, উহার মধ্যে চূণের জল ছিটাইতে হইবে। চূণের জল এইরূপে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে ;—সদ্য দগ্ধ পাথরিয়া চূণ গুঁড়া করিয়া আঁটা বোতলের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। যত কেরোসিন্ টিন রস ব্যবহার করা যাইবে, তত তোলা গুড়া চূর্ণ বোতল হইতে লইয়া অন্য একটি বোতলে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধের ন্যায় পাতলা করিয়া লইতে হইবে। দুই তোলা চূণ একটী বড় বোতলে রাখিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দশ মিনিট ধরিয়া আলোড়িত করিলেই দুগ্ধের ন্যায় পাতলা হইয়া যাইবে। রস ১৩০ ডিগ্রী উষ্ণতা প্রাপ্ত হইলেই উহার মধ্যে এই চূণের জল ধীরে ধীরে ছিটাইয়া দিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে লিট্‌ম্‌সপেপার নামক রঙ্গিন কাগজ খণ্ড ব্যবহার দ্বারা দেখিতে হইবে, যথেষ্ট পরিমাণ চূণ খাওয়ান হইয়াছে কি না। নীলরঙ্গের লিট্‌ম্‌স্ পেপার রসের মধ্যে দিলে দেখা যাইবে, লাল হইয়া যাইতেছে। চূণ খাওয়াইতে

খাওয়াইতে দেখা যাইবে, কাগজের নীল রং আর লাল হইতেছে না। অধিক চূণ পড়িয়া গেলে লালবর্ণের লিট্‌মস্‌পেপার পুনরায় নীল হইয়া যাইবে। এরূপ হওয়াও চলিবে না। নীলবর্ণের উক্ত কাগজ লাল হইতেছে না এবং লালবর্ণের উক্ত কাগজও নীল হইতেছে না, যখন রসের এইরূপ অবস্থা হইবে, তখন বুঝিতে হইবে, যথেষ্ট চূণ খাওয়ান হইয়াছে, অথচ অতিরিক্ত চূণ খাওয়ানও হয় নাই। আকের রস সাধারণতঃ কিছু অম্ল; মাড়াই করিবার পরে রস আরও অধিক অম্ল হইতে থাকে। অম্ল সংযোগে রস গুড়ে পরিণত হইবার সময় অল্প বিস্তর সার মাতে পরিণত হয়। চূণের দ্বারা অম্ল কাটাইয়া লইতে পারিলে, অম্ল প্রযুক্ত সার হইতে যে মাৎ জন্মে, সেই মাৎ আর জন্মিতে পারে না। রস সমস্ত দিবস রাখিয়া টকাইয়া লইয়া পরে যদি জ্বাল দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ রস হইতে সমস্ত গুড়ই মাৎ বা চিটা হইয়া যায়, উহাতে সার ভাগ কিছুই থাকে না। ফস্‌ফরিক এসিড অম্লরসযুক্ত হইলেও উহা মিশ্রিত করিবার কারণ সার মাৎ হইয়া যায় না। অন্য সকল অম্লের মিশ্রণ দ্বারা সার মাৎ হয়, কিন্তু ফস্‌ফরিক এসিড এই সাধারণ নিয়মের অনুগামী নহে। ফস্‌ফরিক এসিড মিশাইবার জন্য কোন ক্ষতি হয় না, অথচ উহা দ্বারা একটী উপকার পাওয়া যায়। রসের সহিত চূণ মিশাইবার জন্য রসের অম্লতা কাটিয়া যায়; এবং রসের মধ্যে যে সকল যবক্ষারযান-ঘটিত জৈব পদার্থ (albuminoids) নিহিত থাকে, ঐ সকল পদার্থও উত্তাপ সহযোগে তরল রস হইতে পৃথক হইয়া কঠিন পদার্থের চূর্ণভাব ধারণ করে। চূণ এই দুই কার্য্য সাধিত করিয়া যে এককালীন চূর্ণ কঠিন পদার্থের সহিত পৃথক হইয়া কাটিয়া যায়, এমত নহে। স্ফটিক রসের সহিত চূণের কিয়দংশ মিশ্রিত থাকে। কিন্তু রসের মধ্যে চূণের অংশ নিহিত থাকা বিধেয় নহে। ঈষৎ চূণ সংযোগেও গুড়ের ও চিনির রং কিছু ময়লা হয়। চূণ এককালীন কাটাইয়া দিবার জন্য ফস্‌ফরিক এসিডের ব্যবহার। অধিক উত্তাপে অবশিষ্ট চূণের অংশ ফস্‌ফরিক এসিডের সহিত মিশিয়া একটী নিতান্ত কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। ইহার নাম ট্রাইক্যাল্‌সিক ফস্‌ফেট। চূণ রসের অম্লতা কাটাইয়া দিল; চূণ রসের মধ্যে নিহিত জৈব পদার্থগুলির সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাদিগকে ধূলিবৎ করিয়া ফেলিল; এবং অবশিষ্ট চূণ ফস্‌ফরিক এসিডের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধূলির ন্যায় হইয়া রসের নিম্নে পড়িয়া গেল। জৈব পদার্থগুলি দুর করিয়া দিবার জন্য গুড় ভবিষ্যতে পচিয়া দুর্গন্ধ হয় না; উহা বর্ষার সময়ও অবিকৃত অবস্থায় থাকে। (ক্রমশঃ)

মানভূমে কয়লার খনি।

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের এ স্থানে যে কয় প্রকার কয়লা পাওয়া যায়, উহাদের বিশেষ বিবরণ, দর ইত্যাদি যথাসম্ভব নিম্নে লিখিতেছি।

১। রাঙ্গি কয়লা,—খনির প্রথম স্তরে ষ্টীম কোকের উপরে ইহা মিশ্রিত ভাবে থাকে, ইহার সঙ্গে মাটী এবং লৌহ ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। ইহা ভাল কয়লা নহে। ষ্টীম কোকের উপর অংশ হইতে যথাসম্ভব ইহাকে ভাঙ্গিয়া বাহির করা হয়, এ জন্য ইহা প্রায়ই গুঁড়াভাবে পাওয়া যায়; বর্ণ লাল্‌চে এবং আকৃতি ধূলাবৎ। ইহা সহজ অবস্থায় সচরাচর বিক্রয় হয় না। একটী প্রশস্ত গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তের নিম্নে কাষ্ঠ সাজাইয়া উহার উপর ইহাকে কাঁড়ি করিয়া ঢালিয়া গর্ত্তের নিম্নে সেই কাষ্ঠে আগুন ধরাইয়া দিতে হয়। একদিন বা দুই দিন ধরিয়া বেশ ভাল ভাবে পুড়িলে, তাহা পরীক্ষা করিয়া জানিয়া, পরে ষ্টীম বরল চালুনীতে চালিয়া লইয়া উহার যে ধূলা পাওয়া যায়, সেই ধূলা জলে গুলিয়া, সেই জল দিয়া এই প্রশস্ত অগ্নি-ক্ষেত্র নিভাইতে হয় এবং মাঝে মাঝে কেবল রবলের গুঁড়া দিয়া ও চাপ দিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে হয়। নির্ব্বাণের সময় জল যত বেশী দেওয়া যায়, ততই এ শ্রেণী কয়লার চাপ ভাল বাঁধে এবং কয়লা ভাল হয়। এই প্রক্রিয়া করিয়া যে কয়লার চাপ পাওয়া যায়, তাহাকে "বিবি রবল" কহে। ইহা প্রতি টন ১৲, ১।০ সিকা দরে বিক্রয় হয়।

২। ষ্টীম কোক,—ইহা খনির কাঁচা চাপ। কাল পাথরের মত আকৃতি। এক ইঞ্চি পুরু। ইহাতে হস্ত দিলে, হাতে তেল মত লাগে। খাত মন্দ হইলে বা খাত-বিশেষে এই কয়লার প্রথম স্তরে রাঙ্গির সঙ্গে শ্লেট পাথরের মত একটী স্তর থাকে। এই স্তর সহজে নষ্ট হয় না, এ জন্য ইহা দ্বারা অধিকাংশ স্থলে কয়লার কাজ হয় না বলিয়া, ইহা প্রায়ই অব্যবহার্য্য

হইয়া পড়ে। ৯ ইঞ্চি ষ্টীম কোকের গাত্রে ৩ ইঞ্চি শ্লেটের স্তর আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু অধিকারীর মন্দভাগ্য হইলেই খাত হইতে এই কয়লা উঠিয়া মহাজনের ক্ষতি করে। নচেৎ প্রায় দেখা যায়, রাঙ্গি বা শ্লেটের স্তর নাই,—এমন সুন্দর ষ্টীম কোক সর্ব্বদা পাওয়া যায়। ইহার মূল্য কন্‌ট্রাক্ট সর্ত্তে প্রতি টন এক টাকা তের আনা মাত্র উপস্থিত দর।

৩। ষ্টীম রবল,—ইহা ষ্টীম কোকের ভগ্নাংশ মাত্র; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের মত বা কড়ির মত ষ্টিম কোকের অপর নাম "ষ্টিম রবল।" প্রতি টনের দর দেড় টাকা মাত্র।

৪। ডাষ্ট,—অর্থাৎ ধূলা, ষ্টিম রবল চালুনীতে চালিয়া লইলে, পরে অবশিষ্ট যে ধূলা পাওয়া যায়, তাহাকেই ডাষ্ট বলে। ইহাকে খনিওয়ালারা প্রায়ই বিক্রয় করেন না; কারণ ইহা দ্বারা হার্ড কোক প্রস্তুত হয়। তবে বিক্রয় করিলে ইহার দর প্রতি টন বার আনা মাত্র।

৫। হার্ড-কোক,—একটী প্রশস্ত গর্ত্ত বা চৌবাচ্ছা-বিশেষ করিয়া, উহার প্রথম স্তরে কাষ্ঠ সাজাইতে হয়, পরে ডাষ্ট ঢালিয়া জল দিয়া মুগুর দিয়া ছাদপেটা মত করিতে হয়। তৎপরে উহার উপর পুনরায় আর এক স্তর কাষ্ঠ সাজাইয়া, আবার ডাষ্টের গুঁড়া ঢালিয়া জল দিয়া পিটিতে হয়। এক ইঞ্চি স্থূল এই ভাবে স্তরগুলি চাপিয়া দেওয়া হয়। পুনরায় কাষ্ঠ-স্তর, আবার ডাষ্টের স্তর, এইরূপে চৌবাচ্ছাটী পূর্ণ করিয়া উহার কাষ্ঠে আগুন ধরাইয়া দিতে হয়। ২।১ দিনে ইহা ভাল ভাবে পুড়িলে, তৎপরে জল দিয়া আগুন নিভাইয়া যে কয়লার চাপ পাওয়া যায়, তাহাকেই হার্ডকোক বলে। ইহা সুন্দর কয়লা, আঁচ বেশী, ধূম কম, ও অতি হাল্কা। এই সকল গুণের জন্য ইহা সাদরে এঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়। মূল্যও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; প্রতি টন সাড়ে চারি কিংবা পাঁচ টাকা মাত্র। হার্ড কোক ঈষৎ সাদা বর্ণের—চিকচিকে থাকিলে, তাহা উৎকৃষ্ট নহে। ইহার চাপ এক ইঞ্চি স্থূল, হাল্কা এবং বর্ণ ঘোর কাল হইলেই ভাল হয়।

৬। সফ্‌ট কোক,—অর্দ্ধ গাদা ষ্টিম কোক এবং এক গাদা রাঙ্গি অর্থাৎ ১৷০ টন ষ্টীম কোক এবং ২৷৷০ টন রাঙ্গি একত্র করিয়া "বিবি রবল" করিবার প্রক্রিয়ায় ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা হার্ড কোকের মত উৎকৃষ্ট না হইলেও প্রায় ঐরূপ বটে। ইহাও হাল্কা, আঁচ বেশ হয়, ঝামার মত আকৃতি, বর্ণ কাল। দর তিন টাকা প্রতি হন্দর।

৭। সফ্‌ট্ কোকের ২ নং কয়লা,—সফ্‌ট্ কোকের ভগ্নাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইট বা কড়ির মত আকৃতি যে কয়লা গুলি পাওয়া যায়, তাহাকেই ২ নম্বর সফ্‌ট্ কোক বলে। দর প্রতি টন দুই টাকা বার আনা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ২৷৷০ টনে এক গাদা হয়। এক্ষণে "রাইজীন" অর্থাৎ উৎপন্ন কয়লার যে পড়তা আমরা ধরি, তাহাই বলিয়া অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিয়া দিতেছি।

ষ্টিম কোক এক টাকা তের আনা পূর্ব্বে ধরিয়াছি, এক্ষণে উহা এক টাকা বার আনা ধরুন, ১ গাদা ২৷৷০ টন, আমরা প্রত্যেক গাদায় এইরূপ পড়ন ধরি।

জমা,—	
১ গাদা—২৷৷০ টন, প্রতি টন ১৸০ আনা হিসাবে—	
বিক্রয় করিয়া পাইলাম … …	৪৷৵০
খরচ,—	
খনি হইতে তুলিতে কুলি খরচা … …	৷৵০
খনি হইতে ষ্টেসন পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে গরুর গাড়ি ও মুটে খরচ … …	৸০
জমীদারের কমিসানী—প্রতি টনে ৵০ আনা হিসাবে ২৷৷০ টনে গাদা বলিয়া …	৷৴০
ম্যানেজারের বেতন, বাসা-খরচ ইত্যাদি প্রতি গাদায় …	৷০
মোট …	১৸৶০
পূর্ব্বের জমা ৪৷৵০ হইতে ১৸৶০ আনা খরচ বাদ দিলে প্রতি গাদায় লাভ থাকে … …	২৷৶০

খনি হইতে রেল-ষ্টেসন পর্য্যন্ত গরুর গাড়ি ভাড়া আমাদের অতিরিক্ত লাগে। আমাদের সাইডিং পর্য্যন্ত ওয়াগন দিলে এ খরচা বাঁচিয়া যায়। পূর্ব্বে শুনা ছিল, রেল কোম্পানীর একটী আইন আছে যে, প্রত্যেক খনির সাইডিং পর্য্যন্ত রেলগাড়ী যোগান দিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, আমরা যদি খরচা করিয়া খনির নিকট পর্য্যন্ত রেলের পাটি বসাই, তাহা হইলে ওয়াগন পাওয়া যায়। আমার ক্ষুদ্র কার্য্য বলিয়া এখনও ইহা করি নাই।

ম্যানেজারের বেতন ৩০৲ টাকার কম নাই, উচ্চ ইংরাজ ম্যানেজারের

বেতন ২৫০৲ টাকা। গাদায় ।০ চারি আনা খরচা ধরিলে, আমার সামান্য ভাবের কার্য্য, তবু প্রত্যহ ৩৫ টন মাল অর্থাৎ রেলগাড়ি ১৬ বা ১৭ টন যাহাতে বোঝাই হয়, এইরূপ গাড়ির দুই গাড়ি মাল উঠে। তবেই ধরুন, অন্ততঃ ১৪ গাদা মাল আমার উঠিতেছে। অতএব গাদায় চারি আনা ধরিলে প্রত্যহ ৩৷৷০ টাকা মাহিনা ও বাসা-খরচ পাওয়া যায়। আমি এখনও ম্যানেজার রাখি নাই। অতএব আমার ৩৷৷০ টাকা কিছুতেই প্রত্যহ খরচ হয় না। ম্যানেজার থাকিলে নিশ্চয়ই ইহাপেক্ষা কার্য্য বাড়িবে। অতএব তখন ৯০৲ টাকা বেতনের জনৈক বাঙ্গালী ম্যানেজার রাখিব।

ছয় মাস আসিয়াছি, এখন প্রত্যহ ১৪ গাদা মাল উঠিতেছে, ৬০ জন কুলী আমার আছে। প্রতি গাদায় ২৷৵০ স্থলে ধরুন ২৲ টাকা লাভ হইলে ১৪ গাদায় ২৮৲ টাকা লাভ উপস্থিত প্রত্যহ হইতেছে। এই হিসাবে আমার ২৫০০ শত টাকা মূলধন তুলিতে কতদিন যাইবে, তাহা হিসাব করিয়া দেখুন। তবু সবেমাত্র ৬৫ ফুট দীর্ঘ এবং ৬৭ ফুট প্রস্থ এই একটীমাত্র খাত কাটাইয়াছি, আর একটী অপর স্থানে আমারই জমিতে কাটাইতেছি। এখনও ১০০ বিঘার কত জমি আমার পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে যদি কয়লা পাই, তাহা হইলে আমার ২৷৩ পুরুষ উহা কাটিয়া লইয়াও শেষ করিতে পারিবে না। ইতিমধ্যেই আমি ইট পুড়াইতে দিয়াছি, খাতের মাটিতেই ইট হয়। এইবার রীতিমতভাবে থাকিবার বাড়ী এবং আফিস ইত্যাদি করিব।

আমি দুঃখী ব্রাহ্মণ-সন্তান। ইংরাজী লেখা পড়া ভাল জানি না, কিছু টাকা পুঁজি ছিল, তাহাও কোম্পানীর কাগজ। মহাজনবন্ধু সম্পাদকের সম্পূর্ণ পরামর্শে, এই কার্য্যে ২৫০০৲ টাকা ফেলিয়া ইতিমধ্যেই যে ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি, তাহা সর্ব্বদা মনে জাগিতেছে, আর দুই হস্ত তুলিয়া দিবারাত্রি মহাজনবন্ধু সম্পাদককে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমার মত দুঃখী বাঙ্গালী ভ্রাতারা চাকুরী ছাড়িয়া এস ভাই! ভারতবর্ষের মৃত্তিকার ভিতর টাকার খনি রহিয়াছে, দয়াময় ইংরাজের কৃপায় ইহা আমরা জানিতেছি। অতএব আর কেন এস, এই কয়লার খনির কার্য্যে স্বদেশবাসী যোগ দাও, আমাদের দেশের ঐশ্বর্য্য বাড়িয়া যাইবে। ইংরাজী লেখা পড়া জানা থাকিলে, একার্য্য আরও সুচারুরূপে চালাইতে পারিবেন।

শ্রী ঃ—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সুধা।—সচিত্র, উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত। ইহা সাহিত্যসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। শ্রীশ্রীমৎস্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত মেদিনীবান্ধব নামক সাপ্তাহিক পত্রে ইতিপূর্ব্বে মহাভারতী মহাশয়ের এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে প্রকাশ, এই মহাত্মা বঙ্গের সমুদায় জেলা গুলির বিস্তৃত ইতিহাস সংগ্রহ করিবেন। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর পুস্তক নাই বলিলেই হয়। শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত মহাশয় "তম্‌লুকের ইতিহাস" লিখিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় "কুশদ্বীপ-কাহিনী" নামে কুশদ্বীপের সুন্দর ইতিহাস লিখিয়াছেন। কুশদ্বীপ-কাহিনীতে চব্বিশ পরগণার অনেক তত্ত্ব পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, বাবু নিখিলনাথ রায় মহোদয় "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস" লিখিয়াছেন, তাহাও সুন্দর হইয়াছে। এই সকল পুস্তক হইতে মহাভারতী মহাশয় অনেক সাহায্য পাইয়াছেন। আমরা বলি, কেবল ইংরাজী পুস্তকের সাহায্যে তিনি যেন কার্য্যোদ্ধার না করেন। অধিকন্তু এই বিষয়টী তাঁহার যেমন যেমন সংগ্রহ হইবে, উহা "সুধা"তে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলে, বাস্তবিক সুধা এ দেশের পক্ষে একটী বৃহৎ কার্য্য করিবেন। এইরূপ এক একটী বৃহৎ কাজ মাসিক পত্রিকা গুলির করা উচিত। এ পক্ষে "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা" আমাদের পথপ্রদর্শক। এই পত্রিকা কেবল "বাঙ্গালা ভাষা" লইয়াই আছেন। দশ বৎসর চলিতেছে। ইহা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় অনেক কার্য্য হইতেছে। ইহা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার মত এক এক বিষয় লইয়া থাকাই এখন আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত। সে কালের "বঙ্গদর্শনের" মত আট-ভাজা এখন উচ্চ বংশে চলে না—পেট গরম হয়। এ পক্ষে "সাহিত্য" যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহা মন্দ নহে; সাহিত্য বলেন, "বঙ্গদর্শনের মান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই বঙ্কিম বাবু উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।" "সুধা"র অনেক প্রবন্ধ পাঠে বস্তুতঃ আমাদের মাতাল করিয়া ফেলে!!

শিবপুর কলেজ পত্রিকা।—ইহা মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র বাকৃচি বি, এ দ্বারা সম্পাদিত। বার্ষিক মুল্য সহরে ও মফঃস্বলে ১৷৷০

টাকা। এই পত্রিকার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীজীবচন্দ্র লাহিড়ী, ঠিকানা পোষ্ট শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ। ইহা পাঁচ মাস বাহির হইতেছে। এই পত্রিকায় কেবল কৃষি, বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারীং বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমরা বরাবর বলিতেছি, এই শ্রেণীর পত্রিকা যত দেখিবেন, সবই লইবেন। কারণ কৃষিশিল্প-পত্রিকা বঙ্গভাষায় নাই বলিলেই হয়। বড় বড় লাইব্রেরীগুলির ক্যাটালগে দেখিবেন, গল্প এবং ছড়ার বই রাশি রাশি রহিয়াছে; কিন্তু শিল্পের বই ক'খানা দেখিতে পান? সাহিত্যের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি হয় না। গদ্য আদত জিনিস; পদ্য উহার সৌন্দর্য্য! তাহা আমরা বুঝি, কিন্তু সে পদ্য এখন স্কুলের দশ বৎসরের বালকেরা লিখে,—কাজেই উহা ছড়া হয়। এই ছড়া কাটাইয়া কখনই দেশোদ্ধার হইবে না; ইহা কি এ দেশের লোক বুঝেন না? রোগীর নিকট, সেই রোগের উদ্দীপক দ্রব্যগুলি খাইতে ভাল লাগে। দেশের পক্ষেও এখন তাহাই হইয়াছে। বঙ্গভাষায় কৃষিশিল্প-পত্রিকার পাঠক যে নাই, তাহা বলিতেছি না; তবে যথেষ্ট নহে, যাহা আছে, তদ্দ্বারা মনের মত করিয়া একখানি কৃষিশিল্প-পত্রিকা চালাইবার পক্ষে উপযুক্ত নহে। এ শ্রেণীর পত্রিকা অনেক কারণে বাঁচে না;—১ম, সম্পাদককে কৃতকর্ম্মা হইতে হয়; অন্য শ্রেণীর সুশিক্ষিত মহোদয় মনে করিলেই এ শ্রেণীর কাগজ চালাইতে পারেন না। ২য়, উপযুক্ত মূলধনের অভাব অথবা ক্রমশঃ ক্ষতি করিয়া কেহই কার্য্য রাখিতে চাহেন না,—এ পক্ষে সহৃদয় গ্রাহক মহোদয়গণের অর্থ-সাহায্যে কৃপণতা বলিতে হইবে, অথবা রুচির অভাব। ৩য়, শিল্প পত্রিকার লেখকের অভাব। উপস্থিত যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের যত দিন কাজ কর্ম্ম ভাল না থাকে, তত দিন সময় কাটাইবার জন্য কিছু কিছু লিখিয়া দেন। তৎপরে কার্য্য পাইলেই "এই রহিল তোমার দেশোদ্ধার!" আমরা ভুক্তভোগী কি না, বেশ জানি! আমার এক বন্ধু "চা"র প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন; কিন্তু যেমন তিনি আসামের কোন চা-বাগিচায় ম্যানেজারী-পদ পাইলেন, তৎক্ষণাৎ সে লেখার কথা বিস্মৃত হইয়া তথায় চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে মনে করাইয়া দিলে, বন্ধু পত্রের উত্তর দিলেন "তোমাদের রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়া গিয়াছেন, 'মধুমক্ষিকারা যতক্ষণ ফুল্লের মধু না পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ফুলের চারিধারে ভন্ ভন্ করে, তৎপরে উহাতে বসিয়া মধু পাইলে তাহাদের আর ভন্‌ভনানি

থাকে না। দাদা! মণি, সুইট দ্যান হনি। তাহা আমি পাইয়াছি। আর, তোমরা যে ফুল-সমাজের নিকট ভন্ ভন্ করিতেছ, ও ফুলে মধু নাই। ক্ষমা করিও দাদা!" ফলে শিল্পে-কৃতকর্ম্মা লেখক না হইলে শিল্প-পত্রিকা ভাল হয় না, তাহা পাঠকেরও তৃপ্তিকর নহে। আমাদের "শিবপুর কলেজ পত্রিকার" লেখকেরা শিল্পে সকলেই কৃতকর্ম্মা! এই জন্যই এ পত্রিকার গৌরব বেশী। বঙ্গীয় পাঠক মহাশয়দিগের উচিত, এ সময় এই শ্রেণীর পত্রিকাগুলিকে বাঁচাইবার উপায় স্থির করা। যাহা পাইতেছি, তাহা যেন না হারাই! এ দেশের রাজারা এখনও এ সকল বিষয়ে মনোযোগী হয়েন নাই। তাঁহারা নাম কিনিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের হস্তে লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু দেশের কৃষি-শিল্প পত্রিকা বাঁচিলে যে পরিণামে তাঁহারা গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের হস্তে কোটি কোটি টাকা দিতে পারিবেন, ইহা তাঁহারা একবারও মনে করেন না। কৃষিশিল্প যেমন এদেশের দীন দুঃখী লোকের কাজ, তাই ইহার পত্রিকাগুলিও যেন চিরকাল দীন দুঃখী ভাবে থাকিবে, বোধ হয় তাঁহারা এই মনে করেন। অতএব এ সময় সাধারণের উচিত, এদেশে চাঁদা তুলিয়া কৃষি-শিল্পের জন্য বড় বড় সভা করা। সেই সভাগুলিতে অন্ততঃ ৪।৫ শত সভ্য যাঁহারা থাকিবেন, তাঁহারা প্রতি বৎসর ৪।৫ টাকা প্রত্যেকে কৃষি-শিল্পপত্রের জন্য সাহায্য করিবেন, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। এই শ্রেণীর প্রত্যেক সভা হইতে—অন্ততঃ একটী বড় গোছের সভা হইতে যদি প্রত্যেক কৃষিশিল্প পত্রের ৪।৫ শত কাপি ক্রয় করেন, তাহা হইলেও অচিরাৎ এই শ্রেণীর পত্রিকাগুলি দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গ-সমাজের অশেষ কল্যাণকর হইতে পারে। আশা করি, মহাজনবন্ধুর গ্রাহকমাত্রেই "শিবপুর কলেজ পত্রিকার" গ্রাহক হইবেন। ইহা দ্বারা অন্ততঃ উক্ত কলেজের সঙ্গে আপনাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইবে। এদেশের মহাজনের সঙ্গে যেমন পরিচয় রাখার প্রয়োজন, সেইরূপ উক্ত কলেজের সঙ্গেও পরিচয় রাখা দরকার।

নিজের উন্নতি নিজেকেই করিতে হয়। গাঁজাখোর এবং মাতালের সঙ্গী যেমন ডাকিতে হয় না; একটী মাতাল যেমন সমুদয় দেশের মাতালের সংবাদ রাখে, অথবা এক বোতল মদ লইয়া বসিলে ক্রমে ক্রমে অনেক মাতাল তথায় আসিয়া জুটে; সেইরূপ যিনি যে স্বভাবের হইবেন, তাঁহার সঙ্গী জুটাইতে কষ্ট করিতে হয় না। এখন আপনি

কোন্ পথে যাইবেন, তাহাই জিজ্ঞাস্য। যদি শিল্প-কৃষির পথে আইসেন, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এইরূপ সঙ্গ অনেক পাইবেন।

পূর্ণিমা।—মাসিকপত্র। এই পত্রে চিন্তাযুক্ত প্রবন্ধের সহিত ছড়া এবং গল্পও থাকে। সম্পাদক আবার অন্যান্য সম্পাদককে উপদেশ দেন! পরের দোষ ধরিতে এই পত্র খুব মজবুৎ! তাঁহার বোধ হয় কোন দোষ নাই। সম্পাদক মহাশয়, আমাদের মহাজনবন্ধুতে প্রতি মাসে যে মহাজনদিগের জীবনী লেখা হয়, তাহাতে প্রথমে আপত্তি করেন। আমরা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করি নাই। এইজন্য তিনি মহাজনবন্ধুকে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় "আঁটকুড়োর পুত" বলিয়া গালি দিতেছেন। ইহাঁদের যত দাও, কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট হইবেন না, তাহাও স্পষ্ট বলিতেছেন। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।" দশে তোমার উচ্চ মন বুঝুন। ঐ মন লইয়া সুখে থাক! চেষ্টা করিলে সবই ভাল চলে! তবে কেন ধনী ও দীন সমাজে থাকে? শিল্প-পত্রিকা আঁটকুড়ো ঘরের, পুত্রের মত কেন হইবে? "বাঁশবনে ডোম কাণা।" এদেশে শিল্পপত্রিকা আঁটকুড়ো ঘরের পুত নহে; মড়াঞ্চে পোয়াতির ছেলে বটে। ইহা বুঝি পূর্ণিমা জানেন না? এখনও "কৃষক" এবং "শিবপুর কলেজ পত্রিকা" রহিয়াছেন যে? তবে মহাজনবন্ধু আঁটকুড়োর পুত হবে কি করিয়া? মাল যাচায়ের জন্য সমালোচন হবে বৈকি? সব বাঙ্গালির আদি পুরুষ হিন্দুস্থানী! চার্লস্ রীড হঠাৎ পশারের অর্থাৎ আধুনিকের কথা বলিয়াছেন জানি, বনিয়াদী সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন? "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি"।

আসব ও মদ।

শর্করা-দ্রবে অর্থাৎ চিনি ও গুড়ের সহিত জল দিয়া রাখিলে অথবা শর্করাযুক্ত উদ্ভিজ্জ বস্তুকে পচাইয়া উহার কার্ব্বনিক এসিড বায়ু নির্গত করিয়া ফেলিলে যে বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই আসব বলে।

জানিয়া রাখা উচিত যে, পৃথিবীর প্রায় সমুদয় উদ্ভিজ্জ এবং অধিকাংশ জান্তব পদার্থের ভিতর,—যথা দুগ্ধ ইত্যাদিতে শর্করা বা চিনি পাওয়া যায়; অতএব পৃথিবীর যে কোন উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থকে পচাইলেই আসব পাওয়া গিয়া থাকে।

এইবার সহজেই বোধ হইবে যে, জগতের মধ্যে নানাবিধ বস্তু পচাইয়া যখন আসব করা হয়, তখন আসব একপ্রকারের নহে; দ্রব্য অনুসারে আসবের নাম এবং দ্রব্য অনুসারে ইহার গুণ ও ধর্ম্মের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়,—যথা, দ্রাক্ষা হইতে প্রস্তুত "দ্রাক্ষাসব", গুড় হইতে প্রস্তুত "রম্ আসব", ইত্যাদি।

আসব যখন উদ্ভিজ্জ এবং জান্তব পদার্থের পচানী, তখন উহাতে একপ্রকার দ্রব্য থাকে না; কারণ উদ্ভিজ্জাদি পদার্থ এক প্রকার পদার্থের সমষ্টি নহে। অতএব আসবও একপ্রকার পদার্থের সমষ্টি নহে,—উদ্ভিজ্জের ভিতর যে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, আসবের ভিতরও প্রায় সেই সেই দ্রব্য পাওয়া গিয়া থাকে। সচরাচর আসবের ভিতর গঁদ, ক্রীম অব্ টার্টার, গ্যালিক এসিড, টার্টারিক এসিড, সার, বর্ণদ্রব্য, জল এবং সুরা ইত্যাদি।

বিবিধ বস্তুর সমষ্টি একটী উদ্ভিজ্জ বা উহার ফুল কিম্বা ফলকে পচাইলে, যখন উহাদের সংযোগ-আকর্ষণ শিথিল হইয়া উহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায় বা বিশ্লেষিত হয়, তখন ঐ বিশ্লেষিত বস্তুর ভিতর যে দ্রব্য অধিক পরিমাণে থাকে, আসব তাহারই ধর্ম্ম অগ্রে গ্রহণ করে। যেমন—একটী গোলাপ ফুলকে পচাইলাম; উক্ত গোলাপ ফুলের ভিতর মনে করুন, চিনি ১ রতি, তৈল ৫ রতি, ট্যানিন ২ রতি, জল ৩ রতি ও সুরা অর্দ্ধ রতি ছিল। এক্ষণে উক্ত গোলাপের আসব তৈলধর্ম্ম গ্রহণ করিবে; কারণ সে তৈলই অধিক পাইয়াছে।

আসব পচাইবার উপায় যে কেবল জল, তাহা নহে; বিবিধ বস্তু দিয়া দ্রব্যকে পচান যাইতে পারে। তন্মধ্যে অম্ল বা এসিড এবং জল সর্ব্বপ্রধান। অক্‌সিজেন বায়ু এ বিষয়ে বেশ সাহায্য করে। খেজুররস বা তালরসকে কিছুক্ষণ মুক্ত বায়ুতে রাখিলেই অক্সিজেন সহযোগে উহা আসবে পরিবর্ত্তিত হয়।

সকলে স্মরণে রাখিবেন যে, আসব অর্থে মদ নহে। এই আসবের ল্যাটিন নাম ভাইনাম্; ইংরাজী নাম ওয়াইন। আসব এবং সুরা বা মদে অনেক প্রভেদ। সুরার মাদকতা শক্তি আছে। আসবের তাহা নাই; যদিও থাকে, তাহা অল্প; সুরার ন্যায় তীক্ষ্ণ নহে। বিবিধ ফুলের আসব আমাদের বিলাসের দ্রব্য স্বরূপে ব্যবহৃত হয়; বিবিধ ফলের বা শস্যের আসব আমাদের ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খাইবার জন্য জান্তব আসব,—যথা দধি ইত্যাদি ব্যবস্থেয় হইয়াছে। তামাকও খাইবার আসব। বিষ্ঠাও আসব শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু উহা ত্যাজ্য পদার্থ।

এইবার সুরা কি, দেখিতে হইবে। আসবকে চোলাই করিলে সুরা হইয়া থাকে। সুরাকে ইংরাজীতে আর্ডেণ্ট স্পিরিট কহে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উদ্ভিজ্জে যে বস্তু অধিক থাকে, তাহার আসবে সেই বস্তুই অধিক পাওয়া যায়, এবং উক্ত আসবকে রিটর্ডে অর্থাৎ বকযন্ত্রে পূরিয়া চোলাই করিলে তাহাই বেশী পাওয়া যায়। এ কারণ ফুলের আসবকে চোলাই করিলে তৈল অধিক পাওয়া যায়, কারণ ফুলে তৈল অধিক আছে। অতএব ফুলের আসব চোলাইকে সুরা না বলিয়া "আতর" বলা হয়। যব, ধান্য প্রভৃতিতে তৈলের ভাগ কম, শর্করা, শ্বেতসার এবং সুরার ভাগ অধিক; এ কারণ উক্ত সকল দ্রব্যকে পচাইয়া আসব করিয়া তাহাকে চোলাইলে "সুরা" অধিক পাওয়া যায়। এ জন্য সুরা প্রস্তুতার্থে এই সকল দ্রব্যই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে—নিম্নলিখিত দ্রব্যে শতকরা নিম্নলিখিত পরিমাণে সুরা বা মদ পাওয়া যায়। যথা—

ইংরাজী নাম	ল্যাটিন নাম	শতকরা পরিমাণ
—	—	—
পোর্ট	ভাইনাম পোর্টু গ্যালিকাম্	১৪·৯৭
মেদেরা	ভাইনাম ম্যাডেরাইকাম্	১৪·৯
শেরি	ভাইনাম জেরিকান্	১৫·৩৭
ক্ল্যারেট	ভাইনাম রূবেলাম্	৭·৭২
বর্গণ্ডী	ভাইনাম বর্গণ্ডিকাম্	১·৪৫৭
স্যাম্পেন	ভাইনাম ক্যাম্পেনিকাম্	১২·৬১
ইত্যাদি	ইত্যাদি	ইত্যাদি

দ্রাক্ষাসব হইতে যে মদ হয়, তাহাকে ব্র্যাণ্ডি বলে। ইহার ল্যাটিন নাম ভাইনাম গ্যালিসাই। গুড় আসব হইতে যে মদ পাওয়া যায়, তাহাকে "রম" বলে; আমাদের দেশের তাড়িকে চোলাইলে "রম" হইতে পারে। ফলতঃ যখন এ দেশে খোলা ভাঁটি ছিল, তখন "রম" এ দেশে অনেক হইত, এখন তাহা বন্ধ হইয়াছে। জুনিপার ফল পচাইয়া আসব করিয়া চোলাইলে যে মদ পাওয়া যায়, তাহাকে "জিন" বলে। ঐরূপ যব হইতে যে মদ হয়, তাহাকে "হুইস্কি" কহে; ধান্য হইতে যে মদ পাওয়া যায়, তাহাকে ইংরাজীতে "আরক" এবং বাঙ্গালায় ধান্যেশ্বরী কহে।

উপরে যে সমুদয় মদের নাম উল্লিখিত হইল, উক্ত সমুদয় মদকেই ইংরাজীতে আর্ডেণ্ট স্পিরিট কহে। অতএব সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, আর্ডেণ্ট স্পিরিট এক হইলেও দ্রব্যানুসারে আর্ডেণ্ট স্পিরিট বা মদের নাম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র।

আর্ডেণ্ট স্পিরিট বা মদ বিশুদ্ধ নহে। যখন আসব চোলাই করা হয়, তখন আসবে যে যে পদার্থ থাকে, তাহাও এই সুরার সঙ্গে আসিয়া পড়ে; অতএব মদ বা সুরা অবিশুদ্ধ, ইহার ভিতরে অল্প তৈল, ট্যানিক এসিড, গঁদ ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের ভাগ অতি অল্প—না থাকার মধ্যে।

সুরার ভিতরেও অন্যান্য পদার্থ থাকে বলিয়া সুরাকে পুনরায় চোলাই করা হয়। সুরাকে চোলাই করিলে যে দ্রব্য হয়, তাহাকে বাঙ্গালায় "শোধিত সুরা" ইংরাজীতে "রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট" এবং ল্যাটিন ভাষায় "স্পিরিটাস্ রেক্‌টিফিকেটাস" বলা হইয়া থাকে। রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট—বিশুদ্ধ সুরা, ইহাতে আর্ডেণ্ট স্পিরিটের ন্যায় অপর দ্রব্য থাকে না,—কেবল জল থাকে; ১০০ ভাগ রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটে ৮৪ ভাগ বিশুদ্ধ সুরা বীর্য্য এবং ১৬ ভাগ জল থাকে।

এই রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটে বা শোধিত সুরাতে জল মিশাইলে তাহাকে প্রূফ স্পিরিট কহে। বাঙ্গালায় এই প্রূফ স্পিরিটের নাম দেওয়া হইয়াছে "পরীক্ষিত সুরা"—৫ ভাগ শোধিত সুরায় ৩ ভাগ জল দিলেই পরীক্ষিত সুরা হইয়া থাকে।

বলা হইল যে, রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটে ৮৪ ভাগ বিশুদ্ধ সুরা-বীর্য্য এবং ১৬ ভাগ জল আছে। এই ১৬ ভাগ জলকে নষ্ট করিতে পারিলেই, সমুদয় বিশুদ্ধ সুরা-বীর্য্য অবশিষ্ট থাকিবে, এই উদ্দেশ্যে উক্ত রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটের সহিত চূণ মিশ্রিত করিয়া উহাকে পুনরায় চোলাই করা হয়। এই চোলাইয়ের মুখে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাকে ইংরাজীতে "এলকোহল" কহে, বাঙ্গালায় ইহাকে সুরা-বীর্য্য বলিতে পারেন।

সুরার মাদকতা-শক্তি উগ্র অথবা ক্ষীণ করিবার অভিপ্রায় হইলে, আসব বা পচানী অবস্থায় উহার প্রতীকার করিতে হয়। দ্রাক্ষারস যখন আসব অবস্থায় থাকে, সেই সময় উহাতে কিছু ব্র্যাণ্ডি সংযোগ করিয়া পরে চোলাইলে, যে ব্র্যাণ্ডি হইবে, তাহাকে 'ষ্ট্রং ব্র্যাণ্ডি' কহে। পচনশীল অবস্থায় দ্রাক্ষারসে যে কোন মদ একত্র করিয়া চোলাইলে, উহার

তেজ বাড়ে, এ কারণ উহা ষ্ট্রং হয়। ষ্ট্রং এবং লাইট (এখানে লাইট অর্থে শীতল) এই দুই প্রকারের মদ হইয়া থাকে। ষ্ট্রং বা উগ্র মদ, যথা, মেদেরা, টেনেরিফ শেরি, পোর্ট ইত্যাদি। লাইট বা শীতল বা ক্ষীণতেজা মদ যথা, স্যাটরন্, ক্ল্যারেট বা রুবেলাম (ইহাকেই রবার্টসন পোর্ট বলে) স্যাম্পেন, মোজেল, বর্গাণ্ডী ইত্যাদি। এই সকল শীতল বা লাইট মদে আসবাবস্থায় অন্য মদ মিশ্রিত করা হয় না,—যেমন ষ্ট্রং মদে অপর মদ মিশ্রিত করিতে হয়।

মদের বর্ণ দুই প্রকার, শ্বেত এবং লোহিত। এরূপ হইবার কারণ অতি সামান্য। পাতা লতা শুদ্ধ ফলকে পচাইয়া আসব করিয়া চোলাইলে যে মদ হয়, তাহার বর্ণ লোহিত হয়, এবং এই মদে ট্যানিন বা ট্যানিক এসিড কিছু বেশী থাকে। পাতা ও বল্কল ব্যতীত পচানী দ্বারা যে মদ হয়, তাহার বর্ণ শুভ্র হইয়া থাকে। আমাদের দেশের ধান্যেশ্বরীর বর্ণ শুভ্র। যদি ধান্যের সহিত বিচালী প্রভৃতি একত্র করিয়া পচাইয়া, চোলাইয়া মদ করা হয়, তাহা হইলে ধান্যেশ্বরীর বর্ণ লোহিত হইতে পারে।

বাঙ্গালার আবকারী।

১৯০০—১৯০১ সালের বাঙ্গালার আবকারী বিভাগের কার্য্য-বিবরণী বিষয়ক রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায়, উক্ত বৎসর আবকারী হইতে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের রাজস্ব প্রায় ৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মদ, গাঁজা, আফিমে আয় বাড়িয়াছে। তাড়িতে আয় কমিয়াছে। প্রাপ্য টাকায় শতকরা ৯৯·৬ আদায় হইয়াছে।

এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও এবং কোন কোন জেলায় ডিউটী কমাইয়া দিলেও বে-আইনী মদ তৈয়ার ও বিক্রয় করা অপরাধে অনেকেই অভিযুক্ত হইয়া দণ্ড পাইয়াছে;—বর্দ্ধমান বিভাগে ১৪২, প্রেসিডেন্সি বিভাগে ৬৩ জন। আবকারী-কমিসনর মিঃ গুপ্ত মদের বে-আইনী আমদানী রপ্তানী নিবারণ জন্য "খাসিয়া" নামে সস্তাদরে কমতেজী এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত করাইয়া চম্পারণে উহার পরীক্ষা দেখিয়াছিলেন। উহাতে ফল ফলিয়াছে। উহার প্রচলনে মদের বে-আইনী আমদানী রপ্তানী কমিয়াছে। আবকারী কমিসনার বাহাদুর অন্যত্রও উহার প্রচলন করিবার উদ্যোগে আছেন।

সাঁওতাল পরগণায় ৯০খানা মদের দোকান ছিল। অত বড় একটা জেলার পক্ষে ঐ সংখ্যা কম বলিয়া বোর্ড তথায় আর কয়খানি দোকান খোলা মঞ্জুর করিয়াছেন। গাঁজার চাষের—সদর নওগাঁয়। তথায় যত গাঁজা জন্মে, নওগাঁর সরকারী গুদামে সমস্ত জমা হয়; কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ একবারে সব জমা হইতে পারে না, বে-সরকারী স্থানে রাখিতে হয়। এই কারণে নওগাঁয় ঘর বাড়াইবার প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর মঞ্জুর করিয়াছেন। কারণ, সমস্ত উৎপন্ন-দ্রব্য একস্থানে না থাকিলে সকল দিকে সুব্যবস্থা হয় না। ২ হাজার ২৩৮ বিঘা ভূমিতে গাঁজার চাষ হইবে, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ নিয়ম করেন; কিন্তু এই নিয়ম কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই ৫ হাজার বিঘারও অধিক ভূমিতে গাঁজার চাষ হইয়াও ফসল ভাল না হওয়ায়, তেমন আয় হয় নাই। ভূমির পরিমাণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থায় রেভিনিউ বোর্ড আপত্তি করিয়াছেন। বিষয়টী গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের বিবেচনাধীনে আছে।

চিনির উপকারিতা।

(লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগ্‌চী।)

আমরা চিকিৎসক; কিসে কি ফল পাইব, তাহাই বিবেচনা করা প্রধান কর্ত্তব্য। চিনি চিকিৎসক-কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। যে সকল রোগীর পোষণ-কার্য্যে বিঘ্ন হইতেছে, শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইতেছে, সেই স্থলে শর্করা ব্যবস্থা করিয়া উপকার পাইতে পারি। ক্ষয়রোগ এবং অসম্পূর্ণ পরিপোষণ স্থলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে স্থলে ক্ষয়-কাশের উৎপত্তির আশঙ্কা থাকে, শরীর দুর্ব্বল হইতে থাকে, সে স্থলে শর্করা উপকারী। যে সকল বালক কৃশ, যাহাদের শরীর দুর্ব্বল, দৈহিক-পরিবর্দ্ধন ভালরূপ হইতেছে না, সে স্থলেও শর্করা উপকারী; অথচ এই সকল স্থলেই বর্ত্তমানে দেশের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে পীড়া হওয়ার আশঙ্কায় আমরা তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকি। অপিচ বালকদিগের দৈহিক পরিবর্দ্ধন, উত্তাপ সংরক্ষণ এবং পেশীর পরিপুষ্টি সাধনের পক্ষে মিষ্ট খাদ্য একটী প্রধান সহায়। রক্তাল্পতাগ্রস্ত রোগীর পক্ষে চিনি বিশেষ উপকারী। বালকদিগের পক্ষেও শর্করা

উপকারী খাদ্য। বৃদ্ধদিগের হাত পা শীতল থাকে, শরীর-তাপ হ্রাস হয়, সেই অবস্থায় চিনি ব্যবস্থা করিলে, শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, অথচ অন্য খাদ্য দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে মূত্রযন্ত্রকে যে পরিমাণ পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইতে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। কারণ, চিনির সমস্ত অংশই পরিপাক হইয়া যায়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দীর্ঘকাল পীড়া ভোগ করার পর আরোগ্য হইলেও রোগী দীর্ঘকাল দুর্ব্বল থাকে। সেই দুর্ব্বলাবস্থায় শর্করা-ব্যবস্থা করিলে রোগী শীঘ্রই সবল হয়। দুর্ব্বল রোগীর সবলকারক পথ্যের মধ্যে এক্সট্রাক্ট মাণ্টের প্রতি আমাদিগের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। এক্সট্রাক্ট মাণ্টও এক প্রকার শর্করা। Disaceparides Maltos ব্যতীত অপর কিছুই নাই বলিলেও চলে। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, Disaceparides ইক্ষু শর্করা পরিপাক প্রক্রিয়ায় Dextrose এবং Levnlose এ পরিণত হইয়া থাকে। মাণ্ট Disaceparides কেবল Dextrose এ পরিণত হয়। কার্য্য এক হয়। কেবল প্রক্রিয়া বিশেষ মাত্র। উৎকৃষ্ট মাণ্ট এক্সট্রাক্ট মধ্যে যথেষ্ট উৎসেচন ক্রিয়া-জাত পদার্থ যে বিশেষ উপকারী, তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই পদার্থ অন্য কার্ব্বহাইটেট পদার্থের পরিপাকের সাহায্য করে। ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। অপর পক্ষে শর্করা সহজে পরিপাক হয়, সুস্বাদু এবং ইহার মূল্য সুলভ। মূল্যের এই সুলভতার জন্য আমরা শর্করা ব্যবস্থা করিলে সাধারণ লোকের মধ্যে আপত্তির কোন কারণ হয় না। তবে বড় লোকের মধ্যে এক্সট্রাক্ট মাণ্ট ব্যবস্থা করার কোন আপত্তি নাই। কারণ, এই শ্রেণীরই রোগীর মধ্যে ঔষধের অধিক আপত্তি এবং আলোচনা উপস্থিত হইয়া থাকে। অধিক মিষ্ট খাইলে অনিষ্ট হইতে পারে, এই আপত্তি উপস্থিত হইলে এবং শর্করা ব্যবস্থা করার আবশ্যকতা উপস্থিত হইলে, মাণ্ট এক্সট্রাক্ট ব্যবস্থা করিয়া আমরা মনে করিতে পারি যে, প্রকারান্তরে শর্করাই ব্যবস্থা করিলাম।

ডাক্তার গার্ডনার মহাশয় কয়েকটী রোগীকে শর্করা দ্বারা চিকিৎসিত করিয়া উপকার লাভ করতঃ তদ্বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। নিম্নে উহার একটী বিবরণ প্রকটিত হইল।

এক জনের বয়স ২৫ বৎসর। পূর্ব্বে দৈহিক গুরুত্ব প্রায় দুই মণ ছিল। ৩।৪ বৎসর হইতে ক্রমে দৈহিক-গুরুত্ব হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। গত বৎসর বসন্ত কালের প্রথমে দৈহিক-গুরুত্ব দেড় মণের কিছু কম হইয়াছিল। ইহার পরে ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হয়। বিগত এপ্রেল মাসে যখন উক্ত ডাক্তার মহাশয় ইহাকে দেখেন, তখন এত দুর্ব্বল এবং কৃশ হইয়াছিল যে, দেখিলে ক্ষয়-কাশের রোগী বলিয়া বোধ হইত। এই সময়ে জ্বর না থাকা সময়েও চিকিৎসক ইহাকে শয্যায় শায়িত থাকিতে উপদেশ দিয়া, এই ব্যবস্থা দেন যে, যে পরিমাণ চিনি খাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব, তাহা যেন খায়। এই আদেশ-অনুসারে রোগী প্রথম প্রথম আধ পোয়া ইক্ষু-শর্করা খাইত। এতদ্ব্যতীত অন্য খাদ্য সহিত কিছু পরিমাণ মিষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করিত। এইরূপে মিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার ফলে তাহার দৈহিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। সপ্তাহে প্রায় চারি সের পরিমাণ দৈহিক গুরুত্ব বৃদ্ধি হইতে থাকে। বিগত জুন মাসে তাহাকে সমুদ্র-তীরে বাস করার জন্য পাঠান হয়। এই সময়ে তাঁহার দৈহিক গুরুত্ব প্রায় দুই মণ হইয়াছিল, কিন্তু পেশী কোমল এবং দুর্ব্বল অবস্থাতেই ছিল। তৎপরে রোগীর দৈহিক গুরুত্ব আরও তিন সের অধিক এবং সে সবল ও কার্য্যক্ষম হইয়াছে।

উল্লিখিত চিকিৎসা বিবরণ আলোচনা করিলে চিনি যে বিশেষ উপকারী খাদ্যরূপে রোগীর জন্য ব্যবস্থেয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। তবে চিনি ব্যবস্থা করিতে এত আপত্তি উপস্থিত হয় কেন?

আপত্তি দুই প্রকার,—প্রথম প্রকৃত, দ্বিতীয় কল্পনা। চিনি দন্তের অনিষ্টকারক, এই কথার কোনও মূল্য নাই। কারণ আমরা এমত দেখিতে পাই যে, যাহারা বিস্তর চিনি খায়, তাহাদেরও অক্ষুণ্ণ দন্ত দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়। এই প্রবাদের মূলে বোধ হয়—জর্ম্মণ পরিব্রাজক Hentzackএর ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দের উক্তি—রাণী এলিজাবেথের বর্ণনায়—"ইহার নাসিকা বক্র, ওষ্ঠাধর পাতলা, এবং দন্ত কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট। ইংরাজ জাতি অতি-রিক্ত শর্করা ভক্ষণ করে, এজন্য তাহাদের এইরূপ অবস্থা হয়।" ইত্যাদি হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। আমেরিকার নিগ্রো জাতি অধিক শর্করা সেবন করে, অথচ তাহাদিগের দন্ত জগতের অপর সকল জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। চিনির সহিত অপর পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে যে দন্তের অনিষ্ট না হইতে পারে, তাহা নহে; তবে তাহা চিনির দোষ নহে, দোষ সেই অপরিষ্কৃতার।

চা।

পঞ্চম অধ্যায়—রোল করা।

একটা পানপত্রকে যদি ছাঁচা যায়, তাহা হইলে উহার রস বাহির হইয়া পাতাটি ন্যাকড়ার মত হইয়া যায়,—এইরূপ কার্য্য চা-পত্র-চয়নের পর করা হয়, ইহাকে “চা-রোলকরা” কহে।

চা-রোল করিবার জন্য তক্তার মাচা হইলে ভাল হয়। তাঁহার উপর শীতল পাটী বিছাইলে ভাল হয়; কারণ দরমা চাটাইয়ের উপর রাখিয়া পাতা রোল করিতে বা পাতা ছাঁচিতে গেলে পাতার রস উহাতে অনেক নষ্ট হয়। পাতা ছাঁচিবার সময় যে রস বাহির হয়, তাহা ঐ পত্রে পুনরায় মাথাইয়া শুখাইয়া লইলেই চার তেজ সমান থাকে। দর্মা চাটাইয়ের দ্বারা এ উদ্দেশ্য অল্প ভাবে সাধিত হয়। এক অসুবিধা, দরমা প্রভৃতির ভিতর চা-পত্রের রস লাগিয়া থাকিলে, উহা অম্লধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; পুনরায় এই রসের উপর চা-রোল করিলে উক্ত চা অম্লধর্ম্ম-প্রাপ্ত হইয়া নিজ-গুণ-ভ্রষ্ট হইয়া যায়। যাহা হউক, শীতলপাটী বা দর্মা চাটায় এক দফা রোল হইয়া গেলে, উহা বেশ করিয়া ধৌত করা উচিত।

পাতা রোল করিয়া কেহ কেহ মুঠি (মুষ্টি) বাঁধিয়া থাকেন। মুঠি বাঁধা অর্থাৎ সলিতার মত পাতাকে গুটাইয়া দেওয়া। অনেকে আবার মুঠি না বাঁধিয়া অমনি রাখিয়া দেয়। আমি দেখিয়াছি, মুঠি বাঁধিলে রোল করিবার সময় পাতায় যে পাক হয়, তাহা থাকিয়া যায়। কাজেই মুঠি না বাঁধিলে উক্ত পাক খুলিয়া যায়। কলে পাতা রোলকরা বা ছাঁচা কিম্বা মাড়া হইলে তাহা আর মুঠি-বাঁধা হয় না। কারণ কলে খুব জোরে পাতা রোল করা হয়, তাই ইহার পাক খুলিয়া যায় না।

যাহা এক সময়ে রোল করা হয়, তাহা এক স্থানে সংগ্রহ করিয়া ভিজা কাপড়ে ঢাকিতে হয়। নতুবা সমান রং হয় না। যদি ১৫।২০ ব্যক্তি এক সঙ্গে রোল করিতে থাকে, তবে যেই মুঠি বান্ধা হইল, অমনি তাহা সরাইতে হয়। মুঠি সরাইবার সময় একটু বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। কেহ কেহ উত্তমরূপ রোল না করিয়াই মুঠি বাঁধিয়া রাখে। অতএব এই সকল মুঠি ভাঙ্গিয়া যায় ও পুনরায় উপযুক্ত রূপ রোল করাইতে হয়। এখন সাবধান না হইলে, যথেষ্ট ও অযথেষ্ট রোল করা পাতা মিশ্রিত হইলে পাতার রং এক সময়ে একরূপ হইবে না। আর কম রোল করা পাতা দেখিতে অতি কদর্য্য হইবে, এবং তদুৎপন্ন চার গুণও অনেক কম হইবে। পাতা যত বেশী রোল করা হয়, ততই ভাল। রোল করিবার সময় রস নির্গত হইলে, তাহা পাতায় মাথাইয়া দেওয়া উচিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—পাতার রং।

রোল করা পাতা ভিজা কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিলে অল্পে অল্পে নূতন পয়সার মত উহার বর্ণ হয়। এই বর্ণের উজ্জ্বলতানুসারে চা-র উৎকৃষ্টতা নির্ণয় হয়। পাতা ছিঁড়া, পাতা শুখান, রোলকরা ইহার কোন বিষয়ে কিছু তারতম্য ঘটিলে, পাতার বর্ণ উজ্জ্বল হয় না। সুতরাং আদি অন্ত সকল কার্য্য সুসম্পন্ন না হইলে ভাল চা প্রস্তুত করা যায় না।

পাতা ছিঁড়িতে অনেক গুলি কচি, আর অনেক গুলি অপেক্ষাকৃত শক্ত দেখিয়া ছিঁড়া হয়। যে গুলি অপেক্ষাকৃত শক্ত, তাহার রং হইতে কিছু বিলম্ব হয়। কচি পাতার রং সত্বর হয়। অর্দ্ধকচি পাতার রং কিছু পরে হয়। যদি অর্দ্ধকচি পাতা পূর্ণমাত্রায় রঙের জন্য অপেক্ষা করা যায়, তবে কচি পাতার রং অধিক হইয়া টক হইতে থাকে। কচি পাতাতেই পিকু, ভাঙ্গা পিকু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতীয় চা হয়। অতএব কচিপাতা টক হইলে চলিবে না। কচিপাতার যথেষ্ট রং হইলে অর্দ্ধকচি পাতার জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাহা শুষ্ক করা উচিত। অর্দ্ধেকটা লাল এবং অর্দ্ধেকটা সবুজ রহিয়াছে, তখনই পাতার রং হইয়াছে বলিয়া মনে করা উচিত। পাতার রং হইয়াছে কি না, তাহা আরও দুইটী উপায়ে স্থির করা যায়। যথেষ্ট রং হইলে পাতা হইতে এক তেজস্কর গন্ধ বাহির হয়। দ্বিতীয়তঃ পাতা হস্তে করিলে কিছু মলায়েম লাগে।

পাতার রং হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা শুকান উচিত। নচেৎ উহা টক হইয়া যায়। পাতা টক হইয়া গেলে তাহার গন্ধ এবং তেজ থাকে না। অনেক সময়ে রং হওয়া পাতা অর্দ্ধেক শুকাইয়া পরদিন পূর্ণমাত্রায় শুষ্ক করা হয়।

যে মাচায় রোল-করা পাতা রাখা হয়, তাহা যেন বেশ পরিষ্কার থাকে। কারণ মাচায় টক রস লাগে। রং হওয়া পাতা মাচা হইতে

স্থানান্তরিত হইলেই তাহা ভাল করিয়া ধোওয়া,—অন্ততঃ ভিজা কাপড়ে মোছা আবশ্যক। নচেৎ নূতন রং করা পাতার সঙ্গে মিশ্রিত হইলে, তাহার অনিষ্ট করিবে।

স্বর্গীয় হরিশচন্দ্র দত্ত।

(২)

১২৮৬ সালে হরিশবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়বাবু ইঁহার সহিত এবং তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত পৃথক হইবার জন্য কোর্ট হইতে নোটিশ দেন। নোটিশ হস্তগত হইবামাত্র হরিশবাবু একবারে অতলস্পর্শ দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কারণ বিজয়চন্দ্র পাঁচ সহোদরের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ। এই হেতু তাঁহার উপর ইঁহার বিশেষ স্নেহ মমতা ছিল। এই সময় তিনি আত্মীয় স্বজনের নিকট কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, "যাহাতে ভ্রাতা বিজয়চন্দ্র আমার সহিত পৃথক না হয়, আপনারা এইরূপ করিয়া দিন।" ধন্য হরিশবাবু! ধন্য আপনার ভ্রাতৃস্নেহ!! সক্ষম ভাই, অক্ষম ভাইকে আজ কাল স্বভাবে স্বতন্ত্র করিয়া দেয়! স্বর্ণলতা উপন্যাস প্রভৃতিতে এবং কার্য্যক্ষেত্রে সংসারেও এই বিষম দৃশ্য সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়! কিন্তু এ কি! অক্ষম অর্থাৎ টাকা উপায় করিতে জানে না, এমন ব্যক্তি একজন কর্ম্মবীর ও টাকার জন্মদাতার আশ্রয় ত্যাগ করিতে উদ্যত! অথচ কর্ম্মঠ ব্যক্তি সেই অক্ষমকে ছাড়িতে নারাজ, সে ভুল বুঝিয়াছে বলিয়া নিজেই কাঁদিয়া আকুল! হরিশবাবুর জীবনী স্বার্থপরতা-বর্জ্জিত। ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। তাঁহার ভিতর একটু স্বার্থভাব থাকিলে, তিনি কোটী মুদ্রা পুত্রকে দিয়া যাইতে পারিতেন, এবং তিনি অনায়াসেই "রাজা" হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে ছাঁচে গঠিত জীব নহেন,—তিনি দেবতা ছিলেন, তাঁহার মন সর্ব্বদা দেবভাবে বিভোর থাকিত। বাটীর চাকর যেরূপ অংশে খাদ্য পাইবে, তাঁহার পুত্রও সেইরূপ পাইবে, ইহাই তাঁহার ব্যবস্থা ছিল। সুবিস্তৃত গ্রাম খানিই তাঁহার যেন সুবৃহৎ পরিবারিক অট্টালিকা স্বরূপ ছিল। "তিনি" ও " আমি " এই দুয়ের প্রভেদ তিনি বুঝিতেন। তাই বিজয়বাবু পৃথক হইবেন শুনিয়া কাঁদিয়াছিলেন; কিন্তু বিজয়চন্দ্র কাহারও কথা না শুনিয়া পৃথক হইলেন। পৃথক হইবার পর হইতেও হরিশবাবুর অবস্থা উত্তরোত্তর আরও উন্নত হইতে লাগিল। তথাপি হরিশবাবু মধ্যে মধ্যে বিজয়কে একান্নবর্ত্তী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিজয়চন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হন নাই।

এক্ষণে যে স্থানে বালি পেপারমিল আছে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে হাউয়ার্থ কোম্পানীর চিনির কল ছিল। ঐ কলে হালিসহর নিবাসী বাবু গিরীশচন্দ্র বসু মুৎসুদ্দি ছিলেন। উপরোক্ত বাবু মহাশয় হরিশবাবুর নিকট চিনি লইতেন। চিনি লওয়ার হিসাবে উক্ত মুৎসুদ্দির নিকট অনেক টাকা পাওনা হয়। কলিকাতায় সিমলার নিকট তাঁহাদের এক সুবৃহৎ সোরা রিফাইন করিবার কারখানা ছিল। মুৎসুদ্দি বাবুরা ঐ চিনির টাকা পরিশোধ করিতে না পারায়, ষাট হাজার টাকায় ঐ কারখানা বাটী—হরিশবাবুর নিকটে প্রথমে বন্দক দিয়া পরিশেষে ঐ কলবাটী ফোরক্লোজ করিয়া লয়েন। হরিশবাবু এই কারণে সোরার-কার্য্য করেন, এবং অনেক দিন ইহা সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইয়াছিলেন। রাণী রাসমণির জামাতার সহিত মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পরেই ইঁহার যখন দৈন্য অবস্থা হয়, সেই সময় এই কারবার বন্ধ হয়।

সন ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে ইনি কলিকাতার উল্টাডিঙ্গিতে এক আড়ত খুলেন। এই আড়তে চাউল, পাট, তিসি, গম ইত্যাদি খরিদ বিক্রয় করিতেন এবং ঐ সকল দ্রব্যের ব্যাপারিয়ান কার্য্যও ছিল। অদ্যাপি এই আড়ত জীবিত থাকিয়া হরিশচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এবং বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছে। সন ১২৮৭ সাল হইতে ইনি পাটের গাঁইটের কার্য্য আরম্ভ করেন, ইহাও অদ্যাপি চলিতেছে।

১২৯১ সালে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র-গণের হস্তে সমুদয় কার্য্য কর্ম্ম এবং দুই নাবালগ পুত্রের ভার অর্পণ করিয়া এই কর্ম্মবীর মহাপুরুষ চিরশান্তি নিকেতনে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন।

মৃত্যুকালে আপনার স্ত্রী পুত্রকে কিছুই না দিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে সমুদয় বিষয় দিয়াছিলেন। এই কলিকালে হরিশবাবুর মত কয়জন লোককে আপনারা দেখিয়াছেন? এ বিষয়ে ইনি কি আদর্শ পুরুষ নহেন? জীবনীর এই অংশের বর্ণ নেত্রের কেমন স্নিগ্ধকর বলুন দেখি? এই বর্ণে মন রঞ্জিত হইলে প্রাণে কি অপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হয় না?

সহজ শিল্প।

অদৃশ্য কালি। সমান ভাগ তুঁতে ও নিসাদল জলে গুলিয়া তদ্দ্বারা কাগজে লিখিলে অক্ষরগুলি বর্ণহীন হইবে, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে দিলে, তাহা হরিদ্রাবর্ণের হয়।

হীরাকস গুলিয়া তদ্দ্বারা কাগজে লিখিলে লেখা বর্ণহীন হইবে, কিন্তু তাহার উপর প্রুসিয়েট অব পটাশের জল মাখাইলে লেখাগুলি উজ্জ্বল নীলবর্ণ হয়।

ফটকিরি জলে গুলিয়া লিখিলে প্রথমে লেখা দেখা যায় না, অগ্নি-তাপে ধরিলে কাল বর্ণের লেখা বাহির হয়।

লেবুর রসে লিখিলে লেখা দেখা যায় না, কিন্তু জলে ডুবাইলে জলের লেখা বাহির হয়।

দুগ্ধ দিয়া লিখিলে তাহা শুষ্ক হইলে লেখা দেখা যাইবে না। অগ্নির উত্তাপ দিলে অক্ষর গুলি ফুটিয়া উঠিবে।

ফটকিরির সাজি। প্রথমতঃ সরু তার কিম্বা বেত দিয়া সুন্দর করিয়া একটি ছোট সাজি প্রস্তুত করিবে। পরে আবশ্যক মত জলে যথেষ্ট পরিমাণে ফটকিরি দ্রব করিয়া তাহা গরম করিতে হইবে। অনেকটা জল মরিয়া গেলে পর, অগ্নির উপর হইতে নামাইয়া এই ফটকিরির জলে সাজিটি ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সাজিটির উপর ফটকিরির সুন্দর সুন্দর দানা বাঁধিয়াছে। তখন জল হইতে সাজিটি আস্তে আস্তে উঠাইয়া লইলেই হইল। ফটকিরির জল গরম থাকিতে থাকিতে তাহার সহিত কোন প্রকার মেজেণ্টার রং মিশাইয়া দিলে সাজিটি অতি সুন্দর দেখিতে হইবে।

পিত্তল নির্ম্মিত দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিবার উপায় এই যে, প্রথমতঃ জিনিষ গুলিকে অগ্নির উত্তাপে অল্প গরম করিয়া ভিজা ন্যাকড়ায় নিসাদল চূর্ণ লাগাইয়া, তদ্দ্বারা উত্তমরূপে মাজিলে উজ্জ্বল হইবে।

শিরীস কাগজ। ইহা বিদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া এ দেশে আসিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে। যদি কেহ ইহার ব্যবসা চালান, সম্ভবতঃ ইহার বেশ কাট্‌তি হইবে। সাধারণ প্রস্তুত-প্রণালী আমরা নিম্নে লিখিলাম।

শিরীস আঠা (বেনের দোকানে প্রাপ্তব্য) কতকগুলি একত্র শীতল জলে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ। কোমল হইলে, গরম জলের তাপে কোন পাত্রে গলাইয়া লও। মধুর মত ঘন হইলে, উষ্ণ থাকিতে থাকিতে একখানি মোটা কাগজে মাখাইয়া, তাহার উপর মিহি কাচচূর্ণ ছড়াইয়া শুখাইয়া লইলেই উৎকৃষ্ট শিরীস কাগজ প্রস্তুত হইবে।

কাচচূর্ণের সাধারণ নিয়ম। ভাঙ্গা কাচের জিনিস লোহার খলে উত্তম রূপে চূর্ণ করিবে। চূর্ণ করিবার সময় খলের উপর একটী কাপড় ঢাকিয়া লইবে; এইরূপ না হইলে ঐ ভগ্ন কাচ, আঘাতে বাহির হইয়া, চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে এবং তাহাতে হস্ত প্রভৃতিতে আঘাত লাগিতে পারে। কাচ চূর্ণ হইলে চালুনি কি মিহি কাপড় কিম্বা তাদৃশ সচ্ছিদ্র বস্তুর মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মোটা কাগজের জন্য মোটা দানা ও সরু কাগজের জন্য সরু দানা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শিরীস কাগজ শুষ্কস্থানে রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য—নচেৎ শীঘ্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

ছিট প্রস্তুত করিবার সহজ প্রণালী। এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত বিলাতে বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। কল ছাড়া যাহাতে এদেশে স্বল্পমূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে, সেই জন্য যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে লিখিয়া দিলাম। পরীক্ষা দ্বারা যদি জানিতে পারা যায় যে, নিম্নলিখিত প্রকারে উত্তম ছিট প্রস্তুত হয়—তাহা হইলে বাঙ্গালীর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা নয় কি? মহাজনবন্ধুর গ্রাহক বা পাঠকের মধ্যে অবশ্য কেহ পরীক্ষা করিতে ভুলিবেন না।

ছাপে অথবা তুলিতে করিয়া প্রথমে কাপড়ের উপর চিত্রাকারে "এসিটাইট অব য়্যালুমাইন্" ময়দা বা পালো কিম্বা গঁদ দিয়া ঘন আঠার মত লেপন কর। পরে কাপড়ের অবশিষ্ট কতক স্থানে উক্তরূপে "এসিটাইট অব আয়রণ" ও কতক স্থানে এসিটাইট অব য়্যালুমাইন্ এবং অন্য স্থানে এসিটাইট অব য়্যালুমাইন্-মিশ্র এসিটাইট অব আয়রণ দিয়া চিত্রিত করিবে। চিত্রগুলি শুখাইলে, কাপড়খানি কাল ওকের ছালের ক্বাথে রঙ করিবে। যে যে স্থানে এসিটাইট অব য়্যালুমাইন্ মাখান হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে পীতবর্ণ, যে যে স্থানে এসিটাইট অব আয়রণ লেপন করা হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে পাঁশুটে রঙ, ও যে যে স্থানে ঐ দুই দ্রব্য মিশাইয়া

চিত্র করা হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে এক প্রকার পাঁশুটে সবুজ বর্ণ হইয়াছে।

ওকের ছালের পরিবর্ত্তে ম্যাডার (ম্যাডার হইতে টর্কী রেড প্রস্তুত হয়) দিয়া ঐ কাপড় রঙ করিলে উক্ত তিন প্রকার দ্রব্যে অঙ্কিত তিন প্রকার চিত্রিত স্থান যথাক্রমে লাল, পিঙ্গল ও বেগুণিয়া বর্ণ হয়।

রেশমী কাপড় রক্তবর্ণ করিতে হইলে, রেশমী কাপড় প্রথমতঃ ফট্‌কিরির জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরে ক্রমিদানার জলে রঙ করিতে হয়।

শ্রীচুনিলাল রায়।

জাপানী ভাষা।

(দেশের নৈসর্গিক ব্যাপার সম্বন্ধীয়)

উপসাগর—ইরি উমি।
উপকূল—হামা, উমিবাটা।
সাঁকো—হাসি, বাসি।
অন্তরীপ—মিসাকি।
রাজধানী—মিয়াকো।
জলপ্রপাত—টাকি।
গুহা—হোরা আনা।
নগর—মাচি, টোকাই।
পূর্ব্ব—হিগাসী।
জঙ্গল, বন—হায়াসী, মোরি।
ছোটপাহাড়—কোয়ামা।
বন্দর—মিনাটো।
দ্বীপ—সীমা, জীমা।
হ্রদ—কোস্থই, ইকে।
পর্ব্বত—থামা।
উত্তর—কিটা।
উপদ্বীপ—এডা সীমা।
নদী—কাওয়া, গাওয়া।
সমুদ্র—উমি।
দক্ষিণ—মিনামি।
বসন্তকাল—ইজুমি, ওয়াকি।
রাস্তা—মাচি, টোরি।
স্রোত—সীয়ো।
সহর—মাচি।
উপত্যকা—টানি।
গ্রাম—মুরা।
পশ্চিম—নিসি।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
২য় খণ্ড ; ৬ষ্ঠ সংখ্যা। শ্রাবণ, ১৩০৯ সাল।

শর্করা-বিজ্ঞান।

(লেখক শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়,—M. A,. M. R. A. C, and F. H. A. S.)

একাদশ অধ্যায়, ৩য় প্রবন্ধ।

চুণের জল ছিটাইবার সময়ও মধ্যে মধ্যে তাপমান যন্ত্রের ব্যবহার আবশ্যক। সমস্ত চুণের জল ১৩০° হইতে ১৬০° ডিগ্রি উত্তাপের মধ্যে মিশান আবশ্যক। বোতলে যতটুকু চুণের জল লওয়া হইয়াছে, সমস্তই যে মিশাইতে হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। লিট্‌মস্ পেপার ব্যবহার দ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত প্রথায় দেখিতে হইবে, যথেষ্ট চুণ ব্যবহার হইয়াছে কি না ? যথেষ্ট চুণ ব্যবহার যদি হইয়া থাকে, অর্থাৎ অম্ল ঠিক্ কাটিয়া গেলেই চুলার জ্বাল বাড়াইয়া দিয়া ২০০° ডিগ্রি (ফারেনহিট্) উত্তাপ পর্য্যন্ত নাদের রসের উত্তাপ বাড়ান আবশ্যক। ২০০° ডিগ্রি উত্তাপে আসিবা মাত্র রসের উপরের গাদ আপনা হইতেই কাটিয়া যাইবে, এবং অভ্যন্তরস্থ রস অতি নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে দেখা যাইবে। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই রস চুলা হইতে নামাইয়া একটী উচ্চ স্থানে বসাইয়া রাখিতে হইবে এবং রসের উপরি-স্থিত গাদ ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। দুই ঘণ্টা পরে সাইফন্ দ্বারা নির্ম্মল রসটী অন্য পাত্রে পৃথক করিয়া সর্ব্ব নিম্নস্থ গাদ্ সংযুক্ত রস ফ্ল্যানেল খণ্ড সাহায্যে ছাঁকিয়া লইয়া, হাঁড়িতে বা এলুমিনিয়মের ডেক্‌চিতে করিয়া ঐ পরিষ্কার রস হইতে গুড় প্রস্তুত করিতে হইবে। এই স্ফটিক্ রস হইতে অতি পরিষ্কার ও সারপূর্ণ গুড় প্রস্তুত হইবে। গুড় প্রস্তুত সাধারণ নিয়মেই করিতে হইবে, অর্থাৎ রস ফাঁপিয়া উঠিলে ঝাঁজরি দ্বারা মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দেওয়া, ছোট ফুট ধরিলে, গুড়ের গন্ধ বাহির হইলে এবং ঝাঁজ্‌রি সংলগ্ন এক ফোঁটা গুড় অঙ্গুলিতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যখন দেখা যাইবে, অঙ্গুলি-দ্বয়ের মধ্যে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ গুড়ের তার বাঁধিতেছে এবং অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে গুড়ের ফোঁটাটী চাপিয়া চাপিয়া ধরিতে ধরিতে উহা শুকাইয়া গিয়া মচ্ মচ্ শব্দ উহা হইতে বাহির হইতেছে এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে শ্বেতবর্ণ ধূলির আকারে (অর্থাৎ চিনিতে) পরিণত হইতেছে, তখনই জানিতে

হইবে, গুড় প্রস্তুত শেষ হইয়াছে। তখন কটাহ, হাঁড়ি বা ডেকৃচি গুলি হইতে গুড় একটা গাম্‌লায় ফেলিয়া, কাষ্ঠ খণ্ডদ্বারা দশ মিনিট ধরিয়া নাড়িয়া, পরে উকৃড়িতে করিয়া কলসীর মধ্যে উঠাইয়া রাখিতে হইবে। গুড় জ্বাল দিবার সময় গাদ কাটিয়া ফেলিবার জন্য যে ঝাঁজরি ব্যবহার করা হয়, উহাও এলুমিনিয়মের হওয়া ভাল।

এক সপ্তাহ বা দশদিন গুড় কলসীর মধ্যে থাকিবার পরে, কলসীর নিম্নে একটী ছিদ্র করিয়া দিয়া উহার নিম্নে কোন পাত্র রাখিয়া, যে সামান্য পরিমাণ মাত গুড়ের মধ্যে আছে, উহা বাহির করিয়া লইতে হয়। উপরি উক্ত নিয়মে গুড় প্রস্তুত করিলে বালুকার ন্যায় গুড়ের দানা বাঁধিয়া যায়, এবং মাত অতি সহজে ও সত্বর বালুকাবৎ সার গুড়ের মধ্য দিয়া আসিয়া নিম্নস্থ পাত্রে পড়িয়া যায়। ২০ দিবস বা একমাস পরে কলসী গুলি ভাঙ্গিয়া চিনি সংগ্রহ করিয়া, ঐ চিনি বা চিনির দানা (Muscovad) সূর্য্যের উত্তাপে শুকাইয়া লইয়া, হামান দিস্তায় বা ঢেঁকিতে কুটিয়া কাশির চিনি আকারে পরিণত করিয়া লইয়া, ৭।৮ টাকা দরে অনায়াসে বিক্রয় করিতে পারা যায়।

যে মাত নিম্নস্থ পাত্রে সংগৃহীত হইবে, উহা অতি পরিষ্কার ও সুস্বাদ সামগ্রী। বাজারে সাধারণতঃ যে মাত পাওয়া যায়, তদপেক্ষা উহা অধিক দরে বিক্রয় হইবে। (কারণ ইহা এ দেশীয় চিটে গুড় নহে ; সেকেণ্ড বইল্‌স করিলে ইহা হইতে চিনি পাওয়া যায়—মিছিরির শুঁটের মত। আশা করি, আমাদের পূজনীয় লেখক মহোদয় এই রস হইতে সেকেণ্ড বইলস্ দ্বারা চিনি প্রস্তুত করিয়া তাহার ফলাফল কৃপা করিয়া জানাইবেন। মঃ বঃ সঃ)। এই মাত অনায়াসে রুটির সহিত আহার বা মুড়কি প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ চিনির কলের মাত অর্থাৎ চিটিয়া গুড়, তামাকের সহিত মিশ্রিত করা ছাড়া আর কোন কার্য্যে ব্যবহার হয় না। (কলের মাতে চিনি থাকে না ; তাঁহারা ৩।৪ বার চিনি বাহির করিয়া মাত বাজারে বিক্রয় করেন। মঃ বঃ সঃ)।

ঝাঁজি (অর্থাৎ বোধ হয় জলজ শৈবাল বিশেষ হইবে ? মঃ বঃ সঃ) ব্যবহার দ্বারা আরও স্বচ্ছ চিনি (দোবরা চিনি) প্রস্তুত হইতে পারে। উপরি উক্ত নিয়মে গুড় প্রস্তুত করিয়া, গুড়ের কলসীতে ফুটা করিয়া মাত বাহির করিয়া দিয়া, কলসী ভাঙ্গিয়া, কলসীস্থিত সার গুড় পরিষ্কার জলে মিশাইয়া, ফ্লানেল দ্বারা ছাকিয়া, পুনরায় হাঁড়িতে, কড়াতে অথবা এলুমিনিয়মের ডেক্‌চিতে করিয়া জ্বাল দিতে হয়। ঝাজরি দ্বারা গাদ্ মধ্যে মধ্যে উঠাইয়া ফেলিয়া, পূর্ব্ববৎ পরীক্ষা করিয়া যখন পাক ঠিক হইয়াছে বুঝা যাইবে, তখন নামাইয়া লইতে হইবে। একটী চৌবাচ্চার মধ্যে বাঁশের মাচান করিয়া ঐ মাচানের উপর মোটা কাপড় বিছাইয়া ঐ কাপড়ের উপর ১২ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু করিয়া উক্ত দো-পাকের গুড় ঢালিয়া দিতে হয়। দুই দিন পরে, ঐ গুড়ের উপর, শৈবাল ধৌত করিয়া মুছিয়া, এক ইঞ্চি পুরু করিয়া বিছাইয়া দিতে হয়। শৈবাল বা শেয়ালা নানা জাতীয় আছে। যে শেয়ালা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার চিনি হয়, উহার নাম ভালিস্‌নেরিয়া ভার্টিসিলাটা (Vallis-naria Verticillata)। এই শেয়ালার পাতা রজ্জুবৎ লম্বা হয় বটে, কিন্তু ঝাঁজির ন্যায় ইহার পত্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হয় না। ইহার পত্রগুলি পুরু, এক ইঞ্চি লম্বা ও সিকি ইঞ্চি চওড়া। ঝাঁজি (Certophyllum Verticillatum) এবং পাটাশেয়ালা (Vallis-naria Octandra) ব্যবহার দ্বারাও গুড় কিছু পরিষ্কার হয় ; কিন্তু ভালিস্‌নেরিয়া ভার্টিসিলাটা দ্বারা যেরূপ পরিষ্কার চিনি হয়, পাটা শেঁয়ালা ও ঝাঁজি দ্বারা সেরূপ হয় না। শেয়ালা বিছাইয়া দিবার পর দিবস যদি দেখা যায়, উহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে পরিষ্কার জল ছিটাইয়া দিয়া উহা সিক্ত রাখিতে হয়। দুই তিন দিন পরে যদি দেখা যায়, শেয়ালা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে বা পচিয়া যাইতেছে, তাহা হইলে উহা উঠাইয়া ফেলিয়া, যতটুকু চিনি পরিষ্কার হইয়াছে, উহা চাঁচিয়া লইয়া, পরে টাট্‌কা শেয়ালা পূর্ব্বের ন্যায় ভাল করিয়া ধৌত করিয়া মুছাইয়া বিছাইয়া দিতে হয়। এইরূপ ৩।৪ বার করিলে ১২ ইঞ্চি পরিমাণ সমস্ত গুড়ই চিনি হইয়া যাইবে। মাচানের নিম্নে চৌবাচ্চায় যে তরল গুড় থাকিয়া যায়, উহা চিটিয়া গুড়। তামাকের সহিত মাখা ভিন্ন অন্য কার্য্যে উহা ব্যবহার হয় না। নির্দ্দিষ্ট উপায়ে গুড় প্রস্তুত করিয়া পরে আর একবার সার গুড় পাক দিয়া, শেয়ালা ব্যবহার দ্বারা উহা পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিলে, যে দোবরা চিনি হইবে, উহা বিলাতী চিনি অপেক্ষা কিছুই অপরিষ্কার হইবে না। এক মণ গুড় হইতে এই চিনি ২০।২৫ সের পাওয়া যাইতে পারে। উপরি উক্ত নিয়মে প্রস্তুত সার গুড়ের দামও ৬।৭ টাকা হইতে পারে এবং এক পাকের চিনির দাম মণ করা ৭।৮ টাকা হইতে পারে। সাধারণতঃ বাজারে যে গুড় বিক্রয় হয়, উহার দাম মণ করা ৪৲ টাকা। (অবশ্য বাজার অনুসারে দর ; বাজার প্রতিদিন স্থির থাকে না) ফলতঃ দেখা যাইতেছে, কিছু যত্ন করিয়া

নির্দ্দিষ্ট উপায়ে গুড় প্রস্তুত করিতে পারিলে অতি সামান্য ব্যয়াধিক্য দ্বারা বিঘা প্রতি ৩০৲ টাকারও অধিক লাভ করিতে পারা যায়। অর্দ্ধসের ফস্‌ফরিক এসিডের (যাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫) দাম ১॥০ টাকা মাত্র। এই পরিমাণ ফস্‌ফরিক এসিড ব্যবহারে ১০০/০ মণেরও অধিক গুড় প্রস্তুত করিতে পারা যায়। চুণের ও লিট্‌মস্ পেপারের জন্য আরও সামান্য ব্যয় হইবে। থার্ম্মমিটার ও ক্লারিফাই করিবার ন্যাদ একবার ক্রয় করিয়া রাখিলে অনেক বৎসর চলিয়া যাইবে। অবশ্য যত্ন ও আয়োজনের আবশ্যক ; কিন্তু যত্ন না করিয়া রত্ন আহরণ করা কখনই সম্ভবপর নহে।

আগামী মাসে "বিলাতী উপায়ে শর্করা প্রস্তুত" (সচিত্র) লিখিয়া "শর্করা বিজ্ঞান" প্রবন্ধ সমাপ্ত হইবে।

বিলাতী দেশালায়ের কারখানা।

দশবৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিলাতী দেশালায়ের কারখানা এদেশে সুচারুরূপে পরিচালিত করিবার পক্ষে যে আয় ব্যয় স্থির করিয়াছিলেন তাহা এই,—

১। দেশালাই তৈয়ারির সমগ্র যন্ত্রাদির মূল্য ১৭ হাজার টাকা। এই কলে প্রত্যহ পাঁচশত গ্রোস বাক্স দেশালাই হইতে পারে। এক গ্রোসে বার ডজন অর্থাৎ ১৪৪ বাক্স দেশালাই থাকে। ১২টা বাক্সে ১ ডজন।

২। গৃহ নির্ম্মাণ,—কতক পাকা, কতক করগেট লোহার মূল্য ৮০০০৲।

৩। কল বসাইবার মজুরি দুই হাজার টাকা।

৪। বাক্সের গায়ে লেবেল ছাপিবার ও মারিবার কল, মূল্য ৪০০০৲।

৫। কাজ চালাইবার মূলধন,—দশহাজার টাকা।

৬। প্রথম পরীক্ষাদির ব্যয় দুই হাজার টাকা।

৭। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার ব্যয় দুই হাজার টাকা।

৮। রিজার্ব ফণ্ড বা তহবিলে স্থায়ী মজুত থাকিবে সাত হাজার টাকা।

সুতরাং মোট মূলধন আবশ্যক ৫২ বাহান্ন হাজার টাকা। এদেশী মহাজনের পক্ষে ইহা যে অতিরিক্ত টাকার কারবার, তাহা নহে। মনে করিলে, একজন মহাজনেই এরূপ কারখানা করিতে পারেন। সুশিক্ষিত হইয়া একার্য্যে চেষ্টা করিলেই অবাধে এদেশে "জাপানের মত" অনেক

কারখানা হইতে পারে। একজন মহাজন সুশৃঙ্খলার সহিত ইহা পরিচালিত করিয়া দেশের মধ্যে দেখাইতে পারিলেই—তাঁহার কার্য্যে লাভ হইলেই, অপর দশজনে শীঘ্রই অনুসরণ বা অনুকরণ করিবে। কারণ মহাদেশ মাত্রেই সমুদয় শ্রেণীর লোক থাকে এবং সমুদয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে সাধ্যমতে অনুকরণ-প্রিয়তা বলবতী স্বতঃই দেখা যায়। একটা পেটেণ্ট ঔষধ বা তৈলের বিক্রয়াধিক্য হইলে উহার নকল দশদিক্ হইতে বাহির হয়। তখন ৫২ হাজার টাকা মূলধনের কার্য্য ভালরূপ চলিলে, এদেশ-বাসী অনেক ধনবান্ মহোদয়েরা একাজ যে করিবেন, তাহা স্থির। এদেশে এখন ইহা চালাইয়া দেখাইবার লোকের অভাব।

যাহা হউক, পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ কলে প্রত্যহ ৫ শত গ্রোস দেশালাই উৎপন্ন হইতে পারে,—পূরাদমে কাজ চালাইলে তবে ইহা হইবে ; কিন্তু নানা কারণে দৈব দুর্ঘটনায় কল চলা যদি ২।১ দিন কামাই পড়ে, সেই জন্য চারিশত গ্রোস উৎপন্ন নিশ্চিত। আমরা যদি নয় আনা প্রতি গ্রোস বিক্রয় করি, তাহা হইলে এক পয়সায় ৪টা দেশলাই পাইকারেরা পাইবে, তাহারা দেশের মধ্যে ৩টা বা ২টা বাক্স দেশালাই এক পয়সা মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে।

এক্ষণে হিসাব করিয়া দেখুন,—প্রত্যহ ৪ শত গ্রোস দেশালাই ; প্রতি গ্রোস ॥/০ আনা মূল্যে বিক্রয় করিলে, এক বৎসরে এই কলে ৬৭৫০০৲ সাত ষট্টি হাজার পাঁচশত টাকার মাল তৈয়ারি হইবে।

এক্ষণে প্রাত্যহিক ব্যয় দেখুন,—

১।	দেশালাই জন্য কাষ্ঠ প্রত্যহ আট মণ, মূল্য	১৩৲
২।	কুলি ২৫ জন,—মজুরি প্রতিজনের ।০ আনা হিসাবে	৬।০
৩।	মিস্ত্রী ১জন	॥০
৪।	হেড মিস্ত্রী ১ জন	১৲
৫।	দ্বারবান্ প্রভৃতি	।০
৬।	এঞ্জিনের কয়লা	৫৲
৭।	দেশালাই তৈয়ারির রাসায়নিক দ্রব্য বা লেই	৪৯৲
৮।	কাগজ ও আঁটাই খরচ ইত্যাদি	১৫৲
৯।	সরঞ্জামি খরচ বা বাজে খরচ	৫৲
১০।	ম্যানেজারদিগর	১৫৲
	মোট	১১০৲

অতএব ৩৬৫ দিনে বা ১ বৎসরে ব্যয় হইবে ৪০১৫০৲ টাকা। পূর্ব্বে দেশালাই বিক্রয়ের আয় দেখান হইয়াছে ৬৭৫০০৲ টাকা; তাহা হইলে খরচ বাদে লাভ হয় ২৭৩৫০৲ টাকা। ৫২ হাজার টাকা মূলধনের কার্য্যে ২৭৩৫০৲ টাকা লাভ। এক টাকায়, আট আনার অধিক লাভ। ৫২ হাজার টাকার ব্যাজ বার্ষিক শতকরা ১২৲ টাকা অথবা মাসিক শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে যাহা কলিকাতার বাজারে মহাজনেরা সচরাচর লইয়া থাকেন, তাহাও যদি দিতে হয়, অর্থাৎ সৎসাহসী, বিশ্বাসী, কার্য্য-পারদর্শী কোন মহোদয় যদি উৎসাহপূর্ব্বক ৫২ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়াও এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে শতকরা ১৲ হারে বৎসর ৬২৪০৲ টাকা ব্যাজ দিয়াও তাঁহার লাভ থাকিবে। কিন্তু উৎপন্ন মাল ভাল হওয়া চাই। কলিকাতায় আজকাল জাপানী দেশলাই পচ্ছন্দ করে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুইডেনের সহিত অপর কোন দেশ একার্য্যে পারিতেছে না। এই দোষেই "মেড-ইন্ সালিখা" দেশালাই নামের প্রতিপত্তি বাহির করিতে পারেন নাই। ৫২ হাজার টাকা খাটাইয়া ২৭ হাজার টাকা লাভের প্রত্যাশা না করিয়া এ দেশীয় মহাজনেরা শতকরা ১৲ টাকা হারে ব্যাজ পাইলেই যখন যথেষ্ট লাভ মনে করেন, তখন ঐ বাকি লাভের টাকা দিয়া সুইডেন হইতে ভাল কারিকর আনাইয়া এই কারখানা খোলা উচিত। এদেশের কেমিষ্ট্রী কি মেড ইন্ সালিখা পর্য্যন্ত রহিল? দেশালায়ের কারখানার অন্যান্য কথা সময় মতে বলিব।

মিষ্ট ব্যাধি।

(লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগচী।)

অধিক চিনি খাইলে মধুমূত্র পীড়ার উৎপত্তি হয়, এ প্রবাদ সকল দেশেই প্রচলিত। অধিক চিনি উদরস্থ হইলে, তাহা যথাযথ ভাবে পরিপাক হইতে পারে না, কিয়দংশ মূত্রের সহিত বহির্গত হয়। অতএব পথ্যবিধানে চিনি ব্যবস্থা করিলে, মধ্যে মধ্যে মূত্র পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা দুইটি উপায় স্থির হয়, প্রস্রাবের চিনি নির্ণয় এবং কত চিনি রোগী আহার করে জানিয়া বলা যায়, সে কত চিনি খাইয়া পরিপাক

করিতে সক্ষম। চিনি খাওয়ান চাই অথচ উহা দেহ হইতে বাহির হইয়া না যায়, তাহাও দেখা চাই; এই উদ্দেশ্যেই মূত্র পরীক্ষা করিতে হয়।

ইক্ষু শর্করা অর্থাৎ কাশীর কিম্বা মরিশস্ চিনি মাত্রাধিক্য ভাবে এক মাত্রায় বেশী খাইলে, অন্ত্রের বা নাড়ীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে শ্লেষ্মার শ্রাবণ অধিক হয়। এই স্রাবাধিক্য জন্য শিশুদের উদরাময় হওয়া সম্ভব। অন্ততঃ একারণে তল পেটের ক্ষুদ্র নাড়ীর মল তরল হইয়া ক্রিমি জন্মাইবার পক্ষে এবং উহাদের বাসের পক্ষে সুবিধা-জনক হয়, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। আমার বোধ হয়, এই জন্যই প্রবাদ আছে, যে "মিষ্ট খাইলে ক্রিমি হয়।" কিন্তু চিনির সরবৎ পান করিলে স্রাবাধিক্য হয় না। মাল্ট-একৃষ্ট্রাক্ট চিনির সরবতের শ্রেণীর মধ্যে গণ্য, এজন্য ইহা খাইলেও স্রাবাধিক্য হয় না। যে সকল শিশু ক্ষীণকায়, খিট্‌খিটে স্বভাব, তাহাদের পক্ষে মিষ্ট ভক্ষণ উপকারক নহে। মধুমূত্র পীড়া সামান্য হইলেও ইক্ষুশর্করা অপকারী। মেদগ্রস্ত লোকের পক্ষেও মিষ্ট উপকারী নহে।

বাত এবং গাউট পীড়ায় চিনি উপকারী কি না, সন্দেহের বিষয়। অনেকের বিশ্বাস যে, এতদ্দ্বারা অপকার হয়। স্থূলকায় ব্যক্তির গাউট হইলে তাহার মিষ্ট ভক্ষণে বিষের মত কার্য্য হয়। অতএব সাবধান! কেবল মেদের অভাব থাকিলে ক্ষীণকায় ব্যক্তির পক্ষে চিনি উপকারী।

মিষ্ট ভক্ষণ বলিলে ইক্ষু, বিটমূলোৎপন্ন কিম্বা খেজুর চিনি বুঝায়, এরূপ নহে। আমরা নানা উপায়ে মিষ্ট খাইয়া থাকি। খেজুর ফলে শতকরা ৫৮ অংশ চিনি থাকে, এই জন্য খেজুর ফল খাইয়া আরবেরা এত দুর্দ্ধর্ষ। আরব দেশের স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা এবং গৃহ পালিত পশু পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে খেজুর খাইয়া সবল থাকে।

অনেকে বলেন, আমাদের দেশে আম কাঁটাল পাকিলে উহা খাইয়া বালক বালিকাগণ অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় হয়। তাহার কারণও ঐ ফল মধ্যস্থ শর্করা ভক্ষণের ফল। আমরা ভাত খাই, তাহাও প্রকারান্তরে শর্করা ভক্ষণ। এ সকল বিষয় আগামী মাসে "চিনির রাসায়নিক তত্ত্ব" প্রবন্ধে বলিব।

চিনির ডিউটী।

বিদেশীয় জাহাজগুলি এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের মত। এক লক্ষ দেড় লক্ষ মণ মাল বোঝাই এবং ৫।৭ শত লোক পৃষ্ঠে লইয়া বন্দরে বন্দরে গমনাগমন করে। বাণিজ্যের জন্যই দেশের উন্নতি। কলিকাতায় এই সকল জাহাজ না আসিলে, সহর এবং মফঃস্বলে প্রভেদ কিছুই থাকে না। সহরের অধিকাংশ আফিস বিদেশীয় বণিকের এজেণ্ট বা আড়তদার মাত্র। ইহাদের মূলধন খুব কম। কিন্তু বাহিরের আভরণ অতি সুন্দর গুরুত্বযুক্ত। কলিকাতার ইংরাজটোলার পার্শ্বেই এ দেশীয় মহাজনদিগের কারবার। ইহাদের মাল ক্রয় করিয়া, আফিসওয়ালা তাহা আনিয়া দেন মাত্র। দালালের চাতুরীতে এবং সাহেবদিগের তীক্ষ্ণ ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে, এ দেশীয় মহাজনের পক্ষে আগামী সিপে কত মাল এ দেশে আসিবে, তাহা এ দেশের পক্ষে অতিরিক্ত কি না, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। জাহাজ বঙ্গোপসাগর হইতে কলিকাতার গঙ্গা নদীতে প্রবেশ করিবার সময়, জাহাজে কত মাল আছে জানা যায়, কিন্তু তৎপর দিন বা ২।৩ দিন বাদেই জাহাজ সহরে উপস্থিত হয়। অতএব এ সংবাদে মহাজন দিগের কোন ফল হয় না। প্রত্যেক আফিস হইতে কোথায় কোন্ গ্রাহককে কি মাল বিক্রীত করা হয়, এবং কত মাল আফিস হইতে অমুক সিপে বিক্রয় হইয়াছে; তাহাও ক্রেতা সংবাদ পায় না। সে যেমন ৫০ টন মাল লইল, ঐরূপ দেশশুদ্ধ অনেকে ৫০ টন লইয়াছে; সে কিছুই তাহার সংবাদ পায় না। এজন্য, এ দেশের প্রয়োজন ধরুন ৫ হাজার টন, কিন্তু মাল আসিয়া পড়ে ১৫ হাজার টন। কাজেই বাজার পড়িয়া যায়। ইহা শত টাকার ডিউটী দ্বারা রক্ষা হইবার নহে।

দ্বিতীয়তঃ এ দেশীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ে তখনকার মহাজনদিগের মূলধনের প্রয়োজন হইত। মফঃস্বলের ব্যাপারীদিগকে দাদন দিয়া মাল আনাইতে হইত। জার্ম্মণির এই দাদন দেওয়ার প্রথাকেই “বাউণ্টি” বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বস্তুতঃ কৃষককে উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহার ক্ষেত্রে মাল রহিল, অথবা সে তখনও বীজ রোপণ করে নাই, অথচ মহাজন তাহাকে দশ হাজার টাকা দিল, সে গাছ না হইতেই ফল পাইল, কাজেই তাহার প্রবল ভাবে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়। এখন মহাজনদের দেশী কাজ নাই। বিলাতী মাল খরিদ বিক্রয় করিতে মূলধন বেশী লাগে না, সাহস বেশী চাই। এখনকার এজেণ্ট আফিসওয়ালা যে নিয়মে এ দেশী মহাজনদিগকে মাল বিক্রয় করে, তাহাতে জাহাজ আসিলে টাকা দিয়া মাল লইতে হইবে, ধার বা টাকা বাকী থাকিবে না; “ফেল কড়ি মাখ তেল।” এই অভ্যাসের অনুকরণ এ দেশী মহাজনের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে। ইহারাও জাহাজ আসিলে যত মাল আসিয়াছে, তাহা ঐরূপ ভাবে সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা লইয়া বিক্রয় করিতে সকলেই এক সঙ্গে প্রস্তুত হয়েন। যেবার মাল কম আসে, সেবার বিক্রয় হয়। ২।৫ বার এইরূপ বিক্রয় হইলে, মহাজন মনে করে, বেশ কাজ ত, টাকা লাগে না, কোন ঝঞ্ঝট্ নাই, কেবল কনট্রাক্টে স্বাক্ষর করিয়া উপার্জ্জন হয়। এই কুসংস্কারেই এ দেশের ব্যবসায় পরিণামে মারা যাইবে। এই কুসংস্কারের বশেই যে পূর্ব্বে ২৫ টন মাল লইত, সে ১০০ টন ধরিয়া বসে। মাল আসিলে টাকা দিয়া তুলিবার সঙ্গতি নাই, কাজেই যে দরে হউক বিক্রয় করে। এই কারণেই দেশের ক্ষুধা ৫ হাজার টনের স্থলে ১৫ হাজার টন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়; কাজেই কত খাইবে?

আর এই বিনা-সম্বলে ব্যবসার জন্য সহরে শতমুখী ব্যবসায়ের বৃদ্ধি হইয়াছে! এ জন্য জাহাজী মালের হিসাব কে কোথায় কি লয়, তাহা পাওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ ইহার উপর বড় বড় আফিসের খেলা আছে। বিট্‌চিনির খেলার প্রবন্ধে তাহা বলিয়াছি। এই সকল কারণেই চিনির কার্য্যে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতেছে। ডিউটী দ্বারা ইহার বিশেষ কিছুই সুবিধা হইবে না। জর্ম্মণ বিট্‌চিনির ডিউটী হন্দর-প্রতি ২৸৹ হইয়াছে, অষ্ট্রেলিয়ার হন্দরে ৩৷৹ আনা বসিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এক্‌ট্রা ডিউটী যখন হয়, তখন জর্ম্মণ বিটের ডিউটী বেশী করা হইয়াছিল, এবার জর্ম্মণ কম, অষ্ট্রেলিয়া বেশী; কারণ সেবারে অষ্ট্রেলিয়ার কম ছিল, তাই উহার আমদানী এবার বেশী। কাজেই এবার অষ্ট্রেলিয়ার ডিউটী বেশী। কিন্তু এপর্য্যন্ত বেলজিয়মের চিনির ডিউটী করা হয় নাই। এতদিন উহা কলিকাতায়ও আসে নাই। সম্প্রতি ৪ হাজার বস্তা বেলজিয়ম বিটচিনি কলিকাতায় আসিয়াছে, আরও আসিবে, তাহার কনট্রাক্ট হইতেছে এবং হইয়াছে। এখানকার সাহেবরা মনে করিতেছেন “জর্ম্মণওয়ালারা জুয়াচুরী করিয়া বেলজিয়ম পোর্ট দিয়া মাল পাঠাইবে।” ইহা নিতান্ত অমূলক চিন্তা

নহে, ইতিমধ্যেই জর্ম্মণের একটা মার্কা, বেলজিয়মে ধরা পড়িয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন, ঐ কল জর্ম্মণ এবং বেলজিয়ম দুই স্থানেই আছে। ফলে বেলজিয়মের চিনিতে ডিউটী করিবার উপায় আছে কি? উহা কাহার রাজত্ব? মিসর ইংরাজ রাজ্য বলিয়া তথাকার বিটে ডিউটী নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতের চিনির কার্য্যে উন্নতি সুদূর-পরাহত।

ব্যবসায়ের সমতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা রক্ষার জন্যই ডিউটী। রাজার সে পক্ষে ক্রটি নাই। যেমন রোগ হইতেছে, চিকিৎসাও সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু যে রোগী বাঁচিবে না, তাহাকে শত ডাক্তারে রক্ষা করিতে পারে কি? আমাদের দোষে আমরা মরিতেছি, ইহাতে রাজার দোষ কিছুই নাই। অনেকে বলেন, রাজা ঐ অতিরিক্ত ডিউটী যাহা লইতেছেন, তাহা এ দেশীয় কৃষকদিগকে বাউণ্টি দিউন না কেন? কেবল ঔষধ খাওয়াইলে হইবে না, পথ্য বিধান চাইত? ইহাতে মালের ফলন বেশী হইতে পারে, কিন্তু লইবে কে? দুই টাকা তের আনা ডিউটী দিয়াও অদ্য (২৭শে শ্রাবণ ১৩০৯ সাল) বিট্‌চিনির দর ৭৲ টাকা এবং শীঘ্রই আরও কমিবে। ডিউটী হইয়া জর্ম্মণ এবং অষ্ট্রেলিয়া বিটচিনির আমদানী বন্ধ হইবে, এই চিন্তাতে চীন এবং জাবা চিনি সহরে অতিরিক্ত আসিতেছে, এখনও আসিবে। তাহার এক বৎসরের কন্‌ট্রাক্ট হইয়াছে। চীনের মোটাদানা পরিষ্কার ভাল চিনির দর হইয়াছে ৭৷৴০ মণ। জাবা চিনি সাত শত টন লইলে ৫৲ টাকা মণ পাওয়া যায়। এ অবস্থায় কাজেই বলিতে ইচ্ছা করে, জর্ম্মণ চিনির ডিউটী মত চীন, মারিশশ্‌, বেলজিয়ম, পীনাং, মিসর প্রভৃতি বিদেশীয় চিনি মাত্রেরই উপর অতিরিক্ত ডিউটী হওয়া কর্ত্তব্য। তবে ভারতের চিনির উপকার হয়।

ইংরাজ, মুসলমান, মাড়য়ারী এবং বাঙ্গালী চিনি ব্যবসায়ী মাত্রেরই উচিত, সকলে একযোগে এক বৃহৎ সভা করিয়া পরামর্শানুসারে বিদেশ হইতে চিনি আমদানী করা। ইহাতে বরং সকলেই কিছু কিছু পাইবেন। তাহা হইলে "সামাই মত" অর্থাৎ, সভা যেমন সাম্‌লাইতে পারিবেন, সেইরূপ কাজ করিবেন। বিদেশীয় পণ্য মাত্রেরই আমদানীর সময়ে সকল শ্রেণীর মহাজনের উচিত, সভা করিয়া বেশ বুঝিয়া উহাকে আনা। এবার অনাবেরল মিষ্টার ফিন্‌লে বাহাদুর চিনির এই এক্‌ট্‌। ডিউটীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, ১৯০২ সাল ৬ই জুন ইহা পাস হয়।

উদ্ভিজ্জতত্ত্ব।

প্রথম প্রস্তাব—মূল।

উদ্ভিজ্জ-তত্ত্ব জানিতে হইলে, অগ্রে মূলের বিষয় জানিতে হয়। মূল দুই প্রকারে অঙ্কুর হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আপনারা যদি আম, কাঁটাল, তেঁতুল, জাম, প্রভৃতির মূলোৎপাদনশক্তি দর্শন করিয়া, তাল, গুবাক, নারিকেল, খর্জ্জুর, কেতকী, বংশ, কদলী প্রভৃতি বৃক্ষের অঙ্কুরোৎপাদনশক্তি দর্শন করেন, তাহা হইলে, উক্ত দুই প্রকারে অঙ্কুরোৎপত্তি সবিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বোক্ত আম, কাঁটাল, তেঁতুল, প্রভৃতি বৃক্ষের অঙ্কুরোৎপাদন-ক্রিয়াকে দ্বৈভাগিক ক্রিয়া বলে; অর্থাৎ উক্ত সকল বৃক্ষের বীজ দুই অংশে বিভক্ত হওয়ায় বীজের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অঙ্কুর নির্গত হয়। কিন্তু শেষোক্ত বৃক্ষসমুদয়ের বীজ তদ্রূপভাবে অঙ্কুরিত হয় না; উহাদের বীজের এক অংশ হইতে অর্থাৎ যে স্থানে বীজের চোক্‌ আছে, সেই স্থান হইতে অঙ্কুর বহির্গত হয়। পরে সেই অঙ্কুরিত বৃক্ষের একটী পত্র বহির্গত হয়। এই জন্য কচি অবস্থায় ইহাদিগকে "একবীজদল" উদ্ভিজ্জ বলিয়া জানা যায়। আর আম, কাঁটাল, তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষগণ অঙ্কুরিত হইবার পর দুইটী পত্র বহির্গত হইয়া থাকে বলিয়া, তাহাদিগকে "দ্বিবীজদল" উদ্ভিজ্জ বলিয়া ছোট অবস্থায় জানা যায়। অধিকাংশ উদ্ভিজ্জ প্রায় বীজ হইতে উৎপন্ন হয় বটে; কিন্তু অনেকানেক দ্বিবীজদল উদ্ভিদের বীজ আদৌ দৃষ্টি হয় না বলিয়া, তাহাদিগকে "অবৈজিক দ্বিবীজদল" বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশের মল্লিকা, জুঁই, গোলাপ প্রভৃতিকে অবৈজিক দ্বিবীজদল বলা হইয়া থাকে।

একবীজদল উদ্ভিজ্জ অপেক্ষা দ্বিবীজদল উদ্ভিজ্জের মূল-বিন্যাস অধিক বিচিত্র! ইহারা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া, শূন্য পথে উঠিয়া, যেমন বৃহৎ বৃহৎ শাখা প্রশাখায় পরিণত হইয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ ইহাদের মূলদেশও দুই অংশে বিভক্ত হয়, এবং সেই সকল মূলের শাখাপ্রশাখা-মূল বহি-

র্গত হইয়া, মৃত্তিকা মধ্যে অবস্থিতি করিতে থাকে; এবং সেই শাখা-প্রশাখামূলসকলের গাত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশের ন্যায় শিকড় থাকে। ঐ শিকড় দ্বারা ইহারা মৃত্তিকারস পান করিয়া জীবিত থাকে।

একবীজদল উদ্ভিদের শিকড় উক্তরূপ প্রণালীতে বিন্যস্ত হয় না। একবীজদল উদ্ভিদেরা শিকড় প্রসব করিবার স্থানাদি বিবেচনা করে না; সেই জন্য একবীজদল উদ্ভিদের শিকড়কে "আস্থানিক" শিকড় বলে।

আস্থানিক শিকড় দুই একটী দ্বিবীজদল উদ্ভিদেও দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু সে সকল আস্থানিক শিকড়ের নামও স্বতন্ত্র হইয়াছে। যথা "বায়ব্য-মূল"। বায়ব্যমূল, দ্বিবীজদল উদ্ভিদের শাখা প্রশাখা হইতে, বায়ু-সাগরে ঝুলিয়া থাকে। বট প্রভৃতি গাছের ঝুরি দেখিলেই বায়ব্যমূলের বিষয় অবগত হইবেন। বায়ব্য মূল ছাড়া কতক গুলি অপুষ্পক উদ্ভিদের মূল, জলের উপর ভাসিতে থাকে বলিয়া তাহাদিগকে "জলীয় মূল" কহে। শৈবাল ইত্যাদির মূলকে জলীয়মূল বলা যাইতে পারে।

কোন কোন একবীজদল উদ্ভিদের আস্থানিক শিকড়ের মধ্যে পোষণোপযোগী দ্রব্য সঞ্চিত থাকে। উক্ত দ্রব্য পুষ্পপ্রসবের সময় অবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা তাহাকে পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। ওল, মানকচু, আলু প্রভৃতি তাহার উদাহরণস্থল। কিন্তু অনেকে ওল, মানকচু, আলুকে মূল বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে উহারা মৃত্তিকা স্থিত 'কাণ্ড' মাত্র।

যাহা হউক, পাঠক! বৃক্ষমূলের কার্য্যবিধি অতি আশ্চর্য্যজনক। আপনারা সকলে জানেন যে, উদ্ভিদেরা শিকড়দ্বারা মৃত্তিকারস পান করিয়া জীবিত থাকে। কিন্তু তাহা ভিন্ন মূলের আরও অনেক কার্য্য আছে। ইহাদের কেবল সূক্ষ্ম চুলের ন্যায় শিকড়সমূহ মৃত্তিকারস আকৃষ্ট করিয়া থাকে। আবার স্থূলশিকড়গুলি ঐ শোষিত রস পান করিয়া বৃক্ষের উদরের কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদের উদরের মধ্যে পীত রসের সারাংশ জমিয়া যে শ্বেতসার সামগ্রী উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা বসন্ত কালে কিম্বা শরৎ কালে বায়ুদ্বারা আকর্ষিত হইয়া পুষ্প প্রসব করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নবীন সূক্ষ্ম মূলেরা মৃত্তিকা রস পান করিয়া থাকে। কিন্তু জগদীশ্বরের কেমন মহিমা! সেই নবীন মূলেরা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, মৃত্তিকার স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া, আহার অন্বেষণ করিয়া থাকে। উক্ত প্রকারে নবীন মূল মৃত্তিকাস্তর ভেদ করে বলিয়া, ইহা দ্বারা বৃক্ষের আর একটী উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে; কারণ সূক্ষ্ম মূলেরা যতই মৃত্তিকা মধ্যে গমন করে, ততই বৃক্ষের কাণ্ড দৃঢ়রূপে মৃত্তিকার উপর স্থাপিত হয় এবং সেই জন্য তাহারা সহজে বাত্যাঘাতে ভূমিতলে পতিত হয় না।

সূক্ষ্ম মূলেরা রস নির্ব্বাচন করিয়া পান করিয়া থাকে। সর্ব্বদাই দেখা যায়, কোন ভূমিতে নানাবিধ উদ্ভিদের ভক্ষ্যবস্তু থাকিলেও রোপিত বৃক্ষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার স্বাস্থ্যকর রস না পাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কিছুতেই অপর-জাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করিবে না।

যাহা হউক, আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহারা স্বাস্থ্যকর রস পান করিয়া পরে পরিপাক করিয়া ফেলে। রসপরিপাক হইলে, মূলের ভিতর যে বিযাক্ত রসটুকু থাকে, তাহা পুনরায় অন্য স্বতন্ত্র শিকড় দ্বারা মৃত্তিকা মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই শিকড় আদৌ রস ভক্ষণ করে না, কেবল বৃক্ষের বিষাক্ত রস বহির্গত করিয়া দেয়। কিন্তু ইহাদের একের বহির্গত রস অপরের স্বাস্থ্যকর হয়। এই জন্য বর্ষে বর্ষে ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বীজ রোপণ করা হয়, এবং তাহাতেই ক্ষেত্র স্বাভাবিক উর্ব্বর হইয়া থাকে।

মেনিলা।

ইহা মুগা গাছের মত। এ গাছের পাতা আনারস পাতার মত, তবে আনারস পাতা অপেক্ষা ইহার পাতা লম্বা চৌড়ায় অনেক বড়। পেঁপে গাছের মস্তকে আনারস গাছের মত বড় বড় পাতা বসাইয়া দিলে মেনিলা মত দেখিতে হয়। এ দেশের মুগা গাছ এবং আনারস প্রভৃতি গাছও ঐ শ্রেণীর বৃক্ষ মধ্যে গণ্য করা হইয়া থাকে। মুগা গাছ মেনিলা গাছের মত বড় হয় না। মেনিলা একটী দ্বীপের নাম, তথাকার মুগা গাছকেই "মেনিলা" গাছ বলা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে অনেক স্থানে এবং আমাদের বঙ্গেও অনেক সাহেবী বাগানে ইহা রোপিত হইয়াছে।

অতএব ইহা এদেশে জন্মিতে পারে, তাহা পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে। কিন্তু ইহার রীতিমত আবাদ এ দেশে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। মুগা গাছের আবাদ বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে আছে। ইহা এক-বীজ-দল উদ্ভিজ্জ।

মেনিলা গাছের পত্র হইতে যে আঁইশ পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা উৎকৃষ্ট দড়ি প্রস্তুত হয়। এই দড়িকে "মেনিলারোপ" কহে। মেনিলা সূত্রের দুই অঙ্গুলি বিশিষ্ট মোটা দড়িতে ২০০মণ পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেখা হইয়াছে যে, উহার ভারে দড়ি ছিঁড়িয়া পড়ে না! এইজন্য মেনিলা রোপের ব্যবহারে অতিরিক্ত যত্ন এবং আদর বাড়িয়াছে। খিদীরপুরে ডকে জাহাজের কার্য্যে ইহা প্রচুর রূপে ব্যবহৃত হয়; তথায় লৌহ শিকল অপেক্ষা ইহার আদর বেশী। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরও ইহার আবাদে যত্ন করিতেছেন। ভারতের স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা ইহার আবাদ হইতেছে, এই রূপ শুনা যাইতেছে। দুই হস্ত পরিমিত মেনিলা রোপের মূল্য আট টাকা। অতএব এ চাষে ভারতবাসীর বিলক্ষণ লাভ হইবার কথা।

মুগা গাছের পাতার আঁইসে এ দেশে দেশী কাপড়ের "পাড়" হইয়া থাকে, মাছ ধরা সুতা হইয়া থাকে এবং দড়িও কিছু কিছু হইয়া থাকে। এ দেশী মুগা দড়ির মূল্য প্রতি হস্ত ১৲ টাকা এইরূপ শুনা যায়। এ দেশী মুগার দড়ি মেনিলার মত ভার সহ্য করিতে পারে না, তাহাও সাহেবেরা পরীক্ষা করিয়াছেন; তবে মুগা অনেক অংশে ভারবাহী, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুগার সূক্ষ্ম আঁইসে এ দেশে কাপড় পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দোষীকে ফাঁসি দিবার সময় মেনিলারোপ ব্যবহৃত হয়।

এই বৃক্ষের আঁইসে সমধিক পরিমাণে জল শোষণ করে। শুষ্ক অবস্থায়ও ইহাতে শতকরা ১২ ভাগ জলীয়াংশ থাকে। সেঁতসেঁতে স্থানে এই আঁইশে শতকরা ৪০ ভাগ জলীয়াংশ থাকে। যাঁহারা এই মেনিলা আঁইশের কারবার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এটি জানিয়া রাখায় উপকার আছে। অনেক উষ্ণপ্রধান স্থানে ইহার চাষ হয়। ফিলিপাইন দ্বীপের মেনিলা ও শিবু নামক স্থান হইতেই এই মেনিলা আঁইশ বহু পরিমাণে ইতস্ততঃ আমদানী হয়। ১৮৮১ সালে ঐ দুইটি স্থান হইতে চারি লক্ষ গাঁইট এই মেনিলা আঁইশের রপ্তানী হইয়াছিল। এক একটি গাঁইটের পরিমাণ ২৮০পাউণ্ড বা কিছু কম সাড়ে তিন মণ। এই সমস্ত আঁইশ প্রায় সমগ্রই বিলাতে, আমেরিকায় ও অষ্ট্রেলীয় উপনিবেশসমূহেই রপ্তানী হইয়াছিল। কেবল বিলাতে আমদানী হইয়াছিল কিঞ্চিন্ন্যূন ৪ লক্ষ ৮৬ হাজার মণ। আজকাল ইহার আমদানী খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। মূল্য ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫১৪ পাউণ্ড। উহার মূল্য অধিক বলিয়া অনেক ব্যবসাদার উহাতে নিউজিল্যাণ্ড এবং রুষিয়ার পাট মিশাল দিয়া তঞ্চক করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাট, মেনিলা প্রভৃতি গাছের আঁইশ বাহির করিবার উপায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে বলা যাইবে।

বড়লোক হইবার উপায়।

(ঐতিহাসিক নবন্যাস!)

একজন আমাকে মায়ায় ভুলাইয়া, এক সুবৃহৎ গৃহে লইয়া গিয়া, তথায় আবদ্ধ করিল। ঘরে ঢুকাইয়া, চাবি দিয়া তিনি বাহিরে দাঁড়াইয়া এই কথা বলিলেন, "ঘর হইতে বাহির হইয়া আইস। আমি চাবি খুলিব না, অনেকে এইরূপ বাহির হইয়া আসিয়াছেন! আশা করি তুমিও আসিবে।" মহাপুরুষ চলিয়া গেল। মহা ভাবনায় পড়িলাম। কোথা ছিলাম, কোথা আসিলাম। এখন উদ্ধারের উপায় কি? ঘরে কিন্তু অনেক লোক দেখিলাম। অনেকে দেয়ালে ছিদ্র করিয়া বাহির হইবে, চেষ্টা করিতেছে। কেহ বা জানালার গরাদে ভাঙ্গিবার উপক্রম দেখিতেছে। একজন ৫০ বৎসর ধরিয়া দেওয়ালে ছিদ্র করিতেছে, বাহিরের আলোতে তাঁহার ছেঁদা দেখা যাইতেছে। তাঁহাকে বলিলাম "মহাশয়! আমি আপনার সাহায্য করিব, কিছু অংশ দিবেন; আপনার কাজও শীঘ্র হইবে এবং আপনাতে আমাতে শীঘ্রই উদ্ধার হইব। তিনি উত্তরে বলিলেন "উদ্ধার হইয়া কি করিবে?"

"বড় লোক হইব। উদ্ধার না হইলেত বড়লোক হওয়া যায় না!" বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল "না মহাশয়! আমিত কাজের চরমে আসিয়াছি, আর অংশীদার করিব না।" কিছুক্ষণ পরে আর এক স্থানে দেখিলাম, এক জন ২৫ বৎসরের যুবক সেই দিন ছিদ্র হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি এবং অনেকে সেই পথে গিয়া দাঁড়াইলাম; উদ্দেশ্য ঐ মার্গ দিয়া পালা-

ইব, কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহার উত্তরাধিকারী অনেক! ছিদ্রের পরিধি অপেক্ষা তাঁহাদের সমষ্টি অনেক বেশী! উপায় কি? কোথায় যাই। আমার অঙ্গুলিতে বাবা তারকেশ্বরের মানসিক নথ ছিল। এক স্থান নির্ণয় করিয়া নথ দিয়া উহা অল্পে অল্পে ভাঙ্গিতে লাগিলাম। একদিনে একখানি ইট ভিত্তি হইতে খুলিলাম। পরদিন একটী স্ত্রীলোক আসিয়া কহিল, "মহাশয়! আমি আপনার ছায়ার মত সহকারী রূপ কার্য্য করিব। দয়া করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন। আমার সাবল আছে।"

"মন্দ কি! শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার হইবে।" এই জন্য তাহাকে আমার অংশীদার করিলাম! বিশ বৎসর আমরা দুই জনে কঠোর পরিশ্রমে তবে উদ্ধার হইলাম! আলস্য করিলে শত বর্ষেও কিছুই হইত না। সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

এইরূপ দুর্ভাবনা-ময় কারাগারে পড়িয়াছি, ইহা সকলেই ভাবিতে হইবে। যত ভাবিবেন, ততই জানিবেন, পথ মুক্ত! "ভারি অভাব! ভারি অভাব! পয়সা চাই, নচেৎ নিস্তার নাই!" এইটুকু যেমন বোধ হইবে, তৎপরেই ঠিক উহা পাইবেন। কেবল পয়সা বলিয়া নহে, সব বিষয়েই এই। "তন্ময়" হওয়া চাই; নতুবা কিছুই হয় না। পশু পক্ষী সঞ্চয় করে না, কিন্তু অভাব হইলেই কোথায় উড়িয়া যায়! তাহদের কি জ্ঞান নাই? আকাশ-পথে উড়িয়া মাঠের দিকে চায়, তাহাতেই পায়! জীবন বাঁচায়!! উড়া চিন্তা লইয়া ছুট, কিন্তু কাজের মাঠে নজর রাখ। নিশ্চিতই পাইবে। দারিদ্রতা ঘুচিবে।

রূপচাঁদ দেশের কথা বেশ বুঝে! কাহার বাড়ী সে স্থায়ী নহে। অর্থাৎ এক বাটীতে কখনই সে দশবৎসর বিশবৎসর থাকে না। দেঁতর হাসি হাসে, পথে পথে মেশে! বাটীর দিকে না ঘেঁসে!! রূপচাঁদ সকলকেই ভালবাসে। কেবল আল্‌সে কুড়ে, মিথ্যাবাদীর উপর তাহার বড়ই ঘৃণা।

কলাই করা জার্ম্মনী গ্ল্যাস; প্রত্যেকের দাম ॥০ আট আনা। কলিকাতা হইতে রূপচাঁদ এই গ্ল্যাস কতকগুলি লইয়া গেল, গ্রামে এক খেলা আরম্ভ হইল। রূপচাঁদ প্রচার করিল,—দুইজন গ্রাহক দুইটী গ্ল্যাস ১॥০ টাকায় লইলে সে একটা গ্ল্যাস বিনামূল্যে পাইবে। তৎপরে তাহার গ্রাহক দেড় টাকা জমা দিলে, সেও একটা গ্ল্যাস পাইবে। অর্থাৎ রামু শুনহ হে! তুমি দুইটী গ্ল্যাসের গ্রাহক দেখ, দুইটীর দাম দেড়টাকা তুলিয়া দাও, আমি তোমায় একটা গ্ল্যাস দিব। তৎপরে রামুর গ্রাহক শামু এবং মাধব, ইহারা দুইজন আবার পরস্পরে দুইটী করিয়া গ্ল্যাস বিক্রয় করিয়া দাম জমা দিলে, যে অগ্রে জমা দিবে, সেই অগ্রে ১টা গ্ল্যাস বিনামূল্যে পাইবে। কেহই ঠকিবে না। ইহা নীলামের খেলা নহে। সকলেই বিনামূল্যে একটা গ্ল্যাস পাইবে। আমি দুইটী গ্ল্যাস বিক্রয় করিয়া দিলাম, একটা বিনামূল্যে পাইলাম। এই ইহার সহজ কথা। কিন্তু দুইটার দাম অগ্রে পকেট হইতে দিতে হইবে, তৎপরে চেষ্টা করিয়া বিক্রয় করিতে হইবে। এইরূপে তোমার নিকট হইতে অপরে লইলেই তোমার দাম উঠিল এবং তুমি ১টা গ্ল্যাস বিনামূল্যে পাইলে। তাহার পর তাঁহার নিকট হইতে অপর লোক লইলেই দাম উঠিল, অথচ তিনি ১টা গ্ল্যাস বিনামূল্যে পাইলেন। এইরূপ ক্রমে গ্রাম-ময় যত কৃষক এবং কৃষক-পত্নীরা পর্য্যন্ত এই খেলা খেলিতে লাগিল। রূপচাঁদের গ্ল্যাস ফুরাইল। কলিকাতা হইতে আরও দুইবার গ্ল্যাস চালান হইল। রূপচাঁদের এক বন্ধু কহিলেন "এ ব্যবসায়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কোথায়?" রূপচাঁদ হাসিয়া বলিল "লোক বিনামূল্যে শুনিলে তাহা যে দ্রব্য হউক লইতে চায়।" সকলেই পাইবে, কেহই ফাঁকিতে পড়িবেন না, শুনিলে আরও আগ্রহ প্রকাশ করে, বস্তুতঃ ইহাও একরূপ দালালী করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ কাজে যে আল্‌সে কুড়ে, সে গ্রাহক না জুটাইতে পারিলেই তাহার ক্ষতি, কেননা টাকাটা অগ্রে দিয়াছে। আল্‌সে ভিন্ন কখনই সে ঠকিবে না। আল্‌সে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই এ খেলার সৃষ্টি করিলাম। লোকের অভাব বুঝিয়া যে কোন গ্রামে যে কোন দ্রব্য লইয়া এ খেলা করা চলিবে। কিন্তু দেখিও, এই খেলা খেলিয়া যেন বিদেশীরা ভারতের টাকা তাহাদের ঘরে লইয়া না যায়। সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়া সাহস এবং ধৈর্য্য ধরিয়া কর্ম্মক্ষেত্রকে জীবন-ক্ষেত্র করিতে পারিলেই তাহাই "বড়লোক হইবার উপায়।" তুমি হও, আমি খেলিব; বিদেশীর সঙ্গে কখনই এ খেলা খেলিব না।

মহাত্মা কৃষ্ণ পান্তি।

এই মহাপুরুষ এক সময় হাটখোলার কর্ত্তাবাবু ছিলেন। ইনি ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ১১৫৬ সালে রাণাঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম সহস্ররাম পান্তি। সহস্ররাম অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। হাটে পান বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই জন্য সাধারণে ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া "পান্তি" বলিয়া সম্বোধন করিত। নচেৎ ইহার উপাধি ছিল পাল। ইহারা জাতিতে তেলি। যাহা হউক, পিতার উক্ত অবস্থায় কৃষ্ণ পান্তি জন্ম গ্রহণ করেন। এইজন্য ইহারও বাল্যকালের উপাধি ছিল পান্তি। বালক কৃষ্ণ পান্তি ১০।১২ বৎসর বয়সের সময় রাণাঘাটের তিন ক্রোশ দূরে গাংনাপুরের হাট হইতে চাউল, ছোলা ইত্যাদি অতি যৎসামান্য দ্রব্য নিজে মস্তকে করিয়া আনিয়া, তাহা রাণাঘাটে বিক্রয় করিতেন। এই কার্য্য ২।৩ বৎসর করাতে কিঞ্চিৎ মূলধন হইলে তদ্দ্বারা কয়েকটি বলদ ক্রয় করেন। এই বলদের দ্বারা আঁহুল কায়েত পাড়ার তিলিদের নিকট হইতে চাউল, ধান ক্রয় করিয়া বলদের পৃষ্ঠে দিয়া নিজে বলদ তাড়াইয়া রাণাঘাটে আনিয়া তাহা বিক্রয় করিতেন। এ কার্য্যও অনেক দিন করিয়াছিলেন।

এই কার্য্যের সময় ইহার জীবনে এক অঘটন ঘটনা সংঘটিত হইল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ছোলা দুষ্প্রাপ্য হয়। একজন হাটখোলার মহাজন এ কারণ রাণাঘাটে ছোলা ক্রয় করিতে গমন করেন। কৃষ্ণ পান্তির সহিত এই সূত্রে তাঁহার আলাপ হয়। মহাজন ইংরাজের সিপমেণ্টে ছোলা দিবেন বলিয়া কনট্রাক্ট লইয়া ছিলেন। কিন্তু কলিকাতা হইতে তাহা ভুক্তান দিতে না পারায়, মহা দুর্ভাবনায় পতিত হন। ইহা তিনি কৃষ্ণ পান্তির নিকট অকপটে প্রকাশ করেন। কৃষ্ণ পান্তি বলেন "আমি ছোলা দিব; কিন্তু টাকা আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে দিতে হইবে। আমার টাকা নাই যে, উহা ক্রয় করিয়া আপনাকে দিয়া পরে আপনার নিকটে টাকা লইব।" যুবক কৃষ্ণ পান্তির সাহস দেখিয়া মহাজন বলেন, "আমি মাল পাইলেই সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিব, কিন্তু তুমি এত মাল কোথায় পাইবে, বিশ্বাস হয় না। অতএব তুমি আমার সঙ্গে চুক্তিপত্র বা কনট্রাক্ট লিখিয়া দিতে পার?" সৎ সাহসী যুবক তাহাতে সম্মত হইলেন। মহাজন বলিলেন "আমি ইংরাজের সঙ্গে কনট্রাক্ট করিয়া মহা বিপদে পড়িয়াছি। মাল না দিতে পারিলে তাঁহারা আমার নিকট ক্ষতি পূরণ টাকা ধরিয়া লইবেন। আমার টাকা আছে, উহা কষ্টের সহিত ধরিয়া দিতে পারিব; কিন্তু তুমি কনট্রাক্ট করিলে যদি মাল দিতে না পার, আমি তোমার নিকট ক্ষতি পূরণ স্বরূপ টাকা পাইব কোথায়? তোমার ত টাকা নাই।" বালক এবং যুবকের কার্য্য দেখিয়া তাহার পরিণামে কি হইবে, অনেকটা বুঝা যায়। বীজ অঙ্কুরিত হইলে, তাহা কি গাছের অঙ্কুর জানা যায়। হিন্দুবীর শিবজীর পিতা সৈনিক পুরুষ ছিলেন। বালক পিতার নিকট কেল্লায় থাকিত। সেই সময় বালক শিবজী পিতাকে বলিত, "কি ক'রে রাজা হওয়া যায়? বাবা তুমি রাজা হও না; যুদ্ধ করিয়া এ কেল্লা লও না; দল বাঁধ না।" ইত্যাদি ভাবে বালকের মত কথাই বালক বলিত এবং রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধের কথা গুলি সে মন দিয়া শুনিত। এই বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইলে ভারত চমকিত হইল। মহাবীর নেপোলিয়ন বাল্যকালে কাগজে কেল্লা আঁকিত, ইহা তাঁহার খেলা ছিল। আমাদের কৃষ্ণ পান্তির কথাও বালকের কথা বলিয়া মহাজন প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু যিনি ভবিষ্যতে ব্যবসায় বীর হইবেন, তিনি উহা গ্রাহ্য করিবেন কেন? গাছ অবাধে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। স্রোত আপন মনে অতি বেগে সমুদ্রের দিকে ছুটিল; তাহাকে ধরে কে, থামায় কে? সেই "একগুঁয়ে" বুদ্ধি গোঁ ভরে ছুটিয়াছে, কাহার কথা শুনে না। ক্ষুধার্ত্ত সিংহের মুখের মাংস কে কাড়িয়া লইবে? সে সাহস কাহার? টাকার কষ্ট কৃষ্ণ পান্তির শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে উপলব্ধি হইতেছে, সামান্য টাকার সংসারে সেই স্বর্গীয় দেবতা এখানে আসিয়া মস্তকে মোট বহিতেছে, সামান্য শ্রমজীবির মত গরু হাঁকায়! ১ মণ ২ মণ চাউল, ছোলা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার সম্মুখে আজ হাজার হাজার মণ ছোলা বিক্রয়ের কনট্রাক্ট! ক্ষুধার্ত্ত সিংহের সম্মুখে আজ মহা শিকার! সেকি তাহা ছাড়িতে পারে? যুবক সিংহ-গর্জ্জনে বলিল "আপনারা মহাজন, বড় বাড়ীতে থাকেন, দুঃখী লোকে কাজ করে, আপনারা তাহার সত্ত্ব ভোগ করেন, তাহাদের উপর প্রভুত্ব করেন; আমি যেমন বলদের উপর প্রভুত্ব করি, আপনারা তেমনই ঘরে বসিয়া বিনা-দড়িতে শ্রমজীবিদিগের উপর বলদের মত প্রভুত্ব করেন

মাত্র। আমি বলদ লইয়া দেশে দেশে যাই, কিন্তু আপনারা বলদের সঙ্গে দেশে দেশে যান কি? নিশ্চিত যান না, তাই আজ ভাবনায় পতিত। দ্বিতীয়তঃ এই চক্ষুর উপর সবই আছে। দেখিবার তারতম্যেই মানুষের উন্নতি অবনতি! পরমেশ্বরের নিকট টাকা নাই, তাই তাঁহার রাজ্যে সুখ দুঃখ নাই। আমি সে রাজ্যেরও সংবাদ জানি। এই গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাটী গিয়া তাঁহাদের তামাক সাজিয়া দিই এবং সে রাজ্যের কথা শুনি। তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বরের নিকট টাকা নাই, তাহা থাকিলে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি ভাল লোকদিগকে অগ্রে তাহা দিতেন। এ দেশে সদসৎ ব্যক্তি বুঝিয়া তাহার টাকা হয় না। অসৎ কসাই এবং চোর ডাকাইত প্রভৃতি নিষ্ঠুর জীবেরও টাকা হইতে পারে। এইত আমার ধারণা। আপনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের অবস্থা জানেন কি? আপনার বলদেরাও (গোমস্তারা) তাহা জানে না। আমি তাহা জানি, অনেক স্থানে নিজে যাই কিনা? আপনি দুর্ভাবনায় পীড়িত হইয়াছেন, ছোলা দিতে পারিবেন না বলিয়া। অপর এক জন মহাজনের ছোলা বিক্রয় হয় না বলিয়া, তাহার ছোলায় পোকা লাগিতেছে, সেও আপনার মত ব্যাধিগ্রস্ত! দু'য়ের ব্যাধি এক। একজন অতিরিক্ত ভোজন করিয়া উদরাময় রোগগ্রস্ত, আর একজন না খাইতে পাইয়া উদরাময় রোগী। ঈশ্বরের নিকট টাকা না থাকিলেও তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বত্রই সমান। তিনি সব দেখিতে পান, মানুষ তাহা পায় না। তাই দরিদ্র দেখিলে তিনি এইরূপ ২।১ স্থান দেখাইয়া দেন, তাহাতেই মানুষ "মানুষ" হইয়া যায়। আমাকে তিনি কৃপা করিয়া আপনার ব্যাধি অদ্য দেখাইলেন এবং তাহার (অপর মহাজনের) ব্যাধি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছেন, অনুকূল এবং প্রতিকূল দুই পাইয়াছি। আপনি যেমন অকপটে আপনার ইংরাজী কনট্রাক্টের দৌর্ব্বল্য জানাইয়াছেন, আমিও তেমনই আমার দরিদ্র-দৌর্ব্বল্য অকপটে বলিয়াছি। ফল কথা, আমার কিছু চাই, তবে আমি সে মহাজন দেখাইয়া দিব।"

মহাজন যুবকের কথা শুনিয়া বলিলেন "আচ্ছা তুমি আমার সঙ্গে চুক্তিপত্র লিখ।" ব্যবসায়ী যুবক বলিল, "অদ্য আপনি এখানে থাকুন, কল্য আমি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিব। আপনি ভাল ছোলা কি দরে লইতে পারেন?" উত্তরে মহাজন বলিলেন "১॥০ টাকা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত।"

যুবক সেদিন কলিকাতার মহাজনকে তথায় থাকিবার বাসা আদি স্থির করিয়া দিয়া আড়ংঘাটায় গমন করিলেন। সে সময় উক্ত স্থানে "মহান্ত" নাম ধারী কোন ধনীর এক সুবৃহৎ গোলদারীর কাজ ছিল। তাঁহার অনেক ছোলা গ্রাহক অভাবে গুদামে বহুদিন হইতে মজুত ছিল। সে ছোলার কতক কতক পোকাও লাগিয়াছিল। কৃষ্ণপান্তি তাহার কথামত দুই দশমণ লয়েন, সেইরূপ গ্রাহক হইয়া গিয়া, মহাজনকে বলিলেন "দেখুন, আমি দশমণ ছোলা লইব, কিন্তু উহার পোকা ধরা বাছাই করিয়া দিতে হইবে।" উত্তরে মহাজন বলিলেন "তা'কি হয়, তাহা হইলে পোকাধরা ছোলা আমাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। কে উহা লইবে? ভাল মন্দ মিশালে বরং চলিয়া যাইবে। আপনি দরে কমান, কিন্তু বাছিয়া দিব না, এবং বাছাতে গেলে অনেক খরচ।" কৃষ্ণপান্তি বলিলেন, "খরচের জন্য বাছাইবার আপত্তি কি? ভাল মাল পাইলে আমি দর বেশী দিব।" উত্তরে মহাজন বলিলেন "কত দর দিবে? এক টাকা মণ দিবে?" "বারআনা মণ লইতে পারি।" উত্তরে মহাজন বলিলেন "তৎপরে পোকা ধরা গুলা কি হইবে?" "উহাও আমি লইতে পারি, কিন্তু কল্য আসিয়া বলিব।" উত্তরে মহাজন বলিলেন "উহা কি দরে লইতে পার?" "আপনি বলুন!" "দেখ! খুব ভাল বাছিয়া বার আনাতেই দিতে পারি। আর পোকা ধরা ছোলা ।০ আনা মণ লইতে পারিবে?" উত্তরে কৃষ্ণপান্তি বলিলেন "না মহাশয়! দুই আনা মণ লইতে পারি, কিন্তু কল্য ঠিক কথা বলিব। আর এরূপ বাছিয়া দিলে, ক্রমে ক্রমে টাকা দিয়া আমি ২।১ মাস মধ্যে আপনার গুদামের সমুদয় ছোলাই লইব।" ইহা শুনিয়া মহাজন হাসিল। তখন আড়ংঘাটা হইতে কলিকাতা টেলিগ্রাফের পথ নহে। পত্র লিখিলে আসিতে যাইতে ৪ দিন সময় লাগে। বরাবর দশমণের গ্রাহক যদি গুদামের সমস্ত মাল চাহে, তাহা হইলে, আমরা একটু ইতস্ততঃ করিয়া উহার তল দেশের সংবাদ লই। কলিকাতা তল দেশ হইলে, তৎক্ষণাৎ আত্মীয়ের নিকট দর জানিবার জন্য টেলিগ্রাফ করি। কৃষ্ণ পান্তির তলদেশ রাণাঘাট; তথায় এমন কোন মহাজন ছিল না যে, তাঁহার যত ছোলা সব লইতে পারে। তাহা হইলে এতদিন মাল বিক্রয় হয় নাই কেন? তাই মহাজন হাসিয়া বলিল "আচ্ছা তাই হবে!" উত্তরে কৃষ্ণ পান্তি বলিল "এজন্য লেখাপড়া করে দিতে হবে। আর কাহাকেও আপনি যে দর হউক, বিক্রয় করিতে

পারিবেন না।” মহাজন স্বীকৃত হইলেন, মনে ভাবিলেন, লইতে পারিবে না। কনট্রাক্ট করিলেন না। তখনকার মহাজনের কথাই বেদবাক্য ছিল। সহস্র কণ্ট্রাক্ট করিলেও ব্যারিষ্টারী বক্তৃতায় এখন তাহারও গোলযোগ হয়; কিন্তু তখনকার কথায় কোটিপতি মহাজন যদি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পথের ভিখারী হইবেন, ইহাও বুঝিতেন, তবু মিথ্যা কথা বলিতেন না। এখন যে এরূপ মহাজন নাই, তাহা নহে; কিন্তু হায়! ইংরাজী বিদ্যার গুণে লোকে সভ্য হইয়াছে বলিয়া এ শ্রেণীর মহাজন প্রায় তিরোহিত! যাহা হউক, কৃষ্ণপান্তি রাণাঘাটে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত মহাজনকে সমুদায় কথা খুলিয়া বলিলেন এবং ইঁহার সঙ্গে ভাল ছোলা ২৲ টাকা মণ, মধ্যম ছোলা ১৷৷০ টাকা মণ এবং পোকাধরা ছোলা ।৵০ আনা মণ কনট্রাক্ট করিলেন। বিক্রেতা আড়ংঘাটার মহাজনের সঙ্গে মৌখিক চুক্তি হইল, ভাল ছোলা ৮০ আনা মণ এবং পোকা ধরা ছোলা ৵০ আনা মণ। এই কার্য্য করিয়া কৃষ্ণপান্তি ৭৭৫০৲ টাকা লাভ করেন! তৎপরে এই টাকা লইয়া টালা কোম্পানীর আফিসে নীলামের দ্রব্য খরিদ বিক্রয় আরম্ভ করেন। অদ্যাপি এ শ্রেণীর ব্যবসায়ী কলিকাতার ছোট আদালতে এবং এক্সচেঞ্জ আফিসে দেখা যায়। এ কার্য্য করিয়াও পান্তি মহোদয় কিছুটাকা উপায় করেন। তৎপরে লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তখন যে কেহ লবণের ব্যবসায় করিয়াছিলেন, তিনিই বড়লোক হইয়াছেন। তখন লবণ-ব্যবসায়ে এখনকার মত সুবন্দোবস্ত ছিল না; তখনকার নুনের ব্যবসায়কে “লুণ্ঠন ব্যবসায়” বলা হইত। যাহা হউক, পান্তি মহাশয় কলিকাতা হইতে নৌকা বোঝাই করিয়া লবণ লইয়া মফঃস্বলে নিজে সেই নৌকায় যাইয়া বিক্রয় করিতেন। ইহাকে “চালানী কাজ” বলে। ইহাতেও বিস্তর টাকা লাভ করেন। ক্রমে মুঙ্গের, পাটনা, দ্বারভাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানে লবণ লইয়া যাইতেন এবং তথাকার শস্য আনিয়া কলিকাতায় হাটখোলায় বিক্রয় করিতেন। কাজ বৃদ্ধি হইল। লোক রাখিলেন। হাটখোলায় গদী করিলেন। এই সময় ইনি হাটখোলার মহাজনদিগের শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছিলেন। ১২০৬ সালে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের পরামর্শে ইনি রাণাঘাট ক্রয় করেন। এইবার সকলেই “পান্তি” বলিতে লজ্জিত! এইবার হইতে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলেই ইহাকে “পাল মহাশয়” বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ইঁহার সময় রাণাঘাটে সুরম্য উদ্যান শ্রেণী, সুবৃহৎ

নিজের আবাসবাটী এবং গ্রামস্থ প্রায় সকলকেই অর্থ সাহায্য করিয়া সুন্দর সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিতে লাগিলেন। অতএব রাণাঘাটের অধিকাংশ বাটী ইঁহার সাহায্যে নির্ম্মিত। ইহার গোলাবাটী, অশ্বশালা, বাঁধা ঘাট ইত্যাদির জন্য রাণাঘাটের অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। দরিদ্র পল্লিগ্রাম, ইঁহার কৃপায় নগরের ন্যায় হইল। এই সময় ইঁহার সুনাম চারিদিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল। নিজের বাটীতে দোল, রাস, দুর্গোৎসব হইতে লাগিল। গ্রাম গ্রামান্তরের শত শত দীন দুঃখী অন্ন পাইতে লাগিল। অর্থের সার্থকতা হইতে লাগিল। কৃষ্ণনগরের রাজা ইঁহার উন্নতি দেখিয়া “চৌধুরী” উপাধি দিলেন। এখন হইতে ইনি এবং ইঁহার বংশধরেরা “পাল চৌধুরী” হইলেন। ইনি সাধারণের উপকারার্থক এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী এবং মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে তিন লক্ষ টাকার চাউল বিতরণ করেন। এই জন্য তখনকার বড় লাট লর্ড ময়রা বাহাদুর ইঁহাকে “পল নাইট্” উপাধি প্রদান করেন। এক্ষণে রাণাঘাটের পাল চৌধুরীর বংশ ভারত-বিখ্যাত। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বর্গস্থ হয়েন। ইনি যথার্থ দেবতা ছিলেন। লীলা করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন।

সংবাদ।

হাবড়া রেল কোম্পানী দ্বারা পাথুরে কয়লা রেল কোম্পানীর দায়িত্বে আনাইলে একমণ কয়লা ৪ শত মাইল পর্য্যন্ত ইংরাজী ১৫ পাই অর্থাৎ বাঙ্গালায় ./৫ পাঁচ পয়সা করিয়া ভাড়া লাগে। ৪ শত মাইলের ঊর্দ্ধে হইলে ইংরাজী ১০ পাই ভাড়া লাগে। তৎপরে ওনার রিস্ক বা যিনি কয়লা পাঠাইবেন, তাঁহার ঝুকি বা দায়িত্বে অর্থাৎ মাল কোন প্রকারে নষ্ট হইলে রেল কোম্পানী ধরিয়া দিবে না, এই রিস্ক নোট লিখিয়া মাল চালান দিলে কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা ভাড়া কম। লোভ না দেখাইলে চুরি করিবার পন্থা হইবে কেন? বোকা ভারতবাসী ইহার মার’ পেচ বুঝিবেনা; শস্তার তিন অবস্থা হয়, ইহা জানিয়াও অর্থদরিদ্র দেশ তবু ঐ কার্য্য করিবে, সে পক্ষে চিন্তা নাই। কম ভাড়ার রেট এইরূপ,—৭৫ মাইল পর্য্যন্ত ১৪ পাই। ৭৫ হইতে ২০০ শত মাইল ১২ পাই। ২০০শত মাইলের উপর হইতে ৪৫০ মাইল ১১ পাই। ৪৫০ শত মাইলের পর হইতে প্রতি ১০০ শত মাইলে ৯ পাই। ইহা মণ প্রতি এবং ইংরাজী পাই জানিবেন। ইংরাজী ৩ পাই বাঙ্গালায় ৫ এক পয়সা হয়।

ভারতের মধ্য প্রদেশ সমূহের অনেক স্থানেই লৌহ পাওয়া যায়। এক কোটি টাকা মূলধনে ইহার রীতিমত কারখানা খুলিলে, বিদেশী লৌহ ভারতে আমদানী বন্ধ হইয়া বরং ভারতের লৌহ বিদেশে যাওয়া সম্ভব হয়। গুজব, এই জন্য মিষ্টার জে, এন, তাতা এক সুবৃহৎ কারখানা খুলিবেন। তিনি ভারতের লৌহের নমুনা জার্ম্মণ এবং আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন। তত্রত্য ধাতুতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, “ভারতীয় লৌহের মত উৎকৃষ্ট লৌহ পৃথিবীতে অপর কোথাও পাওয়া যায় না।”

বিগত ৯ই আগষ্ট আমাদের রাজরাজেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের শুভ অভিষেক উৎসব বিলাতে সমাধা হইয়াছে। ঐ দিন হইতেই তাঁহার মুখাঙ্কিত ডাক টিকিট ভারতের সমুদয় ডাক ঘরে প্রচারিত হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গত বৎসর নীলের আবাদ হইয়াছিল ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ১ শত ৩৯ বিঘা জমিতে। এবৎসর হইয়াছে ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৮ শত বিঘা ভূমিতে।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
২য় খণ্ড ; ৭ম সংখ্যা। ভাদ্র, ১৩০৯ সাল।

খাগুয়ার চিনির কারখানা।

কলিকাতা “Statesman” সংবাদ পত্রে যশোহর জেলার কোটচাঁদপুরের চিনি ব্যবসায় সম্বন্ধে ২০শে নভেম্বর তারিখের পত্রে এরূপ লেখা আছে যে, কোটচাঁদপুরের কারখানা অনেক পরিমাণে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, গত বৎসর হইতে কাঁচা চিনি অর্থাৎ “র-সুগারের” দর ৪।০ হইতে ৪৮০ অপেক্ষা অধিক ছিল না। অন্ততঃ ২ মণ সার গুড়ে বোধ হয় ১ মণ “র সুগার” হয়, বাকী ২৫।৩০ সের মাৎগুড় বা তামাকমাখা গুড় হয়। ইহা যদ্যপি ঠিক হয়, তাহা হইলে ১॥০ বা ঊর্দ্ধসংখ্যা ২৲ টাকা মণ গুড় না হইলে ৪৲ বা ৪॥০ টাকাতে কাঁচা চিনি বেচিয়া লাভ করা যায় না। আপনি আমাকে পূর্ব্বে এক পত্রে লিখিয়াছেন যে “যদি গুড়ের মণ ১৲ টাকা হয় এবং কাঁচা চিনির মণ ৪৲ টাকা হয়, তাহা হইলে বিদেশীয় চিনির সঙ্গে কিছুক্ষণ প্রতিযোগিতা করা চলিবে।” “মহাজনবন্ধুতে” এই বিষয়ের অনেক কথা লিখিত আছে। আমি এখনও আপনাদের মাসিক পত্র সকল পাই নাই; প্রত্যাশায় আছি। পাইবামাত্র সাদরে তাহা পাঠ করিব। আমার এ বিষয় জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহের কারণ এই যে, আমি বহুকাল বঙ্গদেশে বাস করিয়াছি, এখনও তথায় আমার বাটী ঘর-বিষয়াদি আছে; সুতরাং সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতে হয়, কিছু সাধারণ প্রকার ‘দোলো’ অর্থাৎ “র-সুগার” ৬॥০ হইতে ৭॥০ পর্য্যন্ত দরে চিরকাল বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। সমস্ত ভারতবর্ষে আজকাল কাঁচা ও পাকা চিনির একই দর বলা যায়। সমস্ত মধ্যপ্রদেশ (১৮ জেলা) মধ্যভারতের অবস্থা আমি বিশেষরূপে জানি। এদেশে বিদেশীয় চিনি অর্থাৎ যে সকল চিনি জাহাজে আসিয়া বোম্বাই বন্দরে আমদানী হয়, প্রায় ৮॥০ টাকা হইতে ১০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। সেই প্রকারে পরিষ্কার কাশীর চিনি ১০৲ টাকা হইতে ১২॥০ টাকা মণ দরে পর্য্যাপ্ত বিক্রয় হইতেছে। কিছু জিয়াদা মহার্ঘ্য হইলেও দেশী সাদা চিনির আদর বেশী, ও বিক্রয়ও অধিক। তাহার

বিশেষ কারণ আছে, সে কথা পরে অন্য সময়ে আপনার সংবাদ পত্রে লিখিব। ফল কথা এই যে, বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভাগে, সমস্ত ভারতখণ্ডে ৪॥০ টাকা কেন, ৬৲ টাকা দরে "কাঁচা চিনি" পাইলে, বোম্বাইয়ে বিদেশীয় চিনির আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবে। বিশেষ অনুভব ও অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে, ৪ মণ "র-সুগারে" অতি সুন্দর, সাদা পাকা চিনি ৩ মণ প্রস্তুত করা যায়। বাকী ১ মণ মাল হইতেও কিছু পরিমাণে চিনি পাওয়া যায়। ৩ মণ ভাল চিনি (দেশী চিনি) যদ্যপি ১০৲ টাকা মণ হিসাবে বিক্রী করা যায়, তাহা হইলে সে মাল বাজারে বোধ হয় এক দণ্ডও পড়িতে পায় না; আর বোম্বাই হইতে চিনির রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। অতএব ৪ মণ "র-সুগার" হইতে প্রায় ৩৪।৩৫৲ টাকা বাজারে অনায়াসে বিক্রয় করিয়া পাইলে, ঐ "র-সুগার" ৭৲ টাকা মণ হইতে কমে বিক্রয় হওয়া সম্ভব নহে কেন; না ১৭৲ টাকার কিংবা ১৮৲ টাকার মাল হইতে রিফাইন দ্বারা তাহা হইতে ৩৪।৩৫৲ টাকা উপার্জ্জন করা সহজ কথা নহে। ইউরোপীয় বিট্-সুগার-বিক্রেতারাও স্বপ্নেও এ পরিমাণে লাভের আশা করিতে পারেন না।

বঙ্গদেশে সুখচর প্রভৃতি অনেক স্থানে "র-সুগার" হইতে অতি কদর্য্য প্রণালী দ্বারা ও বহুব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া "দোবারা" অর্থাৎ এক রকম "রিফাইন সুগার" প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দেখিয়াছেন ও বিশেষ রূপে জানেন, প্রত্যেক মণ "র-সুগার" অর্থাৎ "দোলো" হইতে প্রায় ৩০ সের দোবারা চিনি প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশের খেজুর গুড়ের অবস্থার কথা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে শুষ্ক প্রদেশে যে খেজুর গুড় প্রস্তুত হয়, তাহার অর্দ্ধেক অংশ "র-সুগার" অর্থাৎ দানাদার ঈষৎ লাল চিনিতে পরিপূর্ণ। জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিয়া এক মাস কিংবা দেড় মাস কাল মাটীর ঘড়া বা নাগরীতে রাখার পর ঐ গুড় (Centrifugal) অর্থাৎ "টুরবীন" মেসিন দ্বারা চালাইলে প্রায় শত করা ৬০ হিসাবে সুগারের দানা সকল একবারে ৫ মিনিটে বাহির হইয়া আইসে। আপনার পাঠকগণ সাধারণতঃ Centrifugal or Turbine দ্বারা "র-সুগার" প্রস্তুত প্রণালী জানেন কি না বলিতে পারি না। ফলতঃ এ কথা প্রামাণিক ও সম্পূর্ণ সত্য অনুমান করিলে এই স্থির হইবে যে, ৫ মণ এদেশীয় খেজুর গুড় হইতে ৩ মণ "র-সুগার" ও ২ মণ রাব অর্থাৎ মাতগুড় পাওয়া যাইতে পারে। ৪৲ টাকা মণ গুড় হইলেও ৩ মণ "র-সুগার" হইতে ১২৲ টাকা ও ২ মণ মাতগুড় হইতে ৫৲ টাকা, মোট ১৭।১৮৲ টাকা সহজে পাওয়া যাইতে পারে। এ প্রদেশের বাজারে ৪, ৪॥০, ৫, কখন কখন ৫॥০ ও ৬৲ টাকা মণ দরে গুড় বিক্রয় হইয়া থাকে। সচরাচর দর ৪৲ হইতে ৫৲ টাকা। আমি ২১ বৎসর এদেশে আছি—দক্ষিণ প্রদেশের অনেক স্থানেই ও অনেক জিলাতে ভ্রমণ করিয়াছি ও সেখানকার অবস্থা বিশেষ অবগত আছি. গুড়ের দাম ৪৲ টাকার কম আমি কখনই দেখি নাই ও এদেশের বাজারের কেহই শুনেন নাই। শেষ বক্তব্য এই যে এ দেশে গুড় ও চিনির পর্য্যাপ্ত খরচ, এবং বাজারেও তাহা অতি প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। আপনার পত্রের মর্ম্মে জানা যাইতেছে যে, আপনারা গুড় ও চিনি সম্বন্ধে অনেক কথা "মহাজন-বন্ধু"তে লিখিয়াছেন, তাহা ভালরূপে পাঠ করিয়া পরে অন্যান্য মন্তব্যের কথা প্রকাশ করিব। ইতি—

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

উকীল, খাণ্ডুয়া, মধ্যপ্রদেশ।

মন্তব্য।—ইহাঁকে চিনি-বিষয়-লিখিত মহাজন-বন্ধু পাঠ করান হইয়াছে। বঙ্গবাসী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে এই কারখানার জন্য হরিদাস বাবুর জয়জয়কার বিঘোষিত হইয়াছিল! ইনি ৭৲ টাকা মণ দলুয়া বা "র-সুগার" বিক্রয় করিবেন। এ জন্য ইহাঁকে জানান হয় "আপনি চীন, মারিশ কিম্বা জর্ম্মন-বিট্ (উহারা ৩।৵০ আনা হন্দর প্রতি ডিউটী দিয়াও) ৭৲ টাকা মণ (উৎকৃষ্ট পরিষ্কার পাকা দানাদার চিনি) বিক্রয় করুন না, আমরা উহা কলিকাতা হইতে আপনার তথায় পাঠাইতে প্রস্তুত আছি।" তৎপরে ইনি নিজে আমাদের আফিসে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কারখানা বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। এ কাজে ইহাঁর অপরিসীম যত্ন থাকিলেও কিছুই করিতে পারিতেছেন না। এ বৎসর কলিকাতায় ৪৲, ৩৵০ আনায় "র-সুগার" বিক্রয় হইয়াছে! জাবা পোর্টের অপরিসীম চিনি এ বৎসর আমদানী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এত দিন, অত্যধিক পরিমাণে জাবার চিনি কলিকাতায় আসে নাই। ভারতের কাঁচা চিনির দর অপেক্ষা জাবার কাঁচা চিনির দর অনেক কম নিশ্চিত; এ জন্য টর্ণার মরিসন কোম্পানীর কলে, জাবা হইতে কাঁচা চিনি আনিয়া এখানে রিফাইন করা হয়। এদেশীয় কাঁচা চিনি না লয়েন, এমন নহে। কিন্তু বহুদিন হইতেই তাঁহারা জাবা হইতে চিনি আনাইয়া তদ্দ্বারা 'গ্রে'মার্কা চিনি ইত্যাদি

করিতেছেন। ভারতের কাঁচা চিনির কাজ চলিবে না। বিটের ডিউটী যতই হউক, উহা বন্ধ হইয়া' গেলেও, মারিশ, চীন, জাবা এবং মিসরের চিনির দৌরাত্ম্যে ভারতের চিনিকে আর ঘাড় তুলিতে হইবে না। পূজনীয় হরিদাস বাবুর চিনির কারখানা কি আবার চলিতে দেখিতে পাইব না? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁহার কারখানা আবার চলিতে থাকুক। মঃ বঃ সঃ।

চা।

সপ্তম অধ্যায়—পাতা শুকান।

এই কার্য্যটী চা-বাগানের কুলিদের পক্ষে বড়ই কঠিন কাজ। কারণ সর্ব্বদাই আগুনের নিকট থাকিয়া অনেক বিষয়ে সাবধান হইয়া কাজ করিতে হয়। পূর্ব্বে আরও কঠিন ছিল, এখন ইহা অনেক বাগিচায় কলের সাহায্যে হইতেছে।

পাতার রং হইলে মুঠি ভাঙ্গিতে হয়। যে কোন উদ্ভিজ্জ-পত্র যদি কিছুক্ষণ হস্তে রগড়ান যায়, তাহা হইলে উহা নেকড়ার মত হইয়া পড়ে এবং উহা হইতে রস বাহির হয়। চা-পাতার রোল করা এই প্রক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। পরন্তু এই অবস্থায় রাখিয়া দিলেই উহা হইতে তীব্রগন্ধ বাহির হয় এবং পাতার রং তাম্রবর্ণের মত হয়। ইহাকেই "পাতার রং" করা বলা হইয়াছে। পাতা রগড়াইলে উহা গুটাইয়া যায়। যখন পাতার রং হইতে থাকে, তখনও গুটান থাকে। এইবার চালুনীর উপর ঐ গুটান অবস্থা খুলিয়া দিতে হয়, ইহাকেই পাতার মুঠিভাঙ্গা বলে।

এ সময়ও মোটা পাতা বাছা হয় এবং উহার গুটান অবস্থা খুলিয়া চালুনীতে সমভাবে সাজাইয়া দিতে হয়। এই চালুনী সাজানও কঠিন কাজ। কারণ অত্যন্ত স্থূলভাবে সাজাইলে উহা শুকাইতে বিলম্ব হইয়া টক হইতে থাকে। যদি অত্যন্ত পাতলা করিয়া সাজান যায়, তাহা হইলেও আগুনের উত্তাপে চালুনীর ফাঁক দিয়া চলিয়া যায়, অথবা চা-পাতা পুড়িয়া উঠে। অতএব এই দুই দিক বাঁচাইয়া এই কাজটী করিতে হয়। অভিজ্ঞ শ্রমজীবীরা ইহা করিতে পারে। নচেৎ সর্ব্বদা ম্যানেজারকে কুলিদিগের নিকটে থাকিয়া ইহা করাইয়া লইতে হয়।

চা শুকাইবার উনানকে "ডোল" বলে। কারণ ইহা দেখিতে ডোলের মত। গরু ইত্যাদি পশুদিগের মুখ হইতে ছোট গাছ বাঁচাইবার জন্য উহা যে ভাবে বাখারি দিয়া ঘেরিয়া দেওয়া হয়, ঐরূপ আকৃতি দর্ম্মা দিয়া বাঁধা এবং উর্দ্ধদিগের মুখটী চালুনী-বসিতে-পারে-এইরূপ ছুচলা মত। চা গরম বাতাসে শুকাইতে হয় বলিয়া এইরূপ উনান করিতে হয়। এই ডোলের নীচে প্রবল আগুন করা হয়। দর্ম্মার বেড়ার উনানে প্রায় দুর্ঘটনা হয়, উনানশুদ্ধ জ্বলিয়া উঠে। এখনও অনেকানেক বাগিচায় এইরূপ দর্ম্মা-বেড়ার উনান আছে, কেহ কেহ বা করগেটের উনান করিয়াছেন, কাহাদেরও বা ইষ্টক দিয়া ৩।৪ হস্ত উচুভাবে ঐ ডোলাকৃতি উনান। এই উনান পাঁউরুটী করিবার বা কাচ গলাইবার তন্দুর বিশেষ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তবে ওই সকল তন্দুরের ভিতর উষ্ণ বায়ু লইয়া কাজ করা হয়, চা-তন্দুরের উষ্ণ বায়ু বাহির হইয়া যাইবার পথে বা উনানের উর্দ্ধদিকের মুখে চা'র মুঠিখোলা, সাজান পাতার চালুনী রাখিয়া উহা শুকান হয় মাত্র।

এই উনানের উপর চা'র চালুনী রাখিয়া শুকাইবারও অনেক কায়দা আছে! প্রথমে মুটিভাঙ্গা চা'র পাতা সাজান চালুনী একখানি ডালার উপর রাখিতে হয়; ডালা অর্থাৎ বগি থাল্লা বিশেষ। ইহার উপর রাখিবার একটু তাৎপর্য্য আছে, প্রথমতঃ ডালার ধারে চালুনী বসাইলে উহার ভিতর ফাঁক থাকে এবং তাপ কম লাগে বা তাপ ইচ্ছানুসারে শীঘ্র কম বেশী করা চলে। দ্বিতীয়তঃ ডালার উপর বসাইলে আর একটী সুবিধা এই যে, উহা দ্বারা গুঁড়ি চা বাচিয়া লওয়া যায়। প্রথমতঃ ডালার উপর চালুনী বসাইয়া উহাতে গুটাকরা চা-পত্রের মুঠি খুলিয়া কায়দামত সাজাইয়া ডালাখানি উনানের মুখে বসাইয়া চালুনী ক্রমাগত নাড়িতে হয়, এইরূপে চা শুকাইয়া উঠে, তখন উহা হইতে এক প্রকার সুগন্ধি বাহির হয়। এই গন্ধ বাহির হইলেই চা-শুকান হইয়াছে স্থির করা হয়। এইরূপ নাড়াতে চালুনীর গুঁড়ি চা ডালায় গিয়া পড়ে। যত শীঘ্র এবং যত অধিক উত্তাপে চা শুষ্ক করা যায়, ততই ভাল। চা পুড়িবার ভয়ে অল্প আগুনের উত্তাপে আস্তে আস্তে শুকাইয়া লইব ভাবিলে, তাহাতে অধম চা হয়। আবার বেশী উত্তাপে শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিতে না পারিলে উহা পুড়িয়া বা ঝলসাইয়া গেলে, চা'র গুণ আদৌ থাকে না। বাঙ্গালী বাবুরা অধিকাংশই এই পোড়া বা ঝলসান চা খাইয়া থাকেন। উৎকৃষ্ট চা এ প্রদেশে প্রায়ই বিক্রয় হয় না।

তাহার আস্বাদন স্বতন্ত্র। কলিকাতার প্রসিদ্ধ সাহেব এবং রাজা বাহাদুরেরা ইহা ব্যবহার করেন; কিন্তু উহা নামে মাত্র এদেশে বিক্রয় হয়। ইয়োরোপ খণ্ডে ইহার আদর অধিক এবং ঐ সকল দেশে গিয়াই ইহার দর হয়। অর্থাৎ এ চা অধিকাংশই বিলাতে রপ্তানী যায়। বাবুদের পোড়া কপালে পোড়া চা পড়ে, ইহা খাইয়া অনেক ভুঁইফোঁড় ডাক্তার ফোঁড়গণার মত "চা'র উপকার অপকার" লিখিয়া সাদা কাগজে কালী মাখাইয়া থাকেন। উপকার অপকার সমুদয় দ্রব্যেই আছে। আদত দ্রব্য ধরিয়া তাহার উপকার অপকার নির্ণয় ক্ষতিকর নহে। কিন্তু ঝুটা মাল লইয়া গুণ বিচার করা বড় দুঃখের কথা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য হয় না। তুমি যতই চা'র গুণাগুণ লিখ, যে খাইবার, সে খাইবেই!!

চা শুকাইবার সময় এইটী লক্ষ্য রাখিতে হয়, যেন চালুনীস্থ ভিজা পাতায় কালদাগ না পড়ে। ১০।১৫ টা উনানে এইরূপ চা শুকান হয়। সুশিক্ষিত কুলিরা চকিতের ন্যায় এই কার্য্য করিতে থাকে। এ দৃশ্য অতি সুন্দর! পুরারস থাকিতে বরং চা পত্র একটু উত্তাপ সহ্য করে, অর্দ্ধ শুষ্ক চা পত্র আদৌ উত্তাপ সহ্য করে না। এ সময় খুব কম উত্তাপ দিতে হয়। বর্ষাকালে বাতাসে জল কণা থাকে, অতএব বর্ষার সময় এ কাজ প্রায় বন্ধ থাকে। কেন না চা শুষ্ক হইলে, উহাতে সাধারণ বায়ুস্থ জলকণা লাগিয়া চা ভারি হয় এবং চা'র গুণেরও তারতম্য হয়। চা শুষ্ক হইলে সঙ্গে সঙ্গে বাক্স-বন্দী করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা অধিক কাজে হইয়া উঠে না। এ জন্য যত দূর সম্ভব, খুব শুষ্ক বায়ু বিশিষ্ট খট্‌খটে গুদাম ভিন্ন চা রাখা উচিত নহে। বৃষ্টির দিন ত একাজ বন্ধ থাকে। ভারতবর্ষ এই গাছের পাতা বিক্রয় করিয়া বিদেশীর নিকট হইতে অনেক পয়সা পাইয়া থাকেন; ইহা প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীর সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

(ক্রমশঃ)

কালী-পাহাড়ী অঞ্চলে কয়লার খনি।

কালীপাহাড়ী হাওড়া হইতে ১২৯ মাইল। ইহা রাণীগঞ্জ এবং আসেনশোল ষ্টেশনের মধ্যভাগে অবস্থিত এবং এই স্থানেও একটী রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এ অঞ্চলের কালীপাহাড়ীতে ৪টী, মশিলায় ৬টী, ঘুশিকে ৫টী, ডামরায় ২টী,

ভুতডোবায় ৩টী, ডোবালিয়ায় ১টী, নূনেপুলে ১টী, ছাতাপাথরে ১টী, কেশবগঞ্জে ৩টী, এবং বগবাঁদীতে ১টী, সর্ব্বসমেত ২৭টী কয়লাকুঠি আছে। কুঠিগুলিতে সিঁড়িখাদ অল্প, পিটখাদই অধিক। এজন্য এঞ্জিন, বইলার, স্পেশিয়াল পম্প, পিট পান্না, রোপ্, বাউতি, খাদ গাড়ী ভিন্ন পিটখাদে কাজ চলে না। একটী পিটখাদ কাটিয়া সরঞ্জমাদিযুক্ত করিতে হইলে ন্যূনকল্পে ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় পড়ে। ইহার ফেজ পিট সম্বন্ধে জানিবেন, ফেজ বিরহিত পিট্ খাদ সরঞ্জম যুক্ত করিতে অন্ততঃ পোনের হাজার টাকা লাগে। ২৭টী কয়লাকুঠির মধ্যে বাঙ্গালীর ১৪টী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীর ৪টী, ইহুদীর ৪টী, কচ্ছবাসীর ২টী, রাজপুতানাবাসীর ২টী, এবং আর্ম্মেনীয়াবাসীর ১টী কুঠির সত্ত্বাধিকারী। কুঠিগুলির মধ্য দিয়া ই-আই-রেলওয়ে লাইন পূর্ব্ব পশ্চিমে গিয়াছে। লাইনের দক্ষিণ ভাগে মশিলার ৬টী কুঠি, ঘুশিকের ৫টী কুঠি এবং ডামরার ২টী কুঠি সাকল্যে ১৩টী কুঠিতে রন্ধনের জন্য যে প্রকার উৎকৃষ্ট পোড়া কয়লা তৈয়ারি হয়, এরূপ কুত্রাপি হয় না। আবার এই ১৩টীর মধ্যে ডামরার ২টী কুঠির পোড়া কয়লা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অবশিষ্ট ১৪টী কুঠির মধ্যে কালী-পাহাড়ীর ৪টী, ভূতডোবার ৩টী, ডোবালিয়ার ২টী, নূনেপুলের ১টী, ছাতাপাথরের ১টী, কেশবগঞ্জের ৩টী এবং বগ্‌বাঁদীর ১টী কুঠির পোড়া পূর্ব্বকথিত কুঠির পোড়া কয়লা অপেক্ষা অল্পবিস্তর পরিমাণে নিকৃষ্ট। তবে, বাঁকুড়া কোল কোং ডোবালিয়াতে ৩ দাওয়ায় (Seam) কাজ করিতেছেন, তাহাকে ডোবালিয়া দাওয়া (ইতর চলিত ভাষায় ডোবালিয়ার চাল) বলে। কালী-পাহাড়ীতে কিষণ দয়াল এণ্ড কোং এবং কুশডাঙ্গায় বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের খনির দ্বিতীয় স্তরে এই ডোবালিয়ার চালের কয়লা কাটা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ছাতাপাথরের ৪নং পিট, কেশবগঞ্জে গণপত রাম মাড়োয়ারির এলাটী নং পিট এবং এই স্থানের জি, এম, এগ্রীয়েবল কোল কোম্পানির ৩টী পিটের যে স্তরে কাজ হইতেছে, তাহার কয়লা ডোবালিয়া দাওয়ার কয়লার ন্যায়। আবার, পূর্ব্বোক্ত খনি সকলের কয়লা ঘুশিক খনির কয়লার প্রায় সমকক্ষ, তবে কিছু পাথুরে টান্।

রেল লাইনের দক্ষিণদিকস্থ খনিগুলির কয়লা ১১॥০ হইতে ১২ ফিট পুরু এবং অপর দিকের কয়লা ৭ হইতে ৮ ফিট পুরু। কয়লার ঢাল সর্ব্বত্র দক্ষিণ পশ্চিমদিক-বর্ত্তী। শতকরা ৮ ফিট ঢাল হইয়া থাকে। স্থির হইয়াছে যে, মশিলা, ঘুশিক এবং ডাগরা খনিতে এখন যে দাওয়ায় (Seam) কাজ চলিতেছে, তাহাকে ঘুশিক দাওয়া বলে। ইহার নিম্নে ডোবালিয়া এবং কুশডাঙ্গা

নামক আর দুটী দাওয়া আছে। শেষোক্ত দাওয়ার কয়লা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। দামোদর কোল কোং নামক এক ইউরোপীয় কোম্পানির খনি ঘুশিকে ছিল। ইহারা প্রথম দাওয়া কাটিয়া শেষ করিবার পর দ্বিতীয় ডোবালিয়া দাওয়ায় কয়লা কাটিয়া খাদ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান কোল কোং'র খনির একটীতে ডোবালিয়া দাওয়ায় কয়লা কাটা চলিতেছে। দক্ষিণ দিকের আর কোন খনিতে দ্বিতীয় দাওয়ার কয়লা কাটা হয় নাই। বহু গভীর স্থানে কুশডাঙ্গা দাওয়া আছে, বিস্তর ব্যয় করিয়া এ অংশে কাজ করিতে এখনও কেহ সাহসী হয়েন নাই। মশিলার ২টী এবং ঘুশিকের ২টী কুঠির খনিতে কেবল কাঁথি কাটা হইয়া গিয়াছে। ৪টী খনির মধ্যে ১টী মাত্র ইউরোপীয় এবং অপর ৩টী দেশীয় লোকের চালিত ছিল। কিন্তু কাঁথি কাটা এরূপ সতর্কে সম্পাদিত হইয়াছিল যে, ইহাতে একটীও প্রাণহানি হয় নাই। গুঁদ হইতে কয়লা কাটা শেষ হইলে কাঁথি কাটা আরম্ভ হয়। কাঁথি গুলির চতুর্দ্দিকে গড় ১৫ ফিট্ করিয়া রাখা হয়। এই কাঁথিই খাদের অবলম্বন স্বরূপ। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে না রাখিলে খনি পড়িয়া যাইত। ঘুশিকের একটী পিট খাদে পুরাতন কয়লার মলা সঞ্চিত থাকায় ১৮৯৪ সালে অগ্ন্যুদ্গম হয়। এই খাদের সহিত অপরাপর অনেক খাদের যোগ আছে। এজন্য প্রথমোক্ত খনির অগ্নি ইহাকে পোড়াইয়া অন্যান্য খাদের কয়লা দগ্ধ করিতেছে। এই অগ্নি ঘুশিক ও মশিলা কয়লা ভূমির বিস্তর কয়লা নষ্ট করিরা সত্ত্বাধিকারিগণকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। এ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ মিত্র।

উদ্ভিজ্জতত্ত্ব।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—কাণ্ড।

দয়াময় ঈশ্বর এই কাণ্ডের মধ্যেই ভাবী বৃক্ষকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন; তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা একটী মানকচু তুলিয়া আপনাদিগকে দেখাইতেছি।

মানকচুর যে স্থানটী শল্কবৎ দৃষ্ট হয়, তাহাই কাণ্ডগ্রন্থি। তাহার উপরে যে স্থানটীর রং সবুজবর্ণ পত্রের ন্যায়, তাহা ভাবীপত্র ভিন্ন আর কিছুই

নয়। ঐ মুদিত ও লুক্কায়িত পত্রের এক স্থানে একটী চোখ আছে; উক্ত চোখটী পত্রমুকুল বহির্গত হইবার দ্বার ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাহা হউক, মানকচুর ভিতর যেমন ভাবী বৃক্ষকে স্পষ্ট দেখা যায়, সকল বৃক্ষের কাণ্ডে কিন্তু সেইরূপ ভাবী বৃক্ষ দেখিবার তত্দূর সুবিধা হয় না। কারণ, কোন কোন বৃক্ষের কাণ্ড, অতি শৈশবাবস্থা হইতেই কাষ্ঠময় হইয়া পড়ে। উক্ত কাষ্ঠময় কাণ্ডের সর্ব্বনিম্নে যে কোমলতাময় শিকড় থাকে, তাহা দ্বারা উহারা মৃত্তিকারস পানপূর্ব্বক জীবনধারণ করে।

উক্ত কাষ্ঠময় কাণ্ডকে উদ্ভিদ্বেত্তারা "নীরট" কাণ্ড কহেন। যে সকল বৃক্ষের কাণ্ড কঠিন ও কোমলে মিশ্রিত, তাহাদিগকে তাঁহারা কাঠিন্যসংশ্লিষ্ট প্রায়-নীরট কাণ্ড কহিয়া থাকেন। প্রায়-নীরট কাণ্ডের উদাহরণ আর্দ্রক, হরিদ্রা, বনহরিদ্রা প্রভৃতি বৃক্ষের কন্দ। নীরট কাণ্ডের উদাহরণ শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষ। কোন কোন কাণ্ড অত্যন্ত স্ফীত বলিয়া, তাহাদের মধ্যে ভাবী বৃক্ষকে দেখা যায় না। কিন্তু পত্র মুকুলিত হইবার দ্বার (চোখ) স্ফীতকাণ্ডেও স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্ফীতকাণ্ড গোল আলু।

যাহা হউক, সকল কাণ্ডের উপর অল্প বিস্তর এক স্তর, প্রায় শল্কবৎ উদ্ভিত্ত্বক্ নিপতিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন কাণ্ডে উক্ত শল্কবৎ দ্রব্য কিছু বেশী দেখা যায়। এজন্য সে সকল কাণ্ডকে 'পরিশল্ক' কাণ্ড বলা হইয়া থাকে; পরিশল্ক কাণ্ডের সুন্দর উদাহরণ পলাণ্ডু।*

পাঠক! এ স্থানে আপনাদের বলিয়া রাখি, আমরা যে কাণ্ডের জন্য চীংকার করিলাম, তাহা আন্তর্ভৌম কাণ্ড, অর্থাং যে কাণ্ড মৃত্তিকা মধ্যে থাকে। এই কাণ্ডকে আপনারা কন্দ (গেঁড়) বলিয়া জানেন। পরন্তু কাণ্ড দুই প্রকার। অঙ্কুরিত হইবার পর যে কাণ্ড মৃত্তিকা ভেদ করিয়া শূন্যে উত্থিত হয়, তাহাকে বাহ্য কাণ্ড কহা যায়; এবং তাহা ছাড়া সমস্তই আন্তর্ভৌম কাণ্ড। আন্তর্ভৌম কাণ্ডের পরিচয় অগ্রে দেওয়া হইয়াছে; এইবার বাহ্য কাণ্ডের পরিচয় কিছু দেওয়া যাইতেছে!

বাহ্য কাণ্ড, আন্তর্ভৌম কাণ্ড হইতেই উৎপন্ন হয়। আপনাদের ইতিপূর্ব্বে যে কচু গাছের লুক্কায়িত পত্রের চোখ দেখান হইয়াছে, সেই চোখ, আন্তর্ভৌমকাণ্ড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকার উপর আসিয়া পড়িলে, গুপ্ত পত্রকে প্রকাশ করিয়া দেয়।

---

* ওল, মানকচু পরিশল্ক কাণ্ড। কিন্তু রজনীগন্ধ ফুলের কন্দে আদৌ শল্ক নাই; অতএব তাহা অপরিশল্ক কাণ্ড।

উক্ত পত্র-প্রকাশের স্থানকে গ্রন্থি বলা যায়। পরন্তু যে স্থানে পত্র মুকুলিত হইলে পর, পুনরায় শাখা মুকুলিত হয়, সে স্থানকে কক্ষ বলা যায়।

একবীজ দল উদ্ভিদের কক্ষমুকুল হয় না, কেবল গুটী কতক পত্রমুকুল লইয়া, ইহারা শূন্যদেশে উঠিতে থাকে; এবং বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইবার আশা ফুরাইলে পরে, তাহারা মস্তকোপরি একটী অন্তমুকুল (শেষমুকুল) লইয়া ক্ষান্ত হয়। কিন্তু দ্বিবীজদল উদ্ভিদেরা তাহা করে না; ইহাদের পত্রগ্রন্থি হইতে পত্র এবং শাখা উৎপন্ন হইয়া, পরে সশাখা পত্র হইতে পুনরায় কক্ষের সৃষ্টি করিয়া, প্রশাখায় পরিণত হয়; এবং প্রশাখার কক্ষ হইতে আরও নূতন নূতন শাখার সৃষ্টি করিয়া ইহারা অবস্থিতি করিতে থাকে। কিন্তু উক্ত শাখা, প্রশাখা, নবশাখা প্রভৃতিরা প্রত্যেকে একটী করিয়া অন্তমুকুল লইয়া থাকে। আর এই সকল অন্তমুকুল হইতে এক একটী ফল প্রকাশিত করিয়া, তাহারা বৃদ্ধি পক্ষে ক্ষান্ত হয়।

যে সকল উদ্ভিজ্জ বহু অন্তমুকুল লইয়া স্বীয় কাণ্ডের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া, চতুষ্পার্শ্বস্থ শাখা-প্রশাখাদিকে সঙ্গে করিয়া, নিজে বাড়িতে পারে, তাহাকেই 'তরু' বলা যায়; এবং যে সকল উদ্ভিদের কাণ্ড স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিতে না পারিয়া, চতুষ্পার্শ্বস্থ শাখাপ্রশাখাদি লইয়া, উর্দ্ধে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না, কিংবা যে সকল উদ্ভিদ কাষ্ঠময়, কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র, তাহাদিগকেই 'গুল্ম' কহে। কালিকাসিন্দা, জবা, আশসেওড়া প্রভৃতি অধিকাংশ কাষ্ঠ ও পুষ্পবৃক্ষ সকল গুল্মের উদাহরণস্থল।

অপিচ পূর্ব্বে যে স্ফীত কাণ্ডের বিষয় বলা হইয়াছে, সেই স্ফীতকাণ্ড-নিহিত বৃক্ষ সকল প্রায় নিস্তেজ বাহ্য কাণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর নিস্তেজ কাণ্ড দাঁড়াইতে না পারিয়া, ভূমিতলে শয়ন করে; এজন্য তাহাদিগকে ভূমিষ্ঠ কাণ্ড বলা হইয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ কাণ্ডের মাঝে মাঝে আস্থানিক শিকড় নির্গত হইলে, তাহাকে লতানিয়া কাণ্ড বলা যায়। লতানিয়া কাণ্ড কিন্তু দুই প্রকার—'উর্দ্ধগ' এবং 'পরিবেষ্টক'। যে সকল লতা অপর বৃক্ষকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে পরিবেষ্টিকা লতা কহে, যেমন গুলঞ্চ। যাহারা কোন একটা আশ্রয় পাইলে, তাহা ধরিয়া উঠিতে পারে ও যাহাদের আস্থানিক শিকড় হয় না, তাহাদিগকে উর্দ্ধগা লতা বলা যায়। যুঁইফুল, গোলাপ ফুল প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষকে উর্দ্ধগলতা বলা হইয়া থাকে। লতার শাখা হইলে, তাহাকে ধাবমান শাখা কহে।

দেবদারুজাতীয় উদ্ভিদের পত্রমুকুল কখন কখন এককালে বহুসংখ্যক বহির্গত হইবার পরে, তাহাদের কক্ষ হইতে এককালে বহু শাখা বহির্গত হয় বলিয়া, সেই সকল শাখাকে "গুচ্ছ" শাখা কহে। কোন কোন বৃক্ষের পত্রমুকুল শাখারূপ ধারণ করিতে গিয়া, শেষে অক্ষম হয়; কিন্তু উক্তরূপ মুকুল বৃক্ষকাণ্ডে সূচ্যগ্রভাগের ন্যায় দেহ পাইয়া, বিরাজিত থাকে। তজ্জন্য উহাকে 'সূচ্যগ্র' শাখা বলা যাইতে পারে। বেলের কাঁটা সূচ্যগ্র শাখার উদাহরণ।

যাহা হউক, আমলকীপ্রভৃতি বৃক্ষের কাণ্ডে পত্র-মুকুল না হইয়া, মূলে পত্রমুকুল হইয়া থাকে; এবং পাথর কুচি বা হিমসাগর প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতার ধারের নিকট হইতে পত্রমুকুল বহির্গত হয়। কিন্তু উক্ত সকল নানাপ্রকার পত্রমুকুলকে আস্থানিক বা অতিরিক্ত পত্রমুকুল বলা যাইতে পারে।

অত্র বাহ্য কাণ্ডের কথা বলা হইল; পরে কাণ্ডকোষের কথা বলা যাইবে।

৺স্বরূপচন্দ্র কুণ্ডু।

জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত নীলখীগ্রামে রামমোহন কুণ্ডু নামক জনৈক নিঃস্ব তেলি বাস করিতেন। কালীশচন্দ্র, স্বরূপচন্দ্র, হরচন্দ্র ও রাজচন্দ্র নামে তাঁহার চারিটী পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ কালী কুণ্ডু যৌবনের প্রারম্ভেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। সুতরাং মধ্যমপুত্র স্বরূপচন্দ্রের হস্তেই সাংসারিক ভার নিপতিত হয়। স্বরূপচন্দ্র পান-সুপারীর 'গাঁওয়াল' (১) করিয়া কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালাইতে লাগিলেন। ঐরূপ সামান্য গাঁওয়াল করিতে করিতে তাঁহার হাতে কয়েকটী টাকা সংগৃহীত হইলে পর, পান-সুপারীর গাঁওয়াল পরিত্যাগ করিয়া তিনি তৈলের গাঁওয়াল আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম কলু বাড়ী হইতে কিছু তৈল নগদ খরিদ করিয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু লোককে ধারে জিনিস না দিলে গাঁওয়াল চলে না; কেন না গৃহস্থের হাতে সকল সময় পয়সা থাকে না। সুতরাং ধারে বিক্রয় করিতে করিতে তাঁহার পুঁজি ফুরাইয়া গেল। তখন কলুর দয়ার উপর তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইল। অনেক সাধ্য সাধনার পর ভৈরব কলু তাঁহাকে আধ মণ করিয়া তৈল ধারে দিতে লাগিল। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরাও অন্যের বাড়ীতে তেঁতুল কাটিয়া এবং সরিষা কলাই প্রভৃতি ছাড়াইয়া দিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিল। এই উভয়বিধ উপায়ে তাঁহার দিনপাত হইতে লাগিল।

---

(১) অল্প পরিমাণ জিনিস মাথায় করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বিক্রয় করাকে 'গাঁওয়াল' কহে।

লোকে স্বীয় উন্নতি সাধনের জন্য অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া থাকে; কিন্তু কোন্ পথ অবলম্বন করিলে, লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে, তাহা প্রথমে কেহই ঠিক করিতে পারে না। নানারূপ কল্পনা জল্পনার পর স্বরূপচন্দ্র কলিকাতা যাইতে মনস্থ করিলেন। পূর্ব্বে উল্টাডিঙ্গিতে টাকীর মুন্‌শীদের একটী আড়ৎ ছিল। স্বরূপচন্দ্র সেই আড়তে গেলেন। তাঁহার জমকাল চেহারা দেখিয়া, আড়তের মালিক তাঁহাকে 'কয়াল' পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই ভাগ্যদেবী তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। কয়ালীতে স্বরূপচন্দ্রের বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে স্বরূপচন্দ্র আড়তটী নিজে খরিদ করিয়া লইলেন। তখন বলরাম কুণ্ডু নামক তাঁহার একজন আত্মীয়কে কয়াল নিযুক্ত করিয়া নিজে আড়দ্দার হইলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহার দেখিয়া অনেক ব্যাপারী তাঁহার আড়তে মাল তুলিতে আরম্ভ করিল এবং তাঁহার উপরই বিক্রয়ের ভার দিতে লাগিল। তিনি আড়দ্দারী ব্যতীত বিক্রয়ের কৌশল দ্বারাও কিছু কিছু লাভ করিতে লাগিলেন।

বস্তুতঃ যাঁহার কথা ও কার্য্যে বৈষম্য নাই, যাঁহার মনে ধর্ম্মজ্ঞান আছে, যিনি মিতব্যয়ী ও সাধু-চরিত্র, তিনি দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত কার্য্য করিলে ব্যবসায়ে যে উন্নতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। অধ্যবসায়ই উন্নতির মূল; পরন্তু ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বারা অধ্যবসায় পরিচালিত হইলে মণিকাঞ্চন যোগ হয়।

খুলনা-রেল বসিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের লোকে বড় বড় নৌকায় করিয়া কলিকাতায় মাল পাঠাইত। এক এক খানা নৌকায় ১০০০/, ১২০০/ মণ পর্য্যন্ত মাল বোঝাই হইত। সেইরূপ নৌকা আজকাল প্রায় দেখা যায় না। নৌকার ব্যাপারিগণ মহাজনের নিকট টাকা লইয়া মাল খরিদ করিত। এই সুযোগে মহাজন ব্যাপারীকে টাকা দিয়া শতকরা ২০৲ ২৫৲ টাকা করিয়া লাভ করিত। স্বরূপচন্দ্রের মন ঐ কারবারের দিকে ধাবিত হইল। তিনি ঐ মহাজনী কারবারের জন্য বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। বাড়ী মোকামে তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় হরচন্দ্র ও রাজচন্দ্র মহাজনী কারবার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা ব্যাপারীদিগকে টাকা দিয়া কুলাইতে না পারিয়া ভাঙ্গার হরিশ্চন্দ্র সাহা প্রভৃতির নিকট হইতে হুণ্ডী দ্বারা টাকা আনিতে লাগিলেন। স্বরূপচন্দ্র কলিকাতার আড়ত হইতে ঐ হুণ্ডীর টাকা পরিশোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল ব্যাপারীও স্বরূপ কুণ্ডুর আড়তেই মাল

তুলিত এবং তাঁহা দ্বারাই বিক্রয় করাইত। এইরূপে কারবার অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়াতে তাঁহাদের প্রতিবেশী ভগবান্, দ্বীপচাঁদ, নিত্যানন্দ ও কমল কুণ্ডু এই চারি জনকে অংশীদার করিলেন। রাজচন্দ্র, ভগবান্ ও নিত্যানন্দ কলিকাতা গেলেন; হরচন্দ্র, দ্বীপচাঁদ ও কমল বাড়ীতে রহিলেন।

এই সময় বাড়ীতে পাটের কারবার আরম্ভ হইল। দেওড়া, মাদারিপুর, ভাঙ্গা, শিরুয়াইল, বহরমগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, ফতেপুর প্রভৃতি মোকামে পাট খরিদ করা হইত। মাদারিপুরই কারবারের কেন্দ্রস্থল হইল। মজুর দ্বারা পাটের গাঁইট বান্ধাইয়া (১) নৌকা বোঝাই করিয়া কলিকাতার আড়তে চালান দেওয়া হইত। পাটের কারবারে ভগবানের পুত্র দীননাথ ও দ্বীপচাঁদের পুত্র কালীচরণ প্রধান সহায় ছিল। অন্যান্য কারবার ব্যতীত একমাত্র পাটের ব্যবসায়ে লক্ষাধিক টাকা খাটিতে লাগিল।

কারবারের এইরূপ প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ড মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে লাগিল। ৺ দুর্গোৎসবেই বহুতর টাকা খরচ হইত। চারিদিন যাত্রাগান ও ফলাহার হইত; বিজয়ার দিন অনেক টাকার বাজি পোড়ান হইত। এদিকে জমিদারীও কিছু কিছু খরিদ হইতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইরূপ ক্রমোন্নতির সময় ১২৮৬ সালে স্বরূপ চন্দ্র সহসা নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫০ বৎসরও পূর্ণ হইয়াছিল না। তাঁহার সন্তান সন্ততি জন্মে নাই; বিধবা পত্নী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ সরল প্রকৃতি যে, ধনী মহাজনের পত্নী হইয়াও স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কপর্দ্দকও সংগ্রহ করিয়া রাখেন নাই।

স্বরূপ কুণ্ডুর মৃত্যুর পর সরিকগণ কিছুদিন পর্য্যন্ত উক্ত কারবার চালাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতারণা ও চৌর্য্যকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া লক্ষ্মী অন্তর্ধান হইলেন। ১০ বৎসর যাইতে না যাইতেই কারবার ফেল হইয়া গেল। দেনার দায়ে উল্টাডিঙ্গির আড়ত বিক্রীত হইয়া গেল। ৺পার্ব্বতীচরণ রায় আড়ত খরিদ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ সেই আড়তে কারবার করিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন লোকে অদ্যাপি স্বরূপ কুণ্ডুর আড়ত বলিয়া থাকে। স্বরূপ কুণ্ডুর সরিকগণ এখন দোকানদারী করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিশ্বাস।

---

(১) মজুরেরা গাঁইট প্রতি ৴১০ আধ আনা করিয়া পাইত।

চিনির রাসায়নিক তত্ত্ব।

(লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগ্‌চী।)

অদ্য যে বিষয় আলোচনা করিব ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা অনেকের তৃপ্তিজনক হইবে কি না, এই আশঙ্কায় যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে লিখিতেছি।

শর্করাশ্রেণী—কার্ব্বহাইড্রেট অর্থাৎ কার্ব্বণ বা কয়লা, হাইড্রোজেন বা জলজান বাষ্প, এবং অক্সিজেন বা অম্লজান বাষ্প,—এই তিন দ্রব্যের সম্মিলনে প্রস্তুত হয়। এই শেষোক্ত দুইটী দ্রব্য বা উপাদান জলে যে ভাবে (H_2O) সম্মিলিত থাকে, এই শ্রেণীতেও তদ্রূপভাবে সম্মিলিত থাকে। কার্ব্ব-হাইড্রেট্ শ্রেণী মধ্যে শ্বেতসার বা পালো এবং চিনিই প্রধান। এখন কোন্ পদার্থে মৌলিক বা মূল উপাদানের কি বিভিন্নতা আছে, তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

শর্করার রাসায়নিক সংযোগ অনুসারে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাউক। প্রথম শ্রেণীতে চিনি এক অণু; দ্বিতীয় শ্রেণীতে চিনি দুই অণু; এবং তৃতীয় শ্রেণীতে চিনির অণুর পরিমাণ বিশৃঙ্খল ভাবে সম্মিলিত থাকে।

১। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে চিনি এক অণুভাবে সম্মিলিত থাকে বলিয়া ইহাকে মনোস্যাকারডাইস্ (Monosaccharides) বলে। ইহার রাসায়নিক সঙ্কেত $C_6H_{12}O_6$। মধু-শর্করা এবং আঙ্গুরজাত চিনি এই শ্রেণীভুক্ত। ইহা জলে সহজে দ্রব হয়, দানাদার অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইহার আস্বাদ মিষ্ট। পরিপাক-প্রণালীতে ডেক্সট্রোস এবং লবিউলাসে পরিবর্ত্তিত হইয়া কার্য্য করে।

২। দ্বিতীয় শ্রেণীতে শর্করা দুই অণু সম্মিলিত থাকে, পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি, এই শ্রেণীর নাম ডাইসাকারাইডস্। ইহার রাসায়নিক সঙ্কেত $C_{12}H_{22}O_{11}$ অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা এই শ্রেণীতে কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সমস্তই প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। ইক্ষু-শর্করা, ক্ষীর-শর্করা এবং যব ইত্যাদির উৎসেচন হওয়ার পর যে শর্করা প্রস্তুত হয়, তাহা এই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর চিনিও জলে দ্রবনীয়, দানাদার এবং মিষ্টাস্বাদ যুক্ত; ইহাও পরিপাক-প্রণালীতে পরিবর্ত্তিত এবং

মনোস্যাকারাইডে পরিণত হইয়া ইক্ষুচিনি ডেক্সট্রোস ও লবিউলোস, ক্ষীর-শর্করা ডেক্সট্রোস ও গ্যালাক্টোস এবং মাল্ট শর্করা ডেক্সট্রোসে পরিণত হয়।

৩। তৃতীয় শ্রেণীর চিনির গঠন নানা রকমে হইয়া থাকে। এ জন্য এই শ্রেণীকে "পলিস্যাকারাইড্‌স্" বলা হইয়া থাকে। ইহার রাসায়নিক সঙ্কেত $C_6H_{10}O_5N$। শ্বেতসার, তূলা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ-তন্তু, গঁদ এবং স্তন্যপায়ী জন্তুর যকৃতে প্রস্তুত গ্লাইডোজেন নামক শর্করা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাকে জান্তব বা জন্তু হইতে প্রাপ্ত শর্করাও বলা চলে। এই শ্রেণীর চিনি শীতল জলে দ্রব হয় না, দানাদারও হয় না, এবং ইহার কোন মিষ্টাস্বাদও নাই। ইহা পরিপাক-প্রক্রিয়ার প্রথমে ডাইস্যাকারাইড, পরে মালট্রোস স্যাকারাইড এবং পরিশেষে ডেক্‌স্‌ট্রোসে পরিণত হয়।

এই সকল বিবরণ হইতে আমরা এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, পরিপাক-প্রণালীতে যে কোন জাতীয় চিনির পরিণাম ফল এক। আর এক কথা এই যে, আমরা যে সমস্ত আহার-দ্রব্যরূপে গ্রহণ করি, তন্মধ্যে কোন কোন পদার্থও দেহ মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া চিনির রূপে কার্য্য করে; যেমন শ্বেতসার।

আগামী বারে "বিবিধ দ্রব্যের চিনি"র প্রবন্ধে এ সকল বিষয় বিশদ রূপে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শর্করা-বিজ্ঞান।

(লেখক—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়,—M. A, M. R. A. C, and F. H. A. S.)

দ্বাদশ অধ্যায়—বিলাতী উপায়ে শর্করা প্রস্তুত।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের বর্ণিত উপায়টী এদেশের উচ্চ শ্রেণীর কৃষকগণ অনায়াসে অবলম্বন করিতে পারে। বস্তুতঃ ইহা দ্বারা দেশীয় নিয়মের অতি সামান্য ব্যতিক্রমই ঘটিবে। এ নিয়ম কৃষকদিগকে শিখাইবার জন্য অধিক বেগ পাইতে হইবে না। বিলাতী নিয়ম বর্ণনা করায় বিশেষ লাভ নাই, কেন না লক্ষ টাকা মূলধন ব্যতীত বিলাতী নিয়মে চিনি প্রস্তুতের বন্দোবস্ত হইতে পারে না। ষ্টীম্ এঞ্জিন ও হরিজন্টাল্-রোলার দ্বারা আক্ মাড়াইবার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আকের

মধ্যে সাধারণতঃ শতকরা ৯০ ভাগ রস থাকে। এই ৯০ ভাগের ৮০।৮২ ভাগ কলের দ্বারা বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

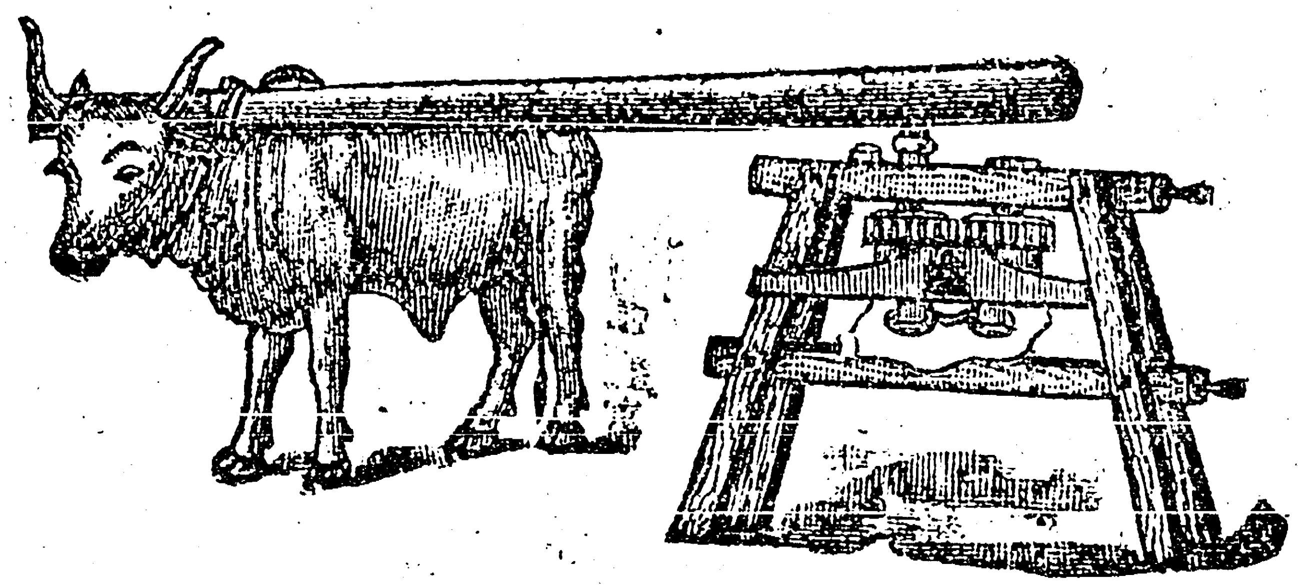

দুই রোলার বেহিয়া মিল।

দুই রোলার বেহিয়া মিল দ্বারা কেবল ৫৮ ভাগ মাত্র রস বাহির হয়; তিন রোলার বেহিয়া মিল দ্বারা ৬২।৬৫ ভাগ রস বাহির হইয়া আইসে। ষ্টীম্ হরিজণ্টাল রোলার দ্বারা ৭০।৭২ ভাগ রস বাহির হয়। আক্‌গুলি চিরিয়া লইলে ৭৫ ভাগ রস বাহির হয়। আক্ চিরিবার কলও (Shredder) আছে। আবার আকের ছাল ছাড়াইয়া মাড়াই করিতে পারিলে ১০০/ মণ ইক্ষুদণ্ড হইতে ৮০।৮২ মণ পর্য্যন্ত রস বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ফরস্ ডিকর্টিকেটর Faures Sugarcane Decorticator ও হরিজণ্টাল্ মিল্ ব্যবহার দ্বারা ইক্ষুদণ্ড হইতে যে পরিমাণ রস বাহির হইয়া আইসে, এরূপ আর অন্য কোন উপায় দ্বারা হয় না। বড় বড় আবাদে এই কল ব্যবহার চলিতে পারে। দরিদ্রদিগের পক্ষে এই কলের ব্যবহার অসম্ভব।

বিলাতী উপায়ে এক্ষণে এক কালীন ইক্ষুর রস হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করাই সাধারণ নিয়ম। এই উপায়ের বিশেষত্ব ভ্যাকুয়াম্ প্যানের মধ্যে ১৬০° ডিগ্রি মাত্র উত্তাপে রস জ্বাল দেওয়া। গরম জলের সহিত গুড় মিশাইয়া হাড়ের কয়লার ফিল্টার মধ্য দিয়া এই গুড়ের জল (অথবা ক্লারিফাই করা ইক্ষুর রস) পরিষ্কার করিয়া লইয়া, পরে ভ্যাকুয়াম্ প্যানে (অর্থাৎ বদ্ধ বায়ু-বিমুক্ত কটাহের মধ্যে) রস ১৬০° ডিগ্রি (ফারেন্) উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া চিনি প্রস্তুত করা সাহেবদের চিনির কারখানার নিয়ম। গুড় হইতে মাৎ বাহির করিয়া দিবার জন্য এবং শেষ প্রস্তুত চিনি হইতে গোল্‌ডন্ সিরাপ (Golden-Syrup) বাহির করিয়া দিবার জন্য সেন্‌ট্রিফিউগাল্ মিলের ব্যবহার প্রচলিত আছে। যাহা হউক, বিলাতী কলের বর্ণনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; কেন না এদেশের লোকের দ্বারা বিলাতী নিয়মে যে চিনি প্রস্তুত কার্য্য সাধিত হইবে, এরূপ সম্ভাবনা নিতান্ত কম। সাহেবেরা কাশীপুর ফ্যাক্টারি, রোজা-ফ্যাক্টারি, সাজিহানপুর ফ্যাক্টারি, কানপুর ফ্যাক্টারি প্রভৃতি কারখানায় বিলাতী নিয়মে চিনি প্রস্তুতি অনেকদিন ধরিয়াই করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা যদি এ দেশের কৃষকদের নিকট সারবান গুড় অথবা মাৎ বাদ দেওয়া গুড় অধিক পরিমাণে কিনিতে পান, তাহা হইলে তাঁহাদের যবদ্বীপ প্রভৃতি বাহিরের স্থান হইতে এইরূপ সার গুড়ের আমদানী করিতে হয় না, এবং এদেশের কোটি কোটি মুদ্রা বিলাতী চিনির আমদানীতেও ব্যয়িত হয় না, গুড় বা চিনি ও মাৎ প্রস্তুতি করিয়া যদি কেহ লাভবান হয়েন, তবে তাঁহাকে আর ভাবিতে হইবে না। আর পাঁচজন এই নিয়মে কার্য্য করিলেই তাঁহার লাভের অংশ কমিয়া যাইবে। বৎসরে ন্যূনকল্পে ৫০ লক্ষ মণ চিনি ও ৭ বা ৮ লক্ষ মণ মাৎ মরিশস্ প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতে আমদানী হয়। কোথায় চিনি বা মাৎ বিক্রয় হইবে, তজ্জন্যও ভাবিতে হইবে না। চিনির ও মাতের বাজার অত্যন্ত প্রশস্ত। সহস্রাধিক ভারতবর্ষীয় যুবক এই কার্য্যে অনায়াসেই অবতীর্ণ হইতে পারেন। প্রতিযোগিতার আশঙ্কা নিতান্ত কম। শিক্ষিত লোকদিগের দ্বারা ভাল উপায়ে ইক্ষুর চাষ ও গুড় প্রস্তুতি হইলে অধিক পরিমাণে সারবান গুড় জন্মিবে। ইহাতে সাহেবদের চিনির কারখানারও উন্নতি হইবে, এবং তাঁহাদের সাহায্যেও আমাদের দেশের একটী শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধিত হইবে। সামান্য বেতনের চাকরীর জন্য যাঁহারা এক্ষণে লালায়িত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য, চাষিদের সাহায্যে এই ব্যবসায়ের উন্নতি করিয়া নিজেদের স্বাধীন জীবিকার উপায় করা। স্বাধীন চিন্তা, যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক। কেরাণীগিরি করিতে "আয়াস" আছে, মাথা ঘামান নাই; কিন্তু লাঞ্ছনা আছে, লাভ নাই।

পাথুরে কয়লা।

"শিবপুর কালেজ পত্রিকায়" পাথুরে কয়লা সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধটী আমরা ক্রমশঃ এই পত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিব। এ সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি আছে। প্রথমতঃ সেই সকল গ্রন্থের সার সঙ্কলন সংক্ষিপ্ত ভাবে—কাজের কথাগুলি অতি সুন্দররূপে এ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। সেফ্‌টিল্যাম্প ইত্যাদি কয়লাখনি সম্বন্ধীয় দ্রব্যগুলির আবিষ্কারক মহোদয়বর্গের পরিচয় এবং সেই সকল দ্রব্যের যথাযথ ব্যবহার

ইত্যাদির কথা এ প্রবন্ধে না লিখিয়া—প্রবন্ধ ভারী না করিয়া. বাস্তবিক প্রবন্ধের সুন্দরত্ব অতি সুনিপুণ শিল্পীর শিল্প-কৌশল দেখান মত,—লিখিত হইয়াছে; এজন্য লেখক মহোদয়কে আমরা শত ধন্যবাদ দিতেছি। দ্বিতীয়তঃ আমাদের এদেশীয় "কয়লার খনি"র সত্বাধিকারীর মধ্যে ২।১ জন মহাত্মা কৃপা করিয়া এ সম্বন্ধে "মহাজনবন্ধু"তে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, ইহাতে "মহাজনবন্ধু" সামান্য ক্ষুদ্রাকার, পাতলা কাগজে মুদ্রিত, একখানা নগণ্য মাসিক পত্র হইলেও নিশ্চিতই কৃতার্থ হইতেছে। এ সময় তাঁহাদের কর্ম্ম, বিষয়ের সহিত পুস্তকের লিখিত বিষয়ের সামঞ্জস্য-বিধান এবং উভয়ের জ্ঞাতব্য সাধারণে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ প্রদান করা। এই উদ্দেশে এ সম্বন্ধে এখন যেখানে যাহা পাইব, তাহাই সাধারণকে দেখাইয়া সাধারণের সম্পত্তি করিব। যাহা হউক, এখন প্রবন্ধের কথা অবতারণা করিতেছি।

"আজ কাল বাঙ্গালা দেশে ঘরে ঘরে পাথুরে কয়লার ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু পাথুরে কয়লা কোথায়, কি অবস্থায় পাওয়া যায় এবং কি প্রকারে ইহার উৎপত্তি হইল, তাহা সাধারণের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই বোধ হয় অবগত আছেন। কয়লা খনিতে পাওয়া যায়, ইহা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু কয়লার খনি কি প্রকার? কেহ যদি কল্পনা করিতে পারেন যে, আমরা যেখানে বসিয়া আছি, এই প্রকার এক ক্রোশ, দুই ক্রোশ, এমন কি দশ পনের ক্রোশ লম্বা ও চওড়া জমীতে দুই হাত হইতে পঞ্চাশ যাট্ হাত পর্য্যন্ত উক্ত কয়লা স্তূপাকারে থাকে এবং তাহার উপরে এক হাত হইতে পাঁচ, ছয় হাজার হাত পর্য্যন্ত পাথর জমিয়া যায় এবং এই প্রস্তর ভেদ করিয়া ইঁদারা কিম্বা সুরঙ্গ কাটিয়া সেই বিস্তীর্ণ কয়লা রাশির মধ্য হইতে যদি কয়লা কাটিয়া বাহির করা হয়. তাহা হইলে কয়লার খনির অনেকটা ধারণা হইতে পারে।

এত কয়লা কোথা হইতে আসিল এবং কি করিয়াই বা ইহা প্রস্তরাবৃত হইল, এ প্রশ্ন সকলেরই মনে উদিত হইতে পারে। কেহ হয়ত বলিবেন, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, তাঁহার অনন্ত সৃষ্টি-মহিমা কে বুঝিতে পারে? আবার কেহ বলিতে পারেন, ঈশ্বর বলিলেন—'পৃথিবী হউক'—'আলোক হউক'—'কয়লা হউক' এবং তৎক্ষণাৎ পৃথিবী ও আলোকের সৃষ্টির ন্যায় কয়লারও সৃষ্টি হইল। কিন্তু কার্য্য কারণ অনুসন্ধিৎসু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভ্রান্তিমূলক বিদ্যার ভান না করিয়া বা ঈশ্বরের দোহাই না দিয়া এ বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কয়লা বা তদুপরি প্রস্তর রাশি লীলাময়ের লীলায় এক দিনেই সৃষ্ট হয় নাই। অতি প্রাচীন কালে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে, যখন মনুষ্য কিংবা বর্ত্তমান কালের জীবাদি অধিকাংশই পৃথিবীতে জন্মে নাই, সেই সময়ে বৃক্ষ লতাদি হইতে পাথুরে কয়লার উৎপত্তি হইয়াছে; এবং বহুলক্ষ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত নানা উদ্ভিজ্জাদির সমষ্টি হইতে কয়লার স্তূপ জন্মিয়াছে।

এই সমষ্টি-সকলের উৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, অতি পুরাকালে পৃথিবীর স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ জলাভূমি ছিল। আমাদের দেশের সুন্দর বনের ন্যায় জঙ্গল কিংবা বড় বড় বিল দেখিলে ইহার কতকটা ধারণা হইতে পারে। এই সকল স্থানে ক্রমাগত বহুবৎসর ধরিয়া শেওলা ও বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে; এই প্রকারে বিস্তীর্ণ মৃত-উদ্ভিজ্জের স্তূপ হইতে কয়লার জন্ম হইয়াছে। তাহার পর ভূমিকম্প বা অন্য কোন ঘটনা বশতঃ সে সকল স্থান বসিয়া গিয়া জলে ডুবিয়া যায় এবং সেই বৃক্ষ লতাদির স্তূপের উপর বালি মাটী কিংবা বালি পড়িয়া তাহাদিগকে আবৃত করিয়াছে। আবার অন্য মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলেন যে, যে স্থানে বৃক্ষাদি জন্মিয়াছিল, সেই স্থানেই যে কয়লার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার কোনও বিশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাঁহাদের মতে নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে জঙ্গল ছিল এবং সেই জঙ্গল বর্ষাকালের বন্যা বা অন্য কোনও ঘটনা বশতঃ জলপ্লাবিত হয় এবং সেই জল প্লাবন দ্বারা বৃক্ষলতাদি উৎপাটিত হইয়া কোন হ্রদ বা জলাশয়ে বাহিত হয় এবং সেই জলাশয়ে ক্রমাগত জমিয়া জমিয়া কয়লায় পরিণত হইয়াছে। কালক্রমে সেই জঙ্গল নষ্ট হইয়া যাইলে পর, সেই জলাশয়ে আর বৃক্ষাদি না আসিয়া মাটীর পলি আসিয়া জমিতে থাকে। কালের অনন্ত শাসনে আবার নূতন জঙ্গলের সৃষ্টি হয়। হয়ত আবার এই নূতন জঙ্গল পূর্ব্বোক্ত কোনও নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বাহিত হইয়া ইতিপূর্ব্বে উৎপন্ন সেই বালি মাটীর স্তরের উপর আসিয়া জমিতে থাকে। এই প্রকার স্তরে স্তরে ক্রমাগত অনন্ত কাল ধরিয়া জমিয়া জমিয়া বৃক্ষাদির স্তর কয়লার স্তরে এবং মাটীর স্তর পাথরের স্তরে পরিণত হইয়াছে।

বিশিষ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কয়লার উৎপত্তি উভয় কারণেই হইতে পারে। কারণ, দ্বিতীয় মতানুসারে কয়লা যদি জলস্রোত দ্বারা আনীত বৃক্ষাদি জমিয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে কয়লার সঙ্গে মাটী পাওয়া উচিত এবং প্রকৃত পক্ষে অনেক জায়গার কয়লায় তাহা পাওয়াও যায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কয়লারই জন্ম এই প্রকারে হইয়াছে এবং এইজন্য আমাদের দেশের কয়লা পোড়াইলে ছাইয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক হয়।

আরও দ্বিতীয়মতের পৃষ্ঠপোষক কারণ এই যে, ভূমিখণ্ডের যে স্তরে কয়লা পাওয়া যায়, সে স্তর বাটীর আকারের ন্যায় (basin shaped)। কারণ যে কয়লা-স্তরের বিন্যাস জলাশয়াভ্যন্তরস্থিত মৃত্তিকার উপর নিহিত হইয়াছে, তাহার আকৃতি এইরূপ না হইয়া অন্য কি প্রকারের হইতে পারে? ঝরিয়া এবং গিরিডির কয়লার খনির কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন; এবং এই সকল কয়লার স্তরের আকৃতি এইরূপ বাটীর আকারের ন্যায়। পরন্তু ঝড়িয়ার অধিকাংশ কয়লার স্তর যাহা সাধারণের সম্মুখে প্রকৃত কয়লার স্তর বলিয়া কথিত হয়, তাহা অতি পাতলা পাতলা কয়লা ও বেলে মাটীর স্তরের সমষ্টি মাত্র। এইরূপ অনেক কয়লায় প্রকৃত কয়লার স্তর অপেক্ষা মেটে পাথরের (shady layer) স্তর অত্যধিক। কয়লা বৃক্ষলতাদি হইতে যে জন্মিয়াছে, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, কয়লার উপর অথবা নিম্নস্থিত প্রস্তর স্তরের, এমন কি কয়লার মধ্যেও বৃক্ষের ডাল পাতার চিহ্ন যথেষ্ট পাওয়া যায়। অবশ্য এত বৎসরের পাতা এখন পাওয়া যায় না, কিন্তু পাতা যখন মাটী চাপা পড়িয়াছিল, তখন পাতার উপর এবং নিম্নস্থ মাটীতে পাতার এবং তাহার শিরাগুলির চিহ্ন সেই মাটীতে অঙ্কিত হইয়াছিল। সেই সকল পাতার আকার ও চিহ্ন অতি পরিস্ফুট ভাবে অঙ্কিত হয় এবং তাহা হইতে সেই বৃক্ষটীও কোন্ জাতীয় বৃক্ষ ছিল, তাহাও নিরূপণ করা যায়। ইহা সত্ত্বেও ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের যত্নে পালিত বিজ্ঞানমন্দিরে "একখণ্ড কাষ্ঠের একদিকে পাথুরে কয়লা, অপরদিকে যে কাষ্ঠ সেই কাষ্ঠই আছে" ইহা সংগৃহীত হইয়া সযত্নে লোককে দেখান হয়, আমরা সচক্ষে দেখিয়াছি। মঃ বঃ সঃ।

শীতপ্রধান দেশে এখনও অনেক বিল আছে, যেখানে লতা গুল্মাদি হইতে এখনও একপ্রকার কয়লা জন্মিতেছে। ইংরাজিতে ইহাকে পিট্ (peat) বলে। এই সমস্ত বিলের নিম্নস্থ মৃত উদ্ভিদগুলি দেখিতে কয়লার মত, কিন্তু কিছু নরম। ইহা দেখিলে অতি সুন্দর ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা যদি মনুষ্য ব্যবহার নিমিত্ত ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত না হইত, তাহা হইলে কালক্রমে এগুলিও কঠিন কয়লায় পরিণত হইত। এ প্রকার মৃত উদ্ভিদের স্তর (peat layer) আমাদের বাঙ্গালা যশোহর এবং চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলায় ২০।২৫ হাত মাটীর নীচে খুড়িলে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইহা অতি অল্প দিনের বলিয়া ইহার বর্ণ কটা এবং ইহা কয়লা অপেক্ষা অনেক নরম; কিন্তু শুকাইয়া আগুনে দিলে সুন্দর জ্বলে। কোনও কার্য্য দেখিলেই যখন আমরা কারণ অনুভব করি, ধূম দেখিলেই যখন বহ্নি আছে আমরা স্থির করি, এবং পৃথিবীর কার্য্য কলাপ যখন সমভাবে চলিয়া আসিতেছে, এ বিষয়ের আপত্তির তখন কোনও কারণই হইতে পারে না, আরও আমরা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, পৃথিবীর অনেক স্থানে এখনও কয়লা কিংবা তাহার ন্যায় কোনও বস্তু বৃক্ষলতাদির সমষ্টি হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং প্রাচীন কালের কয়লায় বৃক্ষ লতাদির চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কে অস্বীকার করিতে পারে যে, কয়লা বৃক্ষ-লতা ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থ হইতে জন্মিয়াছে?

(ক্রমশঃ)

ডাকের কথা।

(সন ১৩০৮ সালে পৌষ সংখ্যার পর।)

বিলাতে মণিঅর্ডারের টাকা কিংবা সামান্য চিঠি বিলম্বে আসিলে, তজ্জন্য তথাকার পোষ্টাফিস সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাহার আলস্যে ইহা হয়, তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, ঘটনাক্রমে জরিমানাও দিতে হয়। বর্ত্তমানে এ নিয়ম লণ্ডন-বাসীর অনেকের মনঃপূত নহে—তুলিয়া দিতে চাহেন। এখানেও এ নিয়ম আছে। কেবল মণি-অর্ডার বলিয়া নহে; কলিকাতায় প্রত্যেক পত্রখানিতে তারিখের সিলমোহর ত আছে, উহা সত্ত্বেও প্রত্যেক ঘণ্টায় সিলমোহর দিয়া প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় পত্র বিলি করিতে হয়। এরূপ ব্যবস্থা সহরে দেখিতে পাই, কিন্তু মফঃস্বলে কি হয়, তাহা জানি না। সামান্য চিঠি বিলির দোষ কিংবা মণি-অর্ডার বিলির দোষ ইংরাজদিগের নিকট ধর্ত্তব্য। এদেশ-বাসীরা এজন্য প্রায় আপত্তি করেন না।

বিলাতে টেলিগ্রাফের ঠিকানাটীরও কথার হিসাবে মূল্য দিতে হয়। ইহাও লণ্ডনবাসীর অনেকের অসহ্য। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাজ্যে এ প্রথা নাই, ভারতেও ইহা নাই। এ সম্বন্ধে আর একটি প্রতিবাদে অধিকাংশ লণ্ডনবাসীরা বলেন, "রাত্রিতে অর্দ্ধমূল্যে টেলিগ্রাফ পাঠাইবার ব্যবস্থা করা উচিত।" আমাদের এখানে "ডিফার্ড" সংবাদ রাত্রিতেই প্রায় পাঠান হয়, এবং অর্দ্ধ মূল্যে বহন হয়। কিন্তু উহা দিনে দিনে দাখিল করিতে হয়। রাত্রিতে দাখিলে দ্বিগুণ খরচা। এ বিষয়ে সংস্কার আমাদেরও প্রার্থনীয়।

নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরি বলেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র একই পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প চলা উচিত। সকল রাজ্যের জন্য একই ষ্ট্যাম্প করিতে পারিলে খুব ভালই হয়। অন্ততঃ নিজের রাজ্যের সকল অংশে ত এক ষ্ট্যাম্প চলান উচিত।" কথা খুব ভাল, কিন্তু স্বরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের টাকাতেই যখন তফাৎ রাখা হইতেছে, তখন ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে উহা কি করা হইবে?

পোষ্টাফিস সম্বন্ধে লণ্ডনবাসীদিগের এইরূপ, অনেকের অনেক আপত্তি-জনক প্রস্তাব আছে। সে সকল গুলির উল্লেখ অনাবশ্যক। তাঁহাদের আর একটী আপত্তি পোষ্ট কার্ডের উপর। এজন্য বলেন "অন্যান্য দেশের ন্যায় পোষ্টকার্ডগুলি ভাল এবং বড় হওয়া উচিত।" ইহাতে আমাদের ঐ প্রার্থনা ছিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ইহাতে ভারতের অদৃষ্টে উল্‌টা ব্যবস্থা হইয়াছে। কোথায় বড় চটাল পোষ্টকার্ডের কাগজ সহিত এক পয়সায় ক্রয় করিব, তাহা না হইয়া পরিণামে ইহার জন্য কাগজের মূল্যও আমাদের বহন করিতে হইবে, সেইমত পথ দেখান হইয়াছে।

এজন্য প্রতিবাদ হইত নিশ্চিত! কিন্তু আমাদের সুচতুর গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর নির্ব্বিঘ্নে এদেশবাসীকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, "পোষ্টকার্ডে বিজ্ঞাপন দাও, ছবি দাও কিছু বলিব না, কেবল নাম, ঠিকানা এবং শিল মোহরের স্থান রাখিও।" পরিণামে পোষ্টকার্ডে ছবি ছাপার বিষয় কতদূর স্থায়ী হইবে, জানি না। বিগত ১৮৯৯ সালের ১লা এপ্রেল হইতে ভারতীয়ডাকবিভাগে অন্যান্য অনেক বিষয়ের পরিবর্ত্তনের মধ্যে এ সম্বন্ধেও যাহা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

ডাকঘরে যে পোষ্টকার্ড কিনিতে পাওয়া যায়, (একফর্দ্দ অথবা উত্তরের জন্য জোড়া, দুই প্রকারেরই), উহার অনুরূপ আকার ও ওজনের পোষ্টকার্ড ঘরে প্রস্তুত করিয়া লইয়াও ব্যবহার করা যাইতে পারিবে, ইহাতে একপয়সা মূল্যের টিকিট মারিয়া দিলেই হইবে। টিকিট না দিলেও বেয়ারিং চলিয়া যাইবে এবং যাঁহার নামে পত্র, তাঁহার নিকট হইতে দ্বিগুণ মাশুলের দাবী করা হইবে। ঐ পোষ্ট কার্ডের পিছনে অর্থাৎ যে দিকে ঠিকানা লিখিতে হয়, সেই দিকে ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞাপন, ছবি, পত্র-প্রেরকের নাম, ঠিকানা ও চিঠি ডাকে দেওয়ার তারিখ— এ সকল দেওয়া যাইতে পারিবে; তবে যাহাকে পত্র দেওয়া হইতেছে তাহার নাম ও ঠিকানা সুস্পষ্ট লিখিতে পারিবার মত এবং পোষ্ট আফিসের মোহর করিবার মত স্থান ইহাতে রাখা চাই। এরূপ পোষ্ট কার্ড ভারতের মধ্যেই চলিবে। পোষ্ট কার্ডের যে দিকে পত্র লেখা যায়, সে দিকে আবশ্যক হইলে রসিদ ষ্ট্যাম্প লাগান যাইতে পারিবে এবং ঠিকানার দিকে, যাহাকে পত্র লেখা যাইতেছে, তাহার নাম ও ঠিকানা স্বতন্ত্র কাগজের টুকরায় লিখিয়াও আঁটিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু ঐ টুকরা ২ ইঞ্চির অনধিক লম্বা এবং প্রস্থে তিনের চার ইঞ্চির অনধিক হওয়া চাই।

ডাক টিকিট সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা হইয়াছে যে, (১) আধ তোলার অনধিক ওজনের চিঠিতে দুই পয়সা মাশুল দিতে হইবে; (২) আধ তোলার অধিক কিন্তু দেড় তোলার অনধিক ওজনের চিঠিতে এক আনা, তাহার উপর প্রতি দেড় তোলা বা তাহার ভগ্নাংশের জন্য এক আনা; (৩) ঘরে প্রস্তুত এক ফর্দ্দের পোষ্ট কার্ডে এক পয়সার টিকিট এবং জোড়া পোষ্ট কার্ড হইলে দুই পয়সার টিকিট দিতে হইবে; (৪) পুস্তক অথবা নমুনার প্যাকেট প্রতি দশ তোলা বা তাহার ভগ্নাংশের জন্য আধ আনা; (৫) সংবাদ পত্র চারি তোলার অনধিক এক পয়সা, চারি তোলার অধিক কিন্তু কুড়ি তোলার অনধিক আধ আনা, তদূর্দ্ধে প্রতেক ২০ তোলা বা তাহার ভগ্নাংশের জন্য আধ আনা; (৬) কুড়ি তোলার অধিক কিন্তু চল্লিশ তোলার অনধিক চারি আনা, তদূর্দ্ধে প্রতি চল্লিশ তোলা বা তাহার ভগ্নাংশে।০; (৭) চিঠী প্যাকেট অথবা ঘরে প্রস্তুত পোষ্টকার্ড বেয়ারিং পাঠাইলে উহার প্রকৃত মাশুলের দ্বিগুণ, বেয়ারিং না দিয়া কম মাশুল দেওয়া হইলে, যে পরিমাণ কম, কেবল তাহারই দ্বিগুণ এবং রেজেষ্টরী করা বেয়ারিং প্যাকেট স্থলে প্রকৃত মাশুল এবং রেজেষ্টারী ফি, যাহার নামে ঐ পত্রাদি, তাহার নিকট দাবী করা হইবে।

সহজ শিল্প।

(পাকা চুলের কলপ প্রস্তুত।)

১। আধ ছটাক জলে, ৫ কুঁচ ওজনের পাইরোগালিক এসিড গুলিবে, তাহা হইলে, পাকা চুলের কলপ হইবে।

২। মাখন, চর্ব্বি বা ঘৃতের সহিত নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি একত্র করিলে চুলের কলপ হয়। দ্রব্যগুলি যথা,—কষ্টিক ৫ আনা ওজন, ক্রিম অব টার্টার ৫ আনা ওজন এবং লাইকর এমোনিয়া অর্দ্ধ কাঁচ্চা।

৩। সুগর অব লেড ১ ভাগ এবং কলিচুণ ২ ভাগ একত্র করিয়া গুড়া করিবে, পরে জল মিশ্রিত করিয়া কাদার মত করিয়া চুলে ব্যবহার করিবে।

৪। কষ্টিক ১ অংশ, নাইট্রিক এসিড ২ অংশ, লৌহচূর্ণ ২ অংশ, সফেদা ২ অংশ, চর্ব্বি বা মাখন ৩ অংশ। এই কয় দ্রব্য একত্র করিয়া ৪।৫ ঘণ্টা রাখিয়া পরে ব্যবহার চলিবে।

৫। রৌপ্যচূর্ণ ২৷৷০ আনা, লৌহচূর্ণ ৪ আনা, নাইট্রিক এসিড অর্দ্ধ কাঁচ্চা, বৃষ্টির জল এক কাঁচ্চা। এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া অগ্নির তাপে ফুটাইবে। লৌহ ও রৌপ্য দ্রব হইয়া যাইলে, জ্বাল হইতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া লইয়া, পরে গাঢ়তা অনুসারে পরিষ্কার জল মিশাইয়া ব্যবহার করিবে।

৬। দুই ভাগ কষ্টিক জলে গুলিয়া অগ্রে মাথায় দিবে, তাহার পর ১ ভাগ হাইড্রোসলফেট অব এমোনিয়া ১০ ভাগ জলে মিলাইয়া মাথায় মাখিবে। তৎক্ষণাৎ চুল ঘোর কাল হইবে।

উপরে যে সকল কলপের কথা বলা হইল, উহা সাবধানে ব্যবহার করিবে। ব্রুস দিয়া মাখিবে। কলপ মাত্রেই বিষাক্ত পদার্থে নির্ম্মিত হয়। বিশেষতঃ কষ্টিক-যুক্ত কলপগুলি (ছুলীরোগের ঔষধ) চামড়ায় লাগিলে, চামড়া পর্য্যন্ত কাল হইয়া যাইবে। চুলে কলপ মাখাইয়া, চুল কাল হইলেই মস্তক বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। নূতন চুল উঠা পর্য্যন্ত কলপ স্থায়ী হইবে জানিবে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম মতে চুলে কলপ দেওয়া দোষ, ইহা যেন সকলেই মনে রাখিয়া কার্য্য করেন। চুলের গোড়ায় কৈশিক শিরায় রক্ত চলাচল ভাল না হইলে, অথবা উহার বিকৃতি ঘটিলে চুল সাদা হইয়া যায়। চুলের কালবর্ণ কেবল রক্তের জন্য। রক্তের রূপান্তর দুগ্ধ, চুল, নখ প্রভৃতি। যাহা হউক, পয়সা বেশী খরচ হইবে না, বিষাক্ত হইবারও আশঙ্কা থাকিবে না, অথচ চুল কাল হইবে।

অল্প জলে সাজিমাটী গুলিয়া, সেই জল চুলে দিয়া চুল ভিজা থাকা অবস্থায় উহাতে মিসি লাগাইয়া দিলেই সব লেঠা মিটিয়া যাইবে।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
২য় খণ্ড, ৮ম সংখ্যা ; আশ্বিন, ১৩০৯ সাল।

কাসাভা আলুর চাষ।

(১)

(লেখক—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়,—M. A, M. R. A. C, and F. H. A. S.)

ইহার অপর নাম সিমুল আলু। দুর্ভিক্ষের সময় যাঁহারা পল্লিগ্রাম অঞ্চলে যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সকল ফসল সমভাবে নষ্ট হয় নাই এবং কয়েকটী ফসল অনাবৃষ্টি সত্বেও সুন্দর জন্মিয়াছে। তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, দরিদ্র লোকে দুর্ভিক্ষের সময় এমন সকল সামগ্রী অধিক পরিমাণে আহার করিয়া চাউলের সুসার করিয়াছে, যে সকল সামগ্রী লোকে সচরাচর আহারের আনুষঙ্গিক মাত্র বলিয়া গণ্য করে। যথা,—ধান্য, গোধূম ও যব এক কালে বা আংশিকরূপে নষ্ট হইলেও, স্থানে স্থানে অড়হর, কলাই, ছোলা, ভুট্টা, কাওন, বাজরা, জুয়ারি, চীনা, খাম্‌আলু, সুতনী আলু, শকরকন্দ আলু, পটল, সজনা, ডুমুর, ফুটী, খরমুজ, এই সকল উত্তম ভাবে অথবা মধ্যম ভাবে জন্মিয়াছে। এই সকল সামগ্রী চাউলের পরিবর্ত্তে প্রচুর পরিমাণে লোকে ব্যবহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছে। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে আমি দেখিয়াছি, অনেক শ্রমজীবী দিবাভাগে ফুটী ও কাঁকুড় খাইয়া ও রাত্রিকালে কেবল কিছু ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। ঐ সময়ে দুই আনার চাউলের ভাত খাইয়া লোকের পেট ভরে নাই ; কিন্তু এক পয়সার ফুটী বা পটল খাইয়া পেট ভরিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, দুর্ভিক্ষের সময় দুধ, মাছ প্রভৃতি কয়েকটী সামগ্রীর দর বৃদ্ধি হয় নাই। ভাত অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর খাদ্য, যথা—পটল, ডুমুর, কলাই, দধি, মৎস্য প্রভৃতি সামগ্রী অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। বস্তুতঃ দুর্ভিক্ষ দ্বারা অনেক লোকের একটী শিক্ষা হইয়াছে যে, ভাত না খাইয়াও জীবন ধারণ করা যায়, এবং চাউল ভিন্ন আরও পাঁচ রকম ফসল, যথা—ভুট্টা, কাওন, দে-ধান, ভাদুই কলাই, অড়হর, ওল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের চাষ ধান্যের চাষ অপেক্ষা স্বল্প লাভজনক, এ সকল জন্মান, বস্তুতে একটী

রজ্জু না লাগাইয়া অনেক গুলি রজ্জু লাগানের সদৃশ। কোন গতিকে একটী ফসল লোকসান হইলে, আর পাঁচটীর দ্বারা জীবনধারণ হইতে পারে। এই সকল ফসল জন্মাইতে ধান্যের ন্যায় এত অধিক জল আবশ্যক করে না। এ সকল ফসল স্বল্পকাল স্থায়ী বর্ষা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

যে সকল ফসলের কথা বলিতেছি, এ সকল জন্মানের পক্ষে একটী না একটী প্রতিবন্ধক আছে। (১) হয়ত ইহাদের ফসল কম, (২) নয় ত উহারা সহজে হজম হয় না, (৩) নয় ত উহারা মুখরোচক নহে, (৪) আর নয় ত উহাদের অনেক দিবস ধরিয়া রক্ষা করিয়া ব্যবহার করা সুকঠিন। আজ আমি একটী ফসলের কথা বলিব, যাহা উক্ত কয়েকটী ফসল অপেক্ষাও সহজে অনাবৃষ্টিতে জন্মান যাইতে পারে, যাহা কি আওতাতে, কি খোলা স্থানে, সকল স্থানেই জন্মান যাইতে পারে, যাহা পুষ্টিকর ও মুখরোচক খাদ্য উৎপাদন করে, যাহা মূলাবস্থায় টাট্‌কা ব্যবহারও করা যাইতে পারে, অথবা যাহা হইতে ময়দা প্রস্তুত করিয়া অনেক দিবস পর্য্যন্ত রাখিয়া ব্যবহার করাও যাইতে পারে, যাহার ময়দা গমের ময়দা অপেক্ষা অধিক দিবস অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়, যাহা হইতে বিঘা প্রতি যে পরিমাণ নিট শুষ্ক খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়, এরূপ আর কোন ফসল হইতে পাওয়া যায় না, যাহা বঙ্গদেশের নিম্ন প্রদেশে অতি অল্পায়াসেই জন্মান যায়।

প্রথমেই কেহ আপত্তি করিতে পারেন, যে ফসলের বিষয় আমি বলিতে চাহিতেছি, সে সকলেরই জানা আছে; উহা হইতে 'ট্যাপিওকা' নামক যে খাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহা বাঙ্গালীর মুখে কখনই রুচিবে না, উহার আবাদ এদেশে করা বৃথা। আমি নিজেও 'ট্যাপিওকা' সুখাদ্য বলিয়া গণ্য করি না এবং ট্যাপিওকা প্রস্তুতের পক্ষপাতী আমি নহি। 'কাসাভা'র মূল সিদ্ধ করিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর লোকে খাইয়া থাকে এবং সিদ্ধ করা 'কাসাভা' মূল মান্দ্রাজের রাজপথে বিক্রীত হইতে আমি দেখিয়াছি। 'কাসাভা' মূল সিদ্ধ করিয়া খাইতে মন্দ লাগে না; কিন্তু টাট্‌কা মূল কত দিন রাখা যাইতে পারে? আলু কিছু দিন রাখিলে পচিয়া যায়, 'কাসাভা' মূল কিছুদিন রাখিলে শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় হইয়া যায়। এই শুষ্ককাষ্ঠ হইতে ময়দা প্রস্তুত করিবার কোন উপায় বাহির হয় নাই; কিন্তু টাট্‌কা মূল হইতে ময়দা প্রস্তুত করা অতি সহজ, এবং ময়দা অবস্থায় এ সামগ্রী অনেক দিবস রাখা যায় এবং নানাবিধ সুখাদ্য যে এই ময়দা হইতে উৎপন্ন করা যাইতে পারে, তাহা আপনারা আস্বাদ করিয়া দেখিবার সুবিধা এখানে পাইবেন।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ 'কাসাভা'—গাছ জন্মানে একটী বিশেষ সুবিধা আছে। এই গাছের মূল প্রতি বৎসরে না উঠাইয়া লইলেও চলে। কৃষক আপনার কোন ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে এই গাছের বেড়া দিয়া রাখিয়া, যে বৎসর তাহার সাধারণ অন্যান্য ফসলে লোক্‌সান হইবে, সেই বৎসর কাসাভা গাছগুলির মূল উঠাইয়া আহারার্থে ব্যবহার করিতে পারে। যে বৎসর তাহার ফসল ভাল জন্মিল, সে বৎসর সে যদি 'কাসাভা' গাছের কোনই পাইট্ না করে, তাহাতেও কোন ক্ষতি হয় না। ভাল রকমে জমি প্রস্তুত করিয়া একবার গাছ গুলি জন্মাইয়া লইতে পারিলে কয়েক মাসের মধ্যেই গাছগুলি এত উচ্চ হইয়া উঠিবে যে, গরু ছাগলে উহাদের পাতা লোক্‌সান করিতে পারিবে না। মৃত্তিকার মধ্যে মূলগুলি সংখ্যাতে ও আয়তনে ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইবে। যে বৎসর অন্যান্য ফসল নষ্ট হইবে, সেই বৎসর ভিন্ন অন্য বৎসরে মূলগুলি না উঠাইলেও চলে।

তবে, ১০।১২ মাস অন্তর একবার করিয়া মূল গুলি ব্যবহার করিয়া লইয়া, রীতিমত বৎসরে একবার করিয়া 'কাসাভার' চাষ করাতে লাভ অধিক হয়। এক বৎসর পরে মূলের মধ্যে ময়দার ন্যায় সামগ্রীটীর সঞ্চয় ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। মূল বৃদ্ধির অনুপাত প্রথম বৎসরে যেরূপ অধিক হয়, পরে সেরূপ অধিক হয় না। কৃষকদের মধ্যে এই ফসলটী প্রচলিত করিতে গেলে প্রথমে তাহাদিগকে বেড়ার গাছ রূপে লাগাইবার পরামর্শ দেওয়াই ভাল, নতুবা উহাদের সাধারণ কৃষিকার্য্যের পরিমাণ কমিয়া যাওয়াতে উহারা মনঃক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কৃষকদিগের উপকারার্থে ইহা করিতে গেলে "ঢেঁস্‌কেল দিয়ে কটক" লইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। উপকার করিতে গেলেও ধীরভাবে, সহিষ্ণুভাবে, উহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। দারিদ্র্য দোষে উহারা স্বভাবতঃই সন্দিহানচিত্ত। যদি আপনারা কোন কৃষককে বলেন, "তোর একখানা জমিতে এবৎসর ধান বা কলাই বা পাট না লাগাইয়া 'কাসাভা' লাগাইয়া দেখ" সে অমনই সন্দেহ করিবে,—উহা দ্বারা আপনি আপনার স্বকীয় কোন অভিসন্ধি সাধিত করিয়া লইতে চাহেন। (ক্রমশঃ)

পাথুরে কয়লা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কয়লার উৎপত্তি-তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে ভাবিয়া দেখিলে ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে, এক স্থানে ইদারা কাটিলে দুই, তিন কিংবা ততোধিক কয়লার স্তর পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অতি বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের এত পরিবর্ত্তন কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে এবং কি উপায়েই বা তাহারা বালিমাটী দ্বারা আবৃত হইতে পারে, ইহা যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা বঙ্গদেশেই ৪০০ বৎসরের মধ্যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা যদি ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে সমস্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। ত্রিবেণীর নিম্নস্থ সরস্বতী নদী আজকাল অতি ক্ষুদ্রখালে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা অতি প্রকাণ্ড নদী ছিল। এই নদী দিয়া পর্ত্তুগীজদিগের বড় বড় জাহাজ ইহার তীরস্থ বিখ্যাত সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করিতে আসিত। ভাগীরথীর অবস্থা তখন সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের ছিল, কারণ ইহা তখন একটী প্রকাণ্ড নদী ছিল। বঙ্গের নদনদীর তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, পদ্মা তখন অতি ক্ষুদ্র নদী ছিল এবং ভাগীরথী তখন বঙ্গের প্রধান নদী ছিল। বরেন্দ্রভূমি, রঙ্গপুর, দিনাজপুর অঞ্চল আজকাল বিল ও জলাভূমিতে পরিপূর্ণ হইয়া পীড়ার আকর হইয়াছে, কিন্তু তখন ইহার অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। সেই সময়ে একটী ভয়ানক ভূমিকম্প হয় ও সেই ভূমিকম্পে সমগ্র বরেন্দ্রভূমি বসিয়া যায়, ও গঙ্গার মুখ ফিরিয়া বর্ত্তমান পদ্মার উৎপত্তি হয়; এবং ভাগীরথী ও এই অঞ্চলের সমস্ত নদী ক্রমে মজিয়া গিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে; সুতরাং বঙ্গও ম্যালেরিয়ার আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে চিরাপুঞ্জির ভয়ানক ভূমিকম্পের কথা নিশ্চিতই সকলের স্মৃতিপথে জাগরূক আছে। চিরাপুঞ্জি হইতে কম্পন আরম্ভ হইয়া সমগ্র আসাম, বঙ্গ ও বিহার অত্যন্ত কাঁপিয়াছিল। বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, ইহাতে আসামের ভূমির অনেক স্থান বসিয়া গিয়াছে এবং অনেক স্থান উচ্চ হইয়াছে। দুই একটী নদীর গর্ভ এই প্রকারে উচ্চ হওয়ায় এবং তাহার পার্শ্বস্থিত জমি পূর্ব্ববৎ নিচু থাকায়, বর্ষাকালে সে সমস্ত জমী এই কম্পনের পর হইতে প্রতিবৎসর জলে ভাসিয়া যায়।

এই ব্যাপারের সহিত কয়লার উৎপত্তির কারণের তুলনা করিলে সেই সাদৃশ্য অনায়াসে লক্ষিত হইবে। অনেকে বলিতে পারেন যে, কয়লার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে যে প্রকার জমি বসিয়াছিল ধরিতে হয়, তাহার তুলনায় আসামে যাহা হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধানে স্থির করিয়াছেন যে, ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরি আভ্যন্তরিক গলিত পদার্থের মধ্যে কোনও প্রকার গোলযোগ হইতে উৎপত্তি হয়। আজ কয়েক দিবস হইল, আমেরিকার সেণ্টপীরিতে আগ্নেয় গিরির গলিত পদার্থের উদ্গীরণে কি ভয়ানক ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তাহা সকলেই বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে যদিও চাক্ষুষ কোনও আগ্নেয় গিরির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি অতি পুরাকালে যে এই প্রকারের আগ্নেয় গিরি অনেক ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আগ্নেয় গিরি হইতে যে প্রকার গলিত পাথর বিক্ষেপিত হয়, বঙ্গে ও ভারতবর্ষে অনেক স্থানেই এ প্রকার পাথর পাওয়া যায়।

গিরীডি, দেওঘর, রাণীগঞ্জ এবং ঝরিয়া অঞ্চলে যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই ডাইকের (Dyke) কথা শুনিয়া থাকিবেন। ডাইক্ এই প্রকার আগ্নেয় প্রস্তরের একটি বিশেষ সমষ্টি। কয়লার খনি অঞ্চলে এ প্রকার ডাইক্ যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ডাইকের উভয় পার্শ্বস্থ প্রস্তর সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের—এই অঞ্চলের সাধারণ বেলে কিংবা মেটে পাথর (Sandstone or shale) ও ভারতবর্ষের সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভূমি ডাইক্ অথবা আগ্নেয় পাথরে (Deccan trap) আবৃত। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, বসুধার বক্ষঃস্থল স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গলিত আগ্নেয় প্রস্তর উদ্গীর্ণ হইয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভূমি প্লাবিত করিয়াছিল। আজ আমেরিকার সেণ্টপীরির সামান্য আগ্নেয়গিরি-ব্যাপারে আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে ইউরোপীয় স্পেন, ফ্রান্স পর্য্যন্ত কাঁপিল, আর কিছুদিন পূর্ব্বে চেরাপুঞ্জীর সামান্য কম্পনে সমগ্র আসাম, বঙ্গ ও বেহারে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন দেখি, যখন এই সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডাইকগুলি শাখা প্রশাখা লইয়া পৃথিবীর বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া সজোরে উপরে উত্থিত হইয়া, এমন কি দিগদিগন্ত প্লাবিত করিয়াছিল, তখন কি ভয়ানক কাণ্ডই হইয়াছিল, কি ভীষণ জগৎবিধ্বংসকারী কম্পনে পৃথিবী আলোড়িত করিয়াছিল! কত দেশ বসিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত হইয়াছিল, কতস্থান উৎক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছিল, কত নদ নদী একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল, এবং জমীর আকার পরিবর্ত্তনে কত

পাথুরে কয়লা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কয়লার উৎপত্তি-তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে ভাবিয়া দেখিলে ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে, এক স্থানে ইঁদারা কাটিলে দুই, তিন কিংবা ততোধিক কয়লার স্তর পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অতি বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের এত পরিবর্ত্তন কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে এবং কি উপায়েই বা তাহারা বালিমাটী দ্বারা আবৃত হইতে পারে, ইহা যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা বঙ্গদেশেই ৪০০ বৎসরের মধ্যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা যদি ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে সমস্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। ত্রিবেণীর নিম্নস্থ সরস্বতী নদী আজকাল অতি ক্ষুদ্রখালে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা অতি প্রকাণ্ড নদী ছিল। এই নদী দিয়া পর্ত্তুগীজদিগের বড় বড় জাহাজ ইহার তীরস্থ বিখ্যাত সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করিতে আসিত। ভাগীরথীর অবস্থা তখন সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের ছিল, কারণ ইহা তখন একটী প্রকাণ্ড নদী ছিল। বঙ্গের নদনদীর তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, পদ্মা তখন অতি ক্ষুদ্র নদী ছিল এবং ভাগীরথী তখন বঙ্গের প্রধান নদী ছিল। বরেন্দ্রভূমি, রঙ্গপুর, দিনাজপুর অঞ্চল আজকাল বিল ও জলাভূমিতে পরিপূর্ণ হইয়া পীড়ার আকর হইয়াছে, কিন্তু তখন ইহার অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। সেই সময়ে একটী ভয়ানক ভূমিকম্প হয় ও সেই ভূমিকম্পে সমগ্র বরেন্দ্রভূমি বসিয়া যায়, ও গঙ্গার মুখ ফিরিয়া বর্ত্তমান পদ্মার উৎপত্তি হয়; এবং ভাগীরথী ও এই অঞ্চলের সমস্ত নদী ক্রমে মজিয়া গিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে; সুতরাং বঙ্গও ম্যালেরিয়ার আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে চিরাপুঞ্জির ভয়ানক ভূমিকম্পের কথা নিশ্চিতই সকলের স্মৃতিপথে জাগরূক আছে। চিরাপুঞ্জি হইতে কম্পন আরম্ভ হইয়া সমগ্র আসাম, বঙ্গ ও বিহার অত্যন্ত কাঁপিয়াছিল। বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, ইহাতে আসামের ভূমির অনেক স্থান বসিয়া গিয়াছে এবং অনেক স্থান উচ্চ হইয়াছে। দুই একটী নদীর গর্ভ এই প্রকারে উচ্চ হওয়ায় এবং তাহার পার্শ্বস্থিত জমি পূর্ব্ববৎ নিচু থাকায়, বর্ষাকালে সে সমস্ত জমী এই কম্পনের পর হইতে প্রতিবৎসর জলে ভাসিয়া যায়।

এই ব্যাপারের সহিত কয়লার উৎপত্তির কারণের তুলনা করিলে সেই সাদৃশ্য অনায়াসে লক্ষিত হইবে। অনেকে বলিতে পারেন যে, কয়লার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে যে প্রকার জমি বসিয়াছিল ধরিতে হয়, তাহার তুলনায় আসামে যাহা হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধানে স্থির করিয়াছেন যে, ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরি আভ্যন্তরিক গলিত পদার্থের মধ্যে কোনও প্রকার গোলযোগ হইতে উৎপত্তি হয়। আজ কয়েক দিবস হইল, আমেরিকার সেণ্টপীরিতে আগ্নেয় গিরির গলিত পদার্থের উদ্গীরণে কি ভয়ানক ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তাহা সকলেই বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে যদিও চাক্ষুষ কোনও আগ্নেয় গিরির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি অতি পুরাকালে যে এই প্রকারের আগ্নেয় গিরি অনেক ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আগ্নেয় গিরি হইতে যে প্রকার গলিত পাথর বিক্ষেপিত হয়, বঙ্গে ও ভারতবর্ষে অনেক স্থানেই এ প্রকার পাথর পাওয়া যায়।

গিরীডি, দেওঘর, রাণীগঞ্জ এবং ঝরিয়া অঞ্চলে যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই ডাইকের (Dyke) কথা শুনিয়া থাকিবেন। ডাইক্ এই প্রকার আগ্নেয় প্রস্তরের একটি বিশেষ সমষ্টি। কয়লার খনি অঞ্চলে এ প্রকার ডাইক্ যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ডাইকের উভয় পার্শ্বস্থ প্রস্তর সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের—এই অঞ্চলের সাধারণ বেলে কিংবা মেটে পাথর (Sandstone or shale) ও ভারতবর্ষের সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভূমি ডাইক্ অথবা আগ্নেয় পাথরে (Deccan trap) আবৃত। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, বসুধার বক্ষঃস্থল স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গলিত আগ্নেয় প্রস্তর উদ্গীর্ণ হইয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভূমি প্লাবিত করিয়াছিল। আজ আমেরিকার সেণ্টপীরির সামান্য আগ্নেয়গিরি-ব্যাপারে আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে ইউরোপীয় স্পেন, ফ্রান্স পর্য্যন্ত কাঁপিল, আর কিছুদিন পূর্ব্বে চেরাপুঞ্জীর সামান্য কম্পনে সমগ্র আসাম, বঙ্গ ও বেহারে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন দেখি, যখন এই সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডাইকগুলি শাখা প্রশাখা লইয়া পৃথিবীর বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া সজোরে উপরে উত্থিত হইয়া, এমন কি দিগদিগন্ত প্লাবিত করিয়াছিল, তখন কি ভয়ানক কাণ্ডই হইয়াছিল, কি ভীষণ জগৎবিধ্বংসকারী কম্পনে পৃথিবী আলোড়িত করিয়াছিল! কত দেশ বসিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত হইয়াছিল, কতস্থান উৎক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছিল, কত নদ নদী একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল, এবং জমীর আকার পরিবর্ত্তনে কত

আমাদের দেশে কয়লা হইবার সময়ে ও পূর্ব্বে ইহার ভৌগোলিক অবস্থা কি প্রকারের ছিল, তাহা ভাবিলে বড়ই বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। কেহ কি ভাবিতে পারেন যে, প্রখর রৌদ্র কিরণসন্তপ্ত গিরিডি পূর্ব্বে বরফে আবৃত ছিল, কিংবা সেখানে বরফের নদী (Glacier) বহিত, অথবা সে স্থান গভীর জলে আবৃত ছিল এবং বড় বড় বরফের স্তূপ (Ice-berg) সেখানে ভাসিয়া আসিত। এমন কি অনেকে অনুমান করেন, রাণীগঞ্জ অঞ্চলেও বরফের নদী (Glacier) ছিল। বরফের নদী সম্বন্ধে যদি বা নিশ্চয় না বলিতে পারা যায়, গিরিডিতে যে পূর্ব্বে বরফের স্তূপ (Iceberg) ভাসিয়া আসিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রকার বরফস্তূপ বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর মেরু প্রদেশেই ভাসিয়া যাইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত বরফস্তূপ মধ্যে অনেক ভাঙ্গা পাথর এবং পাথরের নুড়ি থাকে; অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রদেশে তাহারা ভাসিয়া গিয়া কোন দ্বীপে বাধিলে সেই খানে তাহারা গলিয়া যায়, এবং তন্মধ্যবর্ত্তী প্রস্তরগুলি সেখানে পড়িয়া যায়। এই বরফের স্তূপের মধ্যবর্ত্তী প্রস্তরগুলিতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট কতকগুলি চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ইহা দেখিয়া অনায়াসে তাহাদের উৎপত্তি নির্ণয় করা যায়। গিরিডির অতি মিহি মেটে পাথরে গঠিত তালচির প্রস্তর রাশির মধ্যে স্থানে স্থানে এই প্রকার চিহ্নিত বড় প্রস্তর সমষ্টি দেখিয়া কয়লা জন্মাইবার পূর্ব্বে সেখানে বরফস্তূপ আসিত স্থির করা যায়।

রাণীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী তপসি নামক স্থানে স্তরে স্তরে বড় বড় কতকটা গোলাকৃতি প্রস্তর (boulders) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রস্তরগুলি ওজনে ২৫।৩০ মণ পর্য্যন্ত হয় এবং ইহাদের জন্ম আগ্নেয় প্রস্তর (igneous rock) হইতে। কঠিন প্রস্তর খণ্ড কি করিয়া গোল কিংবা সেই ভাবের কোন আকৃতি ধারণ করে? কেহ বর্ষাকালে কোন পার্ব্বত্য নদীর তীরে যাইয়া একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, জলস্রোতে বাহিত হইয়া পাথরগুলি—কি ভাবে ঘর্ষিত হইতেছে। এমন কি, অধিক বৃষ্টির পরে পাথরে পাথরে ঘর্ষণজন্য একটী তীব্র গন্ধ বাহির হয়। এই সব নদীর ধারে ঈষদ্ঘর্ষিত হইতে সম্পূর্ণ গোলাকৃতি পাথর পাওয়া যায়। এই সমস্ত দেখিয়া স্থির করা যায়, সাধারণতঃ জলস্রোত হেতু ঘর্ষণ ভিন্ন পাথর গোল হইবার আর কোন কারণ নাই। ইহাতে তপসির বড় বড় গোল পাথর দেখিয়া স্থির করা যায়, নিকটে কোন আগ্নেয় পাথরের পাহাড় ছিল; যদিও এখন তাহার কোন চিহ্ন নাই, এবং খরতর জলস্রোতে বাহিত হইয়া পাথরগুলি এই ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন দেখি, যে জলস্রোত ২৫।৩০ মণ ওজনের পাথর অনায়াসে ভাসাইয়া আনিয়া যেখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে, সে জলস্রোত কি ভয়ানক ছিল।

(ক্রমশঃ)

কোলারের স্বর্ণখনি।

কোলার জেলা মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত। মাদ্রাজ রেলওয়ের বাউরিং-পেট নামক ষ্টেশন হইতে স্বর্ণখনির দিকে দশ মাইল লম্বা একটী সোজা রেল-লাইন গিয়াছে। এই লাইনটীর নাম গোল্ড-ফীল্ডস্-ষ্টেট-রেলওয়ে। এই লাইনের শেষ পাঁচ মাইলের আশে পাশে সমস্ত স্বর্ণখনি। খনি সমূহের মধ্যে মহীশূর এবং চ্যাম্পিয়ন রীফ খনিই প্রসিদ্ধ। অন্যান্য খনিতে এই দুই খনির সমান লাভ হয় না। খনি সমূহ হইতে প্রতি মাসে প্রায় ৩০।৩২ মণ সোণা উত্তোলিত হইয়া থাকে। মহীশূর-গবর্ণমেণ্ট উত্তোলিত সোণার শতকরা পাঁচ ভাগ রাজস্বস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহাতে মহীশূর গবর্ণমেণ্টের বৎসরে ১৪ লক্ষ টাকা লাভ হয়। মহীশূর এবং চ্যাম্পিয়ন রীফ খনিতে অত্যন্ত লাভ। এই দুই খনির অংশীদারগণের বাৎসরিক লাভের হার শতকরা ১২৫ হইতে ১৫০ টাকা; অর্থাৎ এক বৎসরেই অংশীদারগণ মূলধনের প্রায় দেড় গুণ লাভ পাইয়া থাকেন।

লোহার খনিতে লোহা পাওয়া যায় যথেষ্ট, কিন্তু তাহা অক্সিজেন প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই মিশ্র পদার্থ হইতে উত্তাপ দ্বারা এবং অন্যান্য উপায়ে লোহাকে পৃথক করিয়া লইতে হয়। অন্যান্য ধাতু সাধারণতঃ বিভিন্ন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। সোণা কিন্তু অন্য কোন বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া কোন রাসায়নিক মিশ্রপদার্থ ভাবে খনিতে থাকে না। অনেক খনির ভিতর সোণার বড় বড় টুকরা (nugget) পাওয়া যায়। ক্লণ্ডাইক নামক স্থানের খনিতে সোণার টুকরা সর্ব্বদা পাওয়া যায়। কোলারে বড় বড় টুকরা এক রকম পাওয়া যায় না বলিলেই হয়, কিন্তু ছোট টুকরা অনেক সময় পাওয়া গিয়াছে। খনির অধিকাংশ সোণা কিন্তু এই ভাবে বহির্গত হয় না। সোণা অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া রাসায়নিক মিশ্রপদার্থ না হইলেও ইহার

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাসমূহ কোয়ার্টস্ (quartz) প্রভৃতি অতি কঠিন পাথরের রেণু (particles) সকলের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এই পাথর হইতে সোণার কণাগুলিকে বাহির করিয়া লওয়া খনির একটী প্রধান কাজ। কোলারের খনি সমূহে স্বর্ণমিশ্রিত কোয়ার্টস্ পাথর ৩০০ হইতে ২০০০ ফুট নীচে পাওয়া যায়। প্রত্যেক খনিতে নীচে যাইবার জন্য ২।৪ বা ততোধিক গর্ত্ত বা কূপ আছে। এই গর্ত্তের এক পাশে দুইখানা করিয়া মই আছে। একখানা নীচে যাইবার জন্য, অপরখানা উপরে উঠিবার জন্য। গর্ত্তের অপর পার্শ্বে একটী লোহার বাক্স কলের সাহায্যে উপরে উঠে এবং নীচে নামে। এই বাক্সে দাঁড়াইয়া লোক উপরে নীচে যাতায়াত করে। তা ছাড়া নীচে থেকে পাথরও এই বাক্সে পুরিয়া উপরে উঠান হইয়া থাকে।

খনির ভিতর অন্ধকারময়। খনক এবং মজুরগণ হাতে কিংবা টুপির উপর চর্ব্বির বাতি রাখিয়া কাজ-কর্ম্ম করে। কয়লার খনিতে যেমন নানা রকম গ্যাস (fire damp etc) জ্বলিয়া উঠিবার ভয় আছে, স্বর্ণখনিতে তাহা নাই। সুতরাং স্বর্ণখনিতে কোন রকম সেফটিল্যাম্প (আপন্নিবারক আলোকের) ব্যবস্থা নাই। স্বর্ণখনির নিম্নের গর্ত্ত কয়লার খনির মত বহু বিস্তৃত নহে। যে দিকে স্বর্ণ সংযুক্ত কোয়ার্টস্ প্রভৃতি পাওয়া যায়, কেবল সেই দিকেই গর্ত্ত করিয়া সুড়ঙ্গের মত করা হয়। খনির ভিতর যাইবার যে ২।৪টী কূপ বা গর্ত্ত আছে, তাহার একটী হইতে অপর গুলিতে যাইবার জন্য সুবিধা আছে।

যে পাথরে সোণার পরিমাণ এত আছে যে, তাহা বাহির করিলে ব্যয় কুলাইয়া লাভ দাঁড়াইবে, সেই সব পাথর খনি হইতে উত্তোলিত হইয়া উপরে কলঘরে যায়। এই স্থানে এই পাথরকে কলের সাহায্যে ময়দার মত করিয়া গুঁড়া করা হয়। এই গুঁড়ার ভিতর সোণার গুঁড়াও আছে। পাথরের গুঁড়া হইতে সোণার গুঁড়া পৃথক করিবার জন্য প্রথমতঃ মিশ্রিত গুঁড়াকে জলের সহিত মিশান হয়, পরে এই জল বড় বড় পাত্রে রক্ষিত পারার উপর নীত হয়। একজন ইংরেজ-কর্ম্মচারী পাথরের গুঁড়া মিশ্রিত জল ও পারা উভয়কে কিছুকাল উলট পালট করিয়া নাড়া চাড়া করেন। ইহার ফলে সোণার রেণুগুলি পারার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। জল ও পাথরের গুঁড়া পারার উপর ভাসিতে থাকে, এবং পরে তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়। ক্রমান্বয়ে কিছুকাল এইরূপ করিলে সোণার সহিত মিশ্রিত হইয়া পারা ক্রমেই গাঢ় হইতে থাকে। এই গাঢ় পারার নাম (amalgam) এমালগাম। এই গাঢ় পারায় যথেষ্ট সোণা থাকে। এমালগাম এখন রাসায়নিক গৃহে নীত হয়। এইখানে পারা হইতে সোণাকে পৃথক করা হয়, এবং সোণার সহিত অপর কোন ধাতু মিশ্রিত হইয়া থাকিলে সে সমস্ত পৃথক করিয়া সোণার নির্দ্দিষ্ট আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইট প্রস্তুত হয়। এই সব সোণার টুকরা বা ইটে প্রত্যেক খনির নাম নম্বর প্রভৃতি থাকে।

এই সোণা কোলারে বা ভারতবর্ষের কোথাও বিক্রয় হয় না; কোলার হইতে বোম্বাই হইয়া সোজাসুজি বিলাত যায়। প্রস্তাব হইয়াছিল, বোম্বাইয়ের টাঁকশালে সভারিন প্রস্তুত হইবে। তাহা হইলে এই সোণা বোম্বাই সহরেই ব্যবহৃত হইত; কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যে গাড়ীতে (ব্রেকভানে) সোণা বোঝাই যায়, তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রস্তুত। লোহার সিন্দুক গাড়ীর ফ্রেমের সহিত একত্র তৈয়ারী। দুইজন রিভলভারধারী গার্ডকে সোণার গাড়ীতে (ব্রেকভানে) সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকিতে হয়।

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, "লঙ্কায় সোণা শস্তা।" স্বর্ণলঙ্কাপুরীতে সোণা শস্তা কি না জানি না, তবে সাধু লোকের পক্ষে কোলারের সোণা ত শস্তা নয়ই, বরং দুষ্প্রাপ্য। তবু এক শ্রেণীর লোকের নিকট সোণা শস্তা বটে। যেখানে টাকা পয়সা কাপড় চোপড়, সেইখানেই চোর ও চুরি দেখিতে পাই; আর সোণার খনিতে কি চোর নাই?

স্বর্ণখনির চোরের বৃত্তান্ত অদ্ভুত। কি প্রকারে খনির মজুরেরা সোণা চুরি করে, তাহা সবিস্তার লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায় এবং বীভৎস রসেরও অবতারণা করিতে হয়। সুতরাং সে সমস্ত লিখিবার দরকার নাই। শুধু যে "নেটিব" কুলিই চোর তা নয়। অনেক ইংরেজ, এমন কি খনির উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে চৌর্য্যাপরাধে শ্রীমন্দির দর্শন করিতে হইয়াছে।

দেশী রাজ্যে ইংরেজের মূলধনে সোণার খনির কাজ হয়; সুতরাং তথায় বহু ইংরেজের বাস। ইহাতে সময় সময় দেশীয় রাজদরবারকে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। কোন দেশীয় রাজার ক্ষমতা নাই যে, বৃটিশ-বরন্ (British-born) প্রজার বিচার

করেন। সুতরাং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কোলার স্বর্ণখনির স্পেশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট, জষ্টিস্ অব দি পীস্ (Justice of the Peace) নিযুক্ত হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে ইনি রাজার-ভৃত্য। সুতরাং ইহাঁর ক্ষমতা নাই যে ইংরেজের বিচার করেন। তবে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত জষ্টিস অব দি পীস্ বলিয়া ইংরেজ অপরাধীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের বিচার করেন। বড় অপরাধের বিচার মাদ্রাজ হাইকোর্টে হয়। খনির অধ্যক্ষদিগের অনুরোধে মহীশূর গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তির খনিজ পদার্থ উত্তোলনের লাইসেন্স (অনুমতি) নাই, অর্থাৎ যে খনির মালিক বা কর্ম্মচারী নয়, তাহার নিকট কোন খনিজ পদার্থ (যথা, স্বর্ণময় কোয়ার্টস্ অথবা এমালগাম প্রভৃতি) পাওয়া গেলে, সে ব্যক্তিকে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে হইবে, নতুবা সে চোরাই মালের গৃহীতা বলিয়া শাস্তি পাইবে। বৃটিশ ভারতবর্ষে এই রকম মাল যদি অন্য কোন ব্যক্তি সনাক্ত করিতে না পারে, তবে অপরাধীর দণ্ড হয় না। স্বর্ণখনিতে চুরি দমনের জন্যই কেবল কোলার জেলায় এই নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে।

এক জন ইংরেজের টুপিটী অত্যন্ত ভারী বলিয়া সন্দেহ হওয়াতে টুপিটী পরীক্ষা করা হইলে দেখা গেল যে, টুপির ভিতর একরাশ এমালগাম বা স্বর্ণমিশ্রিত পারা। সাহেব যে চুরি করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ নাই। সাহেব টুপি খুলিয়া রাখিয়া কাজ করেন, অন্যে শত্রুতা করিয়াও এমালগাম টুপিতে রাখিতে পারে। জষ্টিস অব দি পীস্ সাহেবকে চুরি অপরাধে চালান দিয়া মহীশূরের বিধান অনুসারে চোরাই মালের গৃহীতা বলিয়া শাস্তি দিলেন। সাহেব আপীল করিলেন মাদ্রাজে। হাইকোর্ট সাব্যস্ত করিলেন, হাকিম মোকর্দ্দমার বিচার করিয়াছেন জষ্টিস অব দি পীস্ রূপে। জষ্টিস অব দি পীস্ ভারতগবর্ণমেণ্টের ভৃত্য, তাঁহার ক্ষমতা নাই যে, তিনি মহীশূরের আইন মত কাহাকেও দণ্ড দেন। অথচ হাইকোর্ট ইহাও সাব্যস্ত করিলেন যে, মহীশূরের আইন অনুসারে আসামীর দণ্ড হওয়া উচিত। সাহেবের বিচার করিবে কে? ম্যাজিষ্ট্রেট রাজার ভৃত্য, ইংরেজের বিচার করিবার অধিকার তাঁহার নাই, সুতরাং চোরাই মাল-গৃহীতা সাহেব বেকসুর খালাস পাইলেন।

আজ এক গাড়ীওয়ালার নিকট ২০০০ টাকার সোণা পাওয়া গিয়াছে, কাল এক কুলীর নিকট ৫০০ টাকা মূল্যের সোণার টুকরা পাওয়া গিয়াছে, এ সব সংবাদ কোলার স্বর্ণখনিতে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। মহারাজার গবর্ণমেণ্ট হইতে বহু পুলিস নিযুক্ত আছে। তা ছাড়া খনির মালিকদিগের পক্ষ হইতে কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিশ কমিসনার সার জন ল্যাম্বার্ট প্রধান পুলিস অফিসর নিযুক্ত আছেন। বহুসংখ্যক ডিটেক্‌টিভ ও চৌকীদার ত আছেই।

যে সব পাথরের গুঁড়াতে সোণার ভাগ কম এবং যে গুঁড়া হইতে পারার সাহায্যে অধিকাংশ সোণা বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে অনেক খনিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অবশিষ্ট সোণা বাহির করা হয়। এই নূতন প্রণালীটী আবিষ্কার হওয়াতে, যে সব খনিতে লোক্‌সান হইত, তাহাতেও এখন লাভ হইতেছে। পূর্ব্বে পারা দ্বারা সোণা বাহির করিবার পর, অবশিষ্ট সোণা বাহির করিবার কোনও উপায় ছিল না।

আজ কাল খনির কল কারখানা সব ষ্টীমের সাহায্যে চলিতেছে। কিন্তু মহীশূর গবর্ণমেণ্ট কাবেরী নদীর জলপ্রপাত বান্ধিয়া সেই জলের বেগ হইতে তাড়িত উৎপন্ন করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। কাবেরীর তাড়িতশক্তি তারের সাহায্যে কোলার স্বর্ণখনিতে আনীত হইবে এবং অল্প ব্যয়ে ষ্টীমের পরিবর্ত্তে স্বর্ণখনির কলকারখানাসমূহ তাড়িত শক্তিতে চালিত হইবে। এই বিষয় শিক্ষার জন্য মহীশূর গবর্ণমেণ্ট শিক্ষিত যুবকদিগকে আমেরিকা পাঠাইতেছেন।

কোলারের স্বর্ণখনিসমূহ আজকাল খুব জাঁকিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও কোলারে খনি হইতে সোণা উঠান নূতন ব্যাপার নহে। বর্ত্তমান খনিসমূহের কাজ করিতে করিতে অনেক সময় প্রাচীন খনির নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন খনির যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন হিন্দুগণ কলকারখানার সাহায্যব্যতীত ৩০০ ফুট নীচে পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিলেন। মাইকেল লাভেলী নামক যে ইংরেজ-সৈনিক খনিজ পদার্থ উত্তোলনের জন্য প্রথম অনুমতির প্রার্থনা করিয়া তাহা প্রাপ্ত হন, তিনিও নাকি লোকের মুখে প্রাচীন কালে এই খান হইতে সোণা উঠিত এই কিম্বদন্তী শুনিয়াই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

প্রাচীনেরা ৩০০ ফুট নীচে হইতেও সোণা উঠাইয়া লাভবান হইতেন। কিন্তু প্রথম প্রথম যে সব ইংরেজ-কোম্পানী সোণা তুলিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার অধিকাংশই ২০০ ফুট নীচে যাইয়াই দেউলিয়া হইতে বাধ্য হন। কেবল মাত্র মহীশূর কোম্পানী ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া কারবার চালাইতে থাকে। মহীশূর কোম্পানীর ম্যানেজার অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি বুঝিতে

পারিয়াছিলেন, আরও কিছু নীচে সোণা আছে। কোম্পানীর ১ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫ টাকার অংশের দাম তখন হইয়াছিল ১০ পেনী অর্থাৎ দশ আনা। অংশীদারদের অধিকাংশই কোম্পানী উঠাইয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ম্যানেজারের পীড়াপীড়িতে আরও কিছু মূলধন বৃদ্ধি করিয়া কাজ চালাইতে অনুমতি দেন। অল্প দিনেই অত্যন্ত স্বর্ণময় একটী স্তর পাওয়া গেল। উৎসাহে মত্ত হইয়া ম্যানেজার এই স্তরটীর নাম রাখিলেন চ্যাম্পিয়ন্ রীফ (Champion Reef) যে এক পাউণ্ড অংশের দাম এক দিন দশ আনা ছিল, আজকাল সেই এক পাউণ্ড অংশের দাম ১১৷১২ পাউণ্ডের কম নহে, অর্থাৎ দশ আনা হইতে অংশের দাম এখন ১৮০ টাকা হইয়াছে।

চ্যাম্পিয়ন রীফ নামক স্তরের পাথরে সোণা স্যাকরাদের কষ্টি পাথরের গায়ের সোণার মত চক্ চক্ করে। লেখকের সম্মুখে একজন মজুর চ্যাম্পিয়ন রীফের ১ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি চওড়া এবং ১ ইঞ্চি পুরু পরিমাণের এক টুকরা পাথর লইয়া পলাইতেছিল। পুলিশ তাহাকে ধৃত করিল। যাঁহারা এবিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারা অনুমান করিলেন, পাথরের টুকরাটীতে ৪৷৫ টাকার সোণা আছে। স্বর্ণখনির আশ পাশের পাহাড়ে জঙ্গলে সোণাচোরদের নানা রকম আড্ডা আছে। অনেক জায়গায় পারা এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপকরণাদিও চোরদের নিকট পাওয়া গিয়াছে।

যে স্থানে স্বর্ণখনি, সে স্থান অত্যন্ত অনুর্ব্বর; প্রস্তরময় মরুভূমি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু আজকাল এই মরুভূমিতে রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোণ, বৈদ্যুতিক আলো, ট্রামওয়ে, হোটেল, বাজার, দোকান প্রভৃতি বসিয়াছে। হাজার হাজার লোক এইখানে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট ৫ মাইল লম্বা, ১ মাইল চওড়া মরুভূমি হইতে বৎসরে ১৪ লক্ষ টাকা রাজকর পাইতেছেন। তা ছাড়া গোল্‌ড্‌ফীল্‌ড্‌স্ রেলওয়ের আয় আছে। * * * *

'প্রবাসী'—শ্রীসতীশচন্দ্র মৌলিক।

কাজের কথা।

আমাদের সর্ব্বদা এই বিষয় দেখিতে হইবে যে, এদেশে এমন দ্রব্য কি আছে, যাহা বিদেশে পাঠাইয়া তথা হইতে এদেশে মূল্য আনিব। এই চিন্তা

আমাদের সর্ব্বদা করিতে হইবে যে, আমরা বিদেশী দ্রব্যের গ্রাহক হইব না, আমাদের গ্রাহক বিদেশীয়েরা হইবে। এই মূলনীতিই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির কারণ। ভারতের যে দ্রব্য জাহাজে করিয়া বাহিরে বাহির হইয়া যায়, সেই পণ্যের ব্যবসায় ভারতে শ্রীবৃদ্ধি। পূর্ব্বে চিনি যাইত, তখন চিনির কার্য্যে এদেশে শ্রীবৃদ্ধি ছিল, অনেক লোক ইহাতে প্রতিপালিত হইত; এখন ইহা যায় না, তাই চিনির কাজে অবনতি। এখন পাট যায়, তাই পাটের কার্য্যে এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইতেছে—একার্য্যে ভারতের উন্নতি। আমরা পণ্ডিতীবুদ্ধি কিছুতেই গ্রহণ করিব না, উহাঁদের বুদ্ধি আছে সত্য, কিন্তু চিরদিন দরিদ্র থাকিবার মত বুদ্ধি ভিন্ন পণ্ডিতীবুদ্ধিতে আর কিছুই নাই। উহাঁরা সরস্বতীর বর পুত্র হউন,—মস্তকে রাখিব! কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর সহিত উহাঁদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই কলহ। তাঁহারা বলেন যে, দেশের শস্য বাহির হইয়া যায় বলিয়া, এদেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতেছে, দেশ নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে; এ কথার মূলে কোন যুক্তিই নাই। টাকার বাজারেরই আমাদের উন্নতি অবনতি। টাকার সঙ্গে সমুদয় দ্রব্যের সম্বন্ধ। ব্যবসায়ীর লক্ষ্য দেশের সঙ্গে নহে, টাকার সঙ্গে। যে কলাই, মসূর, তিসি, সরিষা আজ বিদেশে যাইতেছে, কল্য যদি ঐ সকল দ্রব্যের দর বিদেশ অপেক্ষা এখানে অধিক হয়, অর্থাৎ ভারতে উহা আনিলে লাভ হইবে বুঝা যায়, তাহা হইলে যে কোটি কোটি মণ ভারতীয় শস্য আজ বিদেশে যাইতেছে, কল্য উহাপেক্ষা অধিক মাল ভারতে আসিতে পারে। ভারতবর্ষাপেক্ষা গমের দর কিছু অধিক হউক, তাহা হইলেই দেখিবেন, আমেরিকার গমে ভারতবর্ষ ছাইয়া যাইবে। তখন আর পণ্ডিতীযুক্তি রক্ষা পাইবে না। আজ ভারতবর্ষে জাবা চিনির মণ ৪৷৷০ টাকা এই কারণেই হইয়াছে। আজ বিদেশী চিনিতে ভারতবর্ষ বোঝাই এই জন্যই হইতেছে। ইংলণ্ড, জর্ম্মণী, আমেরিকা ভারতের শস্য শুষিয়া লইয়া গেল, এ কথায় ভারতবাসী কেহই কর্ণপাত করিও না! কারণ, ঐ সকল মহাদেশের মহাজনেরা শস্য ও টাকা শুষিতে আইসেন না, তোমাদের উপকার করিতেই আইসেন। বস্তুতঃ উহাঁদের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য না চলিলে, এতদিন ভারতবর্ষ একটা পল্লিগ্রামের মত হইয়া থাকিত। যাঁহারা বলেন, মুসলমান রাজত্বের সময় ভারতের শ্রীবৃদ্ধি ছিল, সুখ ছিল, সম্পত্তি ছিল, এমনতর ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইত না; তাঁহারা নিশ্চিত বাতুল। ঈশ্বর রাজ্যের সৃষ্টির মধ্যে যাহা হয় বা হইবে, তাহা নিত্যই নূতনরূপে হয়,—তাঁহার সেই কথাই চিরদিন কি বৃক্ষ, কি প্রাণী, কি চন্দ্র সূর্য্য,

কি জড় জগত সকলকেই প্রতিপালন করিতে হয়। গোলাপ গাছে কবে তিনি একটী পুষ্প প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার পর কত ফুল কত গাছ বিনষ্ট হইয়াছে, তবু সেই গোলাপফুল আজও ফুটিতেছে। ছিল, আছে এবং থাকিবে, ইহার ব্যতিক্রম কিছুতেই হইবে না। বিশেষতঃ তাঁহার রাজ্যে। অতএব তখনও যে সুখ ছিল, এখন সেই সুখ আছে, তখন যে সম্পত্তি ছিল, এখন সেই সম্পত্তি আছে। তখনও যে দুর্ভিক্ষ ছিল, এখন সেই দুর্ভিক্ষই আছে। তখন যে পশু পক্ষী ছিল, এখনও সেই পশু পক্ষীই আছে; তখন যে কষ্ট ছিল, এখনও সেই কষ্টই আছে। তখন যে বিদূষী মহিলা ছিল, এখনও সেই বিদূষী মহিলাই আছে। তখন যে হতভাগ্য পণ্ডিতের দলগুলা ছিল, এখনও সেই হতভাগ্যগুলাই আছে। তখন যে সকল পূজনীয়-বরণীয়-মাননীয় স্বদেশ-হিতৈষী বুদ্ধিরূপা সাক্ষাৎ জগদীশ্বর স্বরূপ মহামানী মহাজ্ঞানী পণ্ডিতেরা ছিলেন, এখনও তাঁহারাই আছেন। তখনও যে চাউল ছোলা কলাই মটর ছিল, আজও তাহাই আছে। অথচ সে দিন হইতে—সে কাল হইতে—‘এদিনে একালে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তবু তাই আছে। পরিবর্ত্তনের স্মৃতিসকল এক একজনের মস্তিষ্কে এক একভাবে জাগিতেছে মাত্র। যে মূলা খায়, তাঁহার মূলার ঢেকুর উঠে, যে পেঁয়াজ খায়, তাহার নিশ্বাস এবং লোমকূপ দিয়া পেঁয়াজের গন্ধ উঠে, যাঁহাকে যে স্মৃতি উত্তেজিত করে, যাহার মনে যখন যে রং লাগে, সে সেই বর্ণের মত কথা বলে। তখন সে ভাবিবার সময় পাইবে কোথা হইতে? সে বুঝে না "মন" কোন বর্ণের নহে!! উৎপত্তি লয় কতই হয়, কিন্তু কিছুই যাইবার নয়। মুসলমান রাজত্বের সময়েও পারস্য, আরবে, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে—ভারতীয় দ্রব্য বক্ষে লইয়া কত শত জলযান, দিক্ দিগন্তর গমন করিত, তাহার হিসাব নাই? তাহার লেখা পড়া নাই বুঝি? সে পুঁথি এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়া, ইংরাজের আমদানী রপ্তানীর হিসাব চক্ষের উপরে পরমিট হইতে সদ্য সদ্যই ঠিক পাওয়া যায় বলিয়া বুঝি আজ ইংরাজবণিক আমাদের দেশ শুষিয়া লইল, বলিতে হইবে। আজ জাহাজের সংবাদ পাইতেছি, কাল পাই নাই বলিয়া বুঝি আমাদের সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ দিতে হইবে। সে কালের যতই পুস্তক থাকুক, যতই পুঁথি থাকুক, সকল যুগেই লোক সংখ্যার মত পুস্তক হয় কি? সকল কর্ম্মের কথা অদ্যাপিও পুস্তকস্থ হইয়াছে কি? মূর্খাপেক্ষা পণ্ডিত নিশ্চিত অল্প। পণ্ডিত কয়জন? পুস্তক কয়খানা? লোক সংখ্যা কত? কার্য্যের সংখ্যা কত? হিসাব করিয়া

বল, নিশ্চিত তখন তুমি দেখিবে, তোমার পুস্তকের যুক্তি অতি বলহীন। উহার যুক্তিতে মীমাংসা করিতে গেলে নিশ্চিত পরিণামে তোমার কুবুদ্ধির পরিচয় দিবে। যুক্তি ছাড়, তর্ক ছাড়, কর্ম্ম কর। মুখের কথায় চিড়া ভিজিবে না; "তেরে কেটে তাক" মুখে বলিলে হইবে না, তবলার উপর সাধ, নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করিবে। সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে, সিদ্ধির নেশা হইবে না, উহা আন, বাট, গোল, খাও, তবে নেশা হইবে। কর্ম্ম চাই—কর্ম্ম চাই; তবে আমাদের ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি হইবে। বিদেশের সহিত কার্য্য ছিল বলিয়াই আমরা মিঃ জে, এন, তাতার মত ধনী পাইয়াছি; যতই একার্য্য করিব, ততই ভারতে ঐ শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ ধনী দেখা দিবে। মীমাংসা চাও, তর্ক চাও, না টাকা চাও? ব্যবসায়ী হিসাবে আমাদের নিশ্চিত ধারণা—কেহ কাহার দেশ শুষিয়া লইয়া যাইতে পারে না। সাধারণ লোকের দশা সকল দেশেই সমান। ভারতবর্ষের লোকেরা চীৎকার করিয়া বলিতেছে আমাদের গম, ছোলা, মটর বিদেশে গেল, আমরা উদর পূরিয়া উহা খাইতে পাইলাম না। আবার জর্ম্মণের লোকেরা তারস্বরে বলিতেছে, আমাদের দেশের সমুদয় চিনি, সমুদয় মোজা, কাপড়, গেঞ্জিফ্রক, জামা ইত্যাদি সমুদয় দ্রব্য ভারতে গেল, কেবল ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবী শুদ্ধ লোক জর্ম্মণদেশের দ্রব্য শুষিতেছে, অতএব পরিণামে আমাদের উলঙ্গ হইয়া বৃক্ষের পাতা খাইতে হইবে। বুদ্ধিমান পাঠক মহাশয়, বুঝিয়া যাইবেন, যেন উহাদের মত সাধারণবুদ্ধি আপনিও না প্রাপ্ত হয়েন, মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি। আমার সংসারে ১৫০ জন লোক, আমি সেই ১৫০ লোকের মত দ্রব্যই ক্রয় করি। পরন্তু আমি যদি কোন দিন সাধারণকে নিমন্ত্রণ করি, তাহা হইলে সে দিন আমাকে কেবল ১৫০ জনের খাদ্য বা সুখকর দ্রব্য ক্রয় করিলে হয় না, যত সংখ্যা নিমন্ত্রণ করিয়াছি, সেই হিসাবে একটা মোটামুটি আন্দাজি হিসাব ধরিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়। এইরূপ বৈদেশিক বাণিজ্য না থাকিলে, দেশের জন্য উহা সেই মতই উৎপন্ন হয়, বেশী করা অনাবশ্যক, বিক্রয় হয় না, পরিশ্রম অপেক্ষা মূল্য অল্প হয়। অতএব গ্রাহক দেখিতে হয়। বিদেশীয় লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অর্থাৎ বিজ্ঞাপন দিয়া গ্রাহক করিলে, নিজের ঘর অপেক্ষা লোক সংখ্যাধিক হইলে, তবে উহার কাটতি হয় এবং ব্যবসায় চলে। অতএব জর্ম্মণীর ভাবা উচিত, কেবল তাঁহাদের মত দ্রব্য করিলে, জর্ম্মণে নিশ্চিত এত দ্রব্যের উৎপন্নই হইত না। ভারতের লোকেরও উহাই বুঝা উচিত। এদেশে চাউল, ছোলা, গমের চাষ বৃদ্ধি হইবার কারণই এই। ইহার রপ্তানী

বন্ধ হইলেই চাষ কমিয়া যাইবে। যে দ্রব্য যত আমরা বিদেশে পাঠাইতে পারিব, সে দ্রব্যের চাষ বা কল কারখানা ততই আমাদের বৃদ্ধি হইবে।

জামা কাপড় দর্জ্জির হস্তে ছিল, তাহা এক্ষণে বাবুদের হস্তে গিয়াছে। "সেলায়ের কারখানা" বা টের্লাস সপ বোধ হয়, সহরে ১০ বৎসর পূর্ব্বে এত ছিল না। মণিহারীর দোকান বাবুদের একচেটিয়া ব্যবসায়। মূলধন কম বলিয়া মহাজনদিগের আড়ত এবং মুদীখানায় যে প্রভেদ, সেইরূপ প্রভেদ বাঙ্গালী এবং ইংরাজের মণিহারীর দোকানে। যাহা হউক, "নাই মামার অপেক্ষা কাণা মামা ভাল।" দেশের লোকের মতি গতি যে ব্যবসায় দিকে ফিরিতেছে, ইহাই মঙ্গল। এখন আমাদের ধনাগমের নূতন নূতন পন্থা বাহির করিতে হইবে।

প্রথমতঃ।—মৎস্যের ব্যবসায় এদেশের দরিদ্র জেলেদের নিকট আছে। পরন্তু এদেশের লোক মৎস্য সংরক্ষণ করিতে জানে না। সম্প্রতি পদ্মার ইলিশ মৎস্য ইংরাজ ব্যবসায়ীর বুদ্ধি কৌশলে করাত গুড়া এবং বরফ দিয়া বড় বড় কাষ্ঠের বাক্স মধ্যে পূরিয়া সিয়ালদহ ষ্টেসনে আমদানী হইতেছে। এ ব্যবসায় এক্ষণে সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যেও অনেকে করিতেছে; এ দেশের নদ-নদীতে অনেক মৎস্য রহিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা ধরিবার এবং উহা বিদেশে চালান দিবার রীতিমত কারখানা এ দেশে একটীও নাই, অতএব এ কার্য্য করা এদেশবাসীর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। এজন্য মান্দ্রাজ-গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর একবার বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দেশে এই মাছের ব্যবসায়ে বৎসরে প্রায় দেড় কোটী টাকা আয় হইয়া থাকে। এইরূপ প্রায় সকল দেশেই "ফিস্-মার্চ্চেণ্ট" আছে, তাঁহাদের বড় বড় আফিস আছে। ভারতে ইহা নাই কেন? অথচ ভারতের মৎস্য বেশী।

দ্বিতীয়তঃ।—রাণীগঞ্জের নিকট যে কাগজের কল আছে, ঐ কলে শরপাতা এবং সাবি ঘাস দ্বারা কাগজ তৈয়ারী হইতেছে। শর গাছ পশ্চিমে, বর্দ্ধমানে, রাঢ় অঞ্চলে ও বাঙ্গালার ২।১টী জেলাতে জন্মিয়া থাকে এবং সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে সাবি ঘাস অপর্য্যাপ্ত জন্মে। ইহার সংগ্রহের কারখানা খুলিয়া বিদেশে চালান করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ।—চীন দেশের বেত পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র চালান যায়। কলিকাতায় ১৫ দিন অন্তর চীনের যে ষ্টীমার আইসে, ঐ দেশের প্রায় প্রত্যেক ষ্টীমারেই চীনের বেত কিছু না কিছু আনীত হয়। অথচ এ দেশের মালদহ এবং খুলনা জেলার অধিকাংশ স্থানেই বেত গাছ আপনা হইতেই জন্মে।

ফাল্গুন চৈত্র মাসে ঐ সকল বেতের ঝোপ হইতে বেত কাটিয়া লইয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া যায়। বর্ষাতে পুনরায় সমধিক তেজে বেতের চারা নির্গত হয়। প্রতি বৎসর বেত না কাটিয়া ২।৩ বৎসর অন্তর কাটিলে বেতগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা হয়। স্থানীয় জমীদারেরা ইহার ব্যবসায় জন্য চেষ্টা করিলে ভাল হয়। মালদহ জেলাতে সচরাচর এক পয়সায় ৬৩।৬৪টী ৩।৪ হস্ত দীর্ঘ বেতের ছিল্‌কে পাওয়া যায়। চেয়ার, পাল্কী, বেতের বাক্স বা পেঁট্‌রা, ঝুড়ি, ধামা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য বেতের প্রয়োজন। ইহার রীতিমত চাষ করিয়া, বিদেশে পাঠাইলে এবং স্বদেশে বিক্রয় করিলেও লাভ হইবে।

বঙ্গদেশ হইতে বাব্‌লার ছাল পূর্ব্বে বিদেশে যাইত না, আজকাল উহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। ২৷৷০, ৩্ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে, এই বাব্‌লা কাষ্ঠে গোরুর গাড়ীর ঘুরো প্রস্তুত হয়। এক্ষণে বিদেশে ইহার ছাল দ্বারা চামড়ার কস করা কার্য্য হইতেছে। তাই ইহার বিদেশী রপ্তানী বৃদ্ধি হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতের চামড়া বিদেশে যাইত না, আজ কাল অত্যধিক পরিমাণে চামড়ার রপ্তানী যাইতেছে।

এদেশী ছাতার কারখানা।

ছাতার সম্বন্ধে এখনও বিলাতী ভিন্ন উপায় নাই বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। প্রকৃত প্রস্তাবে বেতের সিক না করিলে বিলাতী ভিন্ন এখনও কোন উপায় হয় নাই। কিন্তু মাঝারিগোছের ছাতায় যে সিকগুলি লাগে, তাহার ও পিতলের সাজগুলির মূল্য দুই আনা তিন আনা মাত্র।

কলিকাতার ৪৬ নং হ্যারিসন রোড ভবনে এইচ, এম, এণ্ড কোম্পানী নামে একজন দেশীয় লোকে ছাতা প্রস্তুত করিতেছেন। দেশীয় কারিকরে দেশীয় বেতের হ্যাণ্ডেল এবং বিলাতী সিক হইতে ছাতার ঠাট প্রস্তুত করে। বেতের বাঁটের মূল্য ৵০ আনা মাত্র। পিতলের যে নল ঠেলিয়া ছাতা খুলিতে হয়, পিতলের সেই কল আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের চৌরাস্তার একটু পূর্ব্বদিকে উহা ফরমাইস দিয়া প্রস্তুত করান যাইতে পারে।

উহার খরচা /০ মাত্র। বোম্বাই চাদর বা খুব ঠাস বুনান দেশীয় তাঁতির হাতের লংক্লথ রঙ্গাইয়া বা বাফতা দিয়া ছাতির কাপড় হয়। সুতার কাপড়ে ।৵০ আনা খরচ পড়ে।

বাঁটের /০ আনা, পিতলের কলের /০ আনা, কাপড় ।৵০ আনা, রঙ করাইতে /০ আনা, বিলাতী সিক ৸/০ আনা, এবং ৪৬ নং হ্যারিসন রোডে এইরূপ ছাতা প্রস্তুত করিয়া লইবার মজুরী ।০ আনা, মোট ১৲ টাকা খরচে আমি মাঝারি মাপের বেশ সুন্দর ছাতা প্রস্তুত করাইয়াছি।

ঐ স্থানের সাধারণ প্রস্তুত ছাতার যদিও পিতল, সিক এবং কাপড় বিলাতী, তথাপি বেত ও মজুরিতে টাকায় ।৴০ দেশীয় কারিগর প্রভৃতিরা পায়। বিলাতী কাপড়ের (কালিকোর) পরিবর্ত্তে দেশী কাপড় লাগাইলে টাকায় ৸/০ আনা এদেশে থাকে। পিতলের কল ফরমাইস দিয়া ছাতা প্রস্তুত করিয়া লইলে টাকার ৸৵০ পর্য্যন্ত দেশে থাকে। কিন্তু খাস বিলাতী ছাতায় টাকায় /০ মাত্র দোকানীর লাভ খাতে এদেশে থাকে।

বিলাতী কলের ক্ষমতা এত অধিক যে, ৪ টুকরা পিতল ও সমস্ত সিকের মূল্য এখানে বড় জোর ৵০ আনা মাত্র। যত দিন না এদেশে উৎকৃষ্ট এবং প্রকাণ্ড লোহার কারখানা হইতেছে, ততদিন এইরূপে দেশী ছাতা প্রস্তুত করিয়া টাকায় ৸/০ দেশীয় শিল্পীদিগকে দিবার চেষ্টা যাঁহারা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্যই এই সংবাদ দেওয়া।

এই দুর্ভিক্ষের দিনে পাটনাই খেরো, কানপুরী কাপড়, কুষ্টিয়ার ও সাধারণতঃ দেশীয় তাঁতির কাপড় প্রভৃতি যত বিক্রয় হইবে, ততই দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সাহায্য হইবে।

যাহারা মাটী কাটিতে পারে, তাহারা সরকারী রেলে এবং রাস্তার কাজ করিতে পারে। কিন্তু যে সকল শিল্পজীবী মাটী কাটিয়া সংসার প্রতিপালনে অভ্যস্ত নয়, যাহারা মাটি কাটিতে গেলে দু'দিনে রুগ্ন হইয়া পড়িবে—তাহাদেরও ত আজই ৫৲ টাকা মণ চাউল কিনিয়া খাইতে এবং পরিজনকে খাওয়াইতে হইতেছে। আরও মহার্ঘ হওয়াই সম্ভব। দুর্ভিক্ষে যেন তাহাদেরই কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক! এখন দেশীয় বস্তুর ক্রয় দ্বারা তাহাদের প্রতিপালন চেষ্টা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। তবে যাঁহারা একান্ত মেয়েমুখো—কর্ত্তব্য বুঝিয়াও আপনাদের সুস্পষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিতে অক্ষম—তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

শ্রীঃ—

মন্তব্য,—এই লেখক মহাশয়ের সবিশেষ অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, কলিকাতায় **ছাতার কারখানা** ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

সিক, লোহ বাট এবং উহার বিবিধ প্রকারের সুন্দর সুন্দর হাণ্ডেল ও বিদেশ হইতে আনীত হইতেছে। কলিকাতাস্থ ছাতার কারখানায়, সিক জোড়া, চালের কাপড় সেলাই ইত্যাদি হইয়া থাকে। মন্দের ভাল বলিতে হইবে। সুবিখ্যাত রেলি ব্রাদার্স প্রভৃতি মার্চ্চেন্ট দ্বারা বিদেশী আমদানী ছাতাও কলিকাতায় এখনও অনেক পাওয়া যায়। কবে ছাতা আমদানী বন্ধ হবে—ইহা বলা চলে না। ঈশ্বর রাজ্যে যাহা হইয়াছে, তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় না, তবে হ্রাস-বৃদ্ধি অবশ্য আছে। এ শ্রেণীর ছাতার কারখানা দেখিয়া আমাদের আনন্দ করিবার কিছুই নাই, বরং ভাবিবার বিষয়, উহার যাহা কিছু সরঞ্জাম, সবই বিদেশীর হস্তে! মঃ বঃ সঃ।

কৃষি ও শিল্প সমাজ।

কৃষি-প্রধান দেশ ভাল কি বাণিজ্য-প্রধান দেশ ভাল, যদিও তাহার বিচারের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তথাপি এ বিষয়ের কয়েকটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইংলণ্ড, হলণ্ড এবং বেলজিয়ম ভিন্ন পৃথিবীর অপর সকল দেশই কৃষি-প্রধান। এক্ষণে, ইংলণ্ড বাণিজ্য প্রধান হইয়াও অপরাপর কৃষি-প্রধান দেশ অপেক্ষা প্রবলতর হইয়া আছে। কোন সময়ে হলণ্ডও খুব প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর হলণ্ডের পূর্ব্ব প্রাধান্যের কতটুকু অবশিষ্ট আছে? জর্ম্মণেরা মনে করিতেছেন উহাকে এক দিন গ্রাস করিয়া ফেলিবেন। বেলজিয়ম অতিক্ষুদ্র বস্তু, কেবল অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের পরস্পর ঈর্ষা বশতঃ একটি স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে রহিয়াছে, ফ্রান্সের কবলীকৃত হয় নাই। এক কথা, বাণিজ্য-প্রধান দেশগুলির বল কৃষি-প্রধান দেশের অপেক্ষা কখনই অধিক বলিয়া প্রতীত হয় নাই। প্রাচীন কাল হইতেও দেখ, ফিনিকীয়রা বাণিজ্য-প্রধান, কৃষি-প্রধান পারসিকদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল; বাণিজ্যপ্রধান-কার্থেজ কৃষি-প্রধান রোম কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিল; বাণিজ্যপ্রধান-এথেন্স কৃষিপ্রধান স্পার্টা কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল; বাণিজ্যপ্রধান-বেনিস কৃষিপ্রধান অষ্ট্রীয়ার শরণাপন্ন এবং বাণিজ্যপ্রধান জেনোয়া কৃষি-প্রধান ফ্রান্সের দাস ছিল। অতএব বাণিজ্য

প্রধান হইলেই যে কোনদেশ প্রবলতর, এ কথা সত্য নহে। প্রত্যুত নেপোলিয়ান বোনাপার্ট স্পষ্টাভিধানে বলিতেন যে, কৃষিপ্রধান দেশের বল অনেক পরিমাণেই অধিক এবং উহা বিশিষ্টরূপেই স্থায়ী বল। তিনি ফরাসিদিগকে কৃষিপ্রধান থাকিবার নিমিত্তই পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কোন দেশ কৃষিপ্রধান হইবে, কি বাণিজ্যপ্রধান হইবে, ইহা কাহার উপদেশ বা পরামর্শের স্থল নহে। যে দেশের যেরূপ অবস্থান এবং যেরূপ প্রকৃতি, সে দেশ তদনুযায়ী হইয়া কৃষিপ্রধান বা বাণিজ্যপ্রধান হইয়া উঠে। ফ্রান্স দেশ স্বতঃই কৃষিপ্রধান। উহাতে দ্রাক্ষার চাষ এত অধিক এবং উত্তম হয় যে, ওদেশের ন্যায় উৎকৃষ্ট এবং অধিক মদ্য আর কোথাও জন্মে না। ঐ দ্রাক্ষা—কৃষির বলেই ফ্রান্স এত বলবান এবং বলশালী। এক জন ইটালীয় রসায়নবিৎ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগের মৌয়া ফুল হইতে অবিকল ফরাসিদেশ-প্রস্তুত ব্রাণ্ডির ন্যায় ব্রাণ্ডি প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহা এত অধিক ও এত স্বল্প মূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে যে, ফ্রান্সকেও এখানকার ব্রাণ্ডি কিনিয়া খাইতে হয়। তাঁহার নিকট ঐ কথা শুনিবার কিছুকাল পর হইতে দেখিতেছি যে, ইটালী এবং ফ্রান্সে আমাদের মৌয়া ফুলের রপ্তানী হইতেছে। মৌয়া ফুল হইতে যে মদ এখানে জন্মে, উল্লিখিত রসায়নবিৎ তাহার দুর্গন্ধ নষ্ট করিবার উপায় বাহির করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার কাজই আমাদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রসায়নাদি বিদ্যা প্রকৃতরূপে শিখিয়া এ দেশীয় কৃষি শিল্পাদির উৎকর্ষ সাধন চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। ঠিক ইংরাজদিগের অনুরূপ শিল্প বাণিজ্যাদি বিস্তারের চেষ্টা সফলও হইবে না, আর প্রয়োজনীয়ও নহে।

ফলকথা, ভারতবর্ষ দেশ কৃষিপ্রধানই আছে, আর কৃষিপ্রধানই থাকিবে। যদি কৃষিপ্রধান থাকে, তবে সম্মিলিত পরিবার বা একান্নবর্ত্তিতাও অবশ্য থাকিয়া যাইবে। কৃষিপ্রধান দেশমাত্রেই একান্নবর্ত্তিতার অগৌরব নাই। যদি কোন কারণে কৃষিপ্রধান দেশে সম্মিলিত পারিবারিক ব্যবস্থা ভঙ্গ হইয়া থাকে, তবে সেই দেশে একটি বড়ই অনিষ্ট ঘটনা হইয়া থাকে। ভূমি-শূন্য এবং একান্ত নিরন্ন শুদ্ধ মজুরদার লোকের সংখ্যা অতিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। আমাদের দেশে মজুরদার লোক সকল বহুকাল ভূমিসম্পর্ক শূন্য হইয়া থাকে না, পরিশ্রমশীল এবং মিতব্যয়ী হইলে অল্প দিনের মধ্যেই ভাগে বা অন্য প্রকারে প্রায়ই অল্প স্বল্প জমা জমি ভোগ করিতে পায়। কৃষিপ্রধান রুসিয়া দেশ আরও ভাল। সেখানে গ্রাম শুদ্ধ লোকের ভূমিতে মিলিত-স্বত্ব, সুতরাং গ্রামস্থ সকল লোকেই অল্প স্বল্প ভূমিতে চাষবাস করে। কেবল মজুরদারি করিয়া খায় এমন লোক নাই বলিলেই হয়। মূলে এই সম্মিলিত স্বত্বের ভাব আছে বলিয়াই রুসিয়ার মধ্যে সর্ব্ব প্রকার সম্মিলিত স্বত্ব জন্মাইবার এত চেষ্টা হইতেছে। রুসিয়ার মধ্যে যে সামাজিক (Socialist) এবং বিনাশিক (Nihilist) দলের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহার হেতু রুসিয়া সম্রাটের একাধিপত্য অথবা স্বেচ্ছাচারিতা নহে। ভৌমিক সম্মিলিত স্বত্বের অস্তিত্বই তাহার প্রকৃত কারণ। ফরাসিদিগের দেশেও ঐ সামাজিক (Socialist) এবং সম্মিলিতিক (Communist) দল আছে। কিন্তু তাহাদের অভ্যুত্থান স্বতন্ত্র কারণে হইয়াছে। পৈত্রিক ধন সম-বিভক্ত হইবার নিয়ম থাকায় এবং সম্মিলিত পারিবারিক প্রণালী না থাকায় ভূমি সম্পত্তি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হইয়া যায় যে, তাহার এক এক খণ্ড এক একটী পরিবার পোষণের যোগ্য থাকে না, সুতরাং বিক্রীত হয়। সেইগুলি বিক্রীত হইয়া গেলেই তাহার পূর্ব্ব অধিকারীরা একেবারে ভূমি-সম্পর্ক শূন্য হয় এবং তাহাদিগকে উপজীবিকার নিমিত্ত মজুরদারের পেশা গ্রহণ করিতে হয়। ঐ মজুরদার লোক সকলকে কাজ দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে না পারিলেই তাহারা উৎপাত করিতে আরম্ভ করে এবং কখন কখন রাষ্ট্রবিপ্লববাদি অতি তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করে। ফ্রান্সের এই দল সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট চিত্ত এবং রাজ্য শাসনের নিয়ম, যখন যাহা থাকুক, তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া সুখী হইবার জন্য যত্নশীল হয়। ইংলণ্ডেও ভূমি-সম্পর্ক রহিত শ্রমজীবী লোকের দারিদ্র্য অতি কঠোর। কিন্তু ইংলণ্ড শিল্প বাণিজ্য প্রধান দেশ। ওখানকার শ্রমজীবীরা হয় স্বদেশীয় কলকারখানায় কাজ পায়, না হয় দেশ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষীয়েরা ওপথে যাইতে পারিবে না। ইংলণ্ডে কোটি মাত্র লোক। উহাদিগেরই সন্তান সন্ততি এত হয় যে, শিল্প বাণিজ্য এবং উপনিবেশাদি দ্বারা তাহাদিগের খোরাক যোগাইতে সমস্ত পৃথিবীই যেন কুলায় না। ভারতবর্ষের পঞ্চবিংশ কোটি লোকের সন্তান সন্ততি যদি উহাদের মত শিল্প বাণিজ্য এবং উপনিবেশ দ্বারা আপনাদিগের আহার্য্য সাধন করিতে যায়, তবে সমস্ত সৌর জগৎটা ইহাদিগের প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে।

অতএব সিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান থাকিবে এবং সম্মিলিত পারিবারিক প্রণালী রক্ষা করিবে। যদি তাহাই হয়, তবে কি এখানকার বৈবাহিক প্রণালী সাধারণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে? আমার বোধ হয়, তাহা পারিবে না। এ দেশে বাল্য-বিবাহই প্রচলৎ থাকিবে। দেশভেদে

বিবাহের বয়স ভিন্ন হয়। সুইডেন এবং নরওয়ে দেশে কন্যাকাল ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। জর্ম্মেণী এবং ইংলণ্ডে ২১—২৩ বৎসর, ফ্রান্সে ২০—২১ বৎসর, সুইজর্লণ্ডের কাথলিক সম্প্রদায়ে ১৬—১৭ বৎসর, সুইজর্লণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ে ২০—২১ বৎসর, ইটালীদেশে ১৫—১৬ বৎসর, স্পেন পোর্টুগালে ১৫—১৬ বৎসর, মিসরে ১৪—১৫ বৎসর, আরবে ১২—১৪ বৎসর পর্য্যন্ত।

অতএব অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া যে ভারতবর্ষীয়দিগের কোন একটা বিশেষ রোগ তাহা নহে। ক্ষত্রিয় জাতি হিন্দু সমাজের অন্তর্গত এবং ইহারা খুব উচ্চ স্থানীয়। উহাদিগের মধ্যে কন্যার, বিবাহ দিবার রীতি কন্যার ১৬ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে। অতএব বাল্যবিবাহের সহিত হিন্দুয়ানির তেমন কোন সংস্রব নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা অধিক বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিতেন, তাহার পর বিবাহ করিয়া গৃহী হইতেন। বৌদ্ধদিগের সময়ে যতি ধর্ম্মের আত্যন্তিক বাহুল্য দেখিয়া তাহাদিগের নিরসনের পর দীর্ঘব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং সেই অবধি অল্প বয়সে ব্রাহ্মণের বিবাহ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যখন দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য ছিল, তখনও এদেশে কন্যাকাল ১২।১৩ বৎসরের অধিক বলিয়া অবধারিত হয় নাই।—ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং।

তবে কি বৈবাহিক ব্যাপারে কোন পরিবর্ত্তই আবশ্যক হয় নাই?—আমার মতে বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। (১) যাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়া রাজকার্য্য করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে অল্পবয়সে বিবাহ কর্ত্তব্য। (২) কতকগুলি লোক উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সংসারাশ্রম গ্রহণ একেবারে পরিত্যাগ করুন এবং স্বদেশীয় কৃষি শিল্পাদি উত্তমরূপে বুঝিয়া ইউরোপ চীন জাপান প্রভৃতি দেশে কৃষি শিল্পাদির উন্নতির উপায় অবগত হউন। (৩) তাঁহারা নির্লোভ নিঃস্বার্থ এবং ভোগ-সুখ ত্যাগী হইয়া যে উপদেশ দিবেন, তাহা দেশীয় বড় লোক এবং ছোট লোক সকলেই সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে এবং তাহাতে দেশের ধনবৃদ্ধি এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হইবে। ভারতবর্ষে যে এত-টুকু নিঃস্বার্থতা আছে, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহারা এরূপে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন, তাঁহারা মাতৃভূমির প্রকৃত উপাসনা করিবেন এবং সে উপাসনা ঈশ্বরোপাসনা হইতে অভিন্ন। এডুকেশন গেজেট।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
২য় খণ্ড, ৯ম সংখ্যা; কার্ত্তিক, ১৩০৯ সাল।

রণ্টজেনের নূতন আবিষ্কার।

একটী কাচের দাণ্ডায় একখানি রেশমী রুমাল ঘষিলে সেই ঘর্ষণ দ্বারা তাড়িত উৎপন্ন হইয়া দাণ্ডা এবং রুমাল উভয় দ্রব্যেই তাড়িত সঞ্চিত হয়। একটী ছোট পালক তখন ঐ কাচ-দণ্ডের নিকটে আনিলে কাচদণ্ড পালক-টীকে টানিয়া লয়, এবং দণ্ডে যে তাড়িত সঞ্চয় হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণ করে। দাণ্ডাতে যে তাড়িতটুকু সঞ্চিত হয়, তাহাকে পরা (positive) তাড়িত এবং রুমালে যেটুকু সঞ্চিত হয়, তাহাকে অপরা (negative) তাড়িত বলে। এই দুই প্রকার তাড়িত পরস্পর কতকটা বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত; কিন্তু উভয়ে মিশিবার সুবিধা পাইলেই মিশিয়া যায়। তাড়িত মিশ্রিত অব-স্থায় বায়ু প্রভৃতি সর্ব্বস্থানেই অসীম পরিমাণে অবস্থান করিতেছে। এই মিশ্রিত তাড়িতকে নিরপেক্ষ (neutral) তাড়িত কহে।

কাচের দাণ্ডায় রেশমী রুমাল ঘষিয়া তাড়িত উৎপাদন করিবার কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা গেল, নতুবা সকল জিনিসের মধ্যেই পরস্পর ঘর্ষণে তাড়িত উৎপন্ন হইয়া থাকে; তবে সেই সেই বস্তুতে তাড়িত সঞ্চিত সকল স্থলে থাকে না। কাচের দাণ্ডায় রেশমী রুমাল ঘষিলে ‘পরা’ তাড়িত উক্ত দাণ্ডায় সঞ্চিত হয়; কিন্তু গালা-নির্ম্মিত দাণ্ডায় ফ্ল্যানেল ঘষিলে ‘পরা’ তাড়িত দাণ্ডায় সঞ্চিত না হইয়া ফ্ল্যানেলেই সঞ্চিত হইয়া থাকে। গালা-দণ্ডে অপরা তাড়িত সঞ্চিত হয়। ফলতঃ দ্রব্যগুণ অনুসারে তাড়িতের ঐ রূপ বিভিন্নতা হইয়া থাকে। দুই বস্তুর ঘর্ষণে তাড়িত উৎপন্ন হইয়া যদি উভয়েই উহা সঞ্চিত থাকিবার উপায় হয়, তবে কোন্‌টীতে যে ‘পরা’ এবং কোন্‌টীতে যে ‘অপরা’ তাড়িত সংস্থিত হইবে, তাহা জানিতে পারা অধি-কাংশ স্থলেই পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

পরা ও অপরা তাড়িতের পরস্পর সন্নিকর্ষ হইলে উভয়ে মিশিয়া যায়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে বায়ু অথবা তাড়িত পরিচালক কোন দ্রব্য ব্যবধান থাকা চাই। বায়ু ব্যবধান থাকিলে মিশিবার সময় একটী জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, অন্য ব্যবধানে তাহা হয় না। বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত, ভিন্ন ভিন্ন মেঘস্থিত এই পরা ও অপরা তাড়িতের মিশ্রণ উপলক্ষে উৎপন্ন হয়।

পরীক্ষা দ্বারা প্রথমে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, একটী কাচনির্ম্মিত নলের অভ্যন্তরস্থ বায়ু কতক পরিমাণে নিষ্কাশিত করিয়া নলের দুই মুখ দিয়া দুইটি প্ল্যাটিনাম ধাতুনির্ম্মিত তার প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া কাচ গালাইয়া একেবারে যদি দুই মুখ জুড়িয়া দেওয়া যায়, এবং ঐ দুই তারযোগে যদি পরা ও অপরা দুই প্রকার তাড়িত নলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ দুই প্রকার তাড়িত নলের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর মধ্য দিয়া আসিয়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়া মিলিত হইতে থাকে এবং সেই মিলন সময়ে নলের মধ্যে আলোক বিভাসিত হইতে থাকে। কলিকাতার রাস্তায়ও অনেকানেক কারখানায় যে তাড়িতালোক দেওয়া হইতেছে, তাহার মূলতত্ত্ব এই।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন যে, পরা তাড়িতই নলমধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অপরা তাড়িতের তারের মুখে যাইয়া মিলিত হয়, অপরা তাড়িতের প্রবাহ হয় না। বৈজ্ঞানিক হার্টজ সাহেব অতঃপর এই আবিষ্কার করেন যে, পরা ও অপরা, এই উভয়বিধ তাড়িতেরই প্রবাহ হয় এবং মিশিবার সময় উভয়েই প্রবাহিত হইয়া নলের মাঝামাঝি কোন স্থানে আসিয়া মিলিত হয়। তিনি পরীক্ষা দ্বারা আরও আবিষ্কার করেন যে, অপরা তাড়িতের প্রবাহ স্থূল কাচ বা অভ্র প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয় না, অথচ ধাতব দ্রব্যের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়।

হার্টজ সাহেবের এই পরীক্ষিত তত্ত্বকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রবর লেনার্ড সাহেব উক্ত নল-মধ্যস্থ তাড়িত-প্রবাহকে বাহিরে আনিবার চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য নলের এক স্থানের কাচ কাটিয়া তথায় এলুমিনম নামক ধাতুনির্ম্মিত একটী পাত বসাইয়া তদ্দ্বারা পরীক্ষা করেন এবং উহাতে কৃতকার্য্যও হন। অতঃপর পরীক্ষা দ্বারা তিনি ইহাও নিরূপণ করেন যে, উক্ত তাড়িত-প্রবাহ শুধু ধাতব দ্রব্য বলিয়া নয়, খুব পাতলা কাচ অথবা অভ্রের মধ্য দিয়াও বাহিরে পরিচালিত হইতে পারে।

কিন্তু ঐ রূপে বাহিরে পরিচালিত তাড়িত-প্রবাহ চক্ষুর অগোচর পদার্থ। উহা যাহাতে চক্ষুর গোচর হইতে পারে, তজ্জন্য প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ বৈজ্ঞানিক রণ্টজেন সাহেব কিছু দিন হইল নিম্নলিখিতরূপ পরীক্ষা-বিধান করিয়া উদ্দেশ্য ফলে পরিণত করিয়াছেন।—

তিনি একখানি পিস্‌বোর্ডে ব্যারিয়াম-প্ল্যাটিনো-সায়ানাইড বেশ করিয়া মাখাইয়া সেখানি একটী অন্ধকার ঘরে ঐরূপ একটী নল হইতে প্রায় ৬ ফুট অন্তরে রাখিয়া দিলেন। ব্যারিয়াম-প্ল্যাটিনো-সায়ানাইডের গুণ এই যে, উহা আলোকরশ্মি আত্মদেহে শোষণ করিয়া লয় এবং শোষণ করিবার অব্যবহিত পরেই আবার উহার বিকীরণ করে। বিকীরণের সময় সেই শোষিত আলোক চক্ষুর গোচর হয়। সুতরাং নলের নিকটে রাখার পর যখন পিস্‌বোর্ড হইতে আলোক বিকীর্ণ হইতে লাগিল, তখন প্রমাণ হইল যে, নল মধ্য দিয়া তাড়িত-প্রবাহ নির্গত হইতেছিল, এবং প্রথমে উক্ত পিস্‌বোর্ডে শোষিত হইয়া পরক্ষণেই আবার উহা হইতে বিকীর্ণ হইয়া পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল।

যে তাড়িত-প্রবাহ এইরূপে নলের গায়ে এলুমিনম পাত বসাইয়া বাহির করা যায়, তাহা যে আলোকরশ্মি, ইহা স্থির হইলে ঐ তাড়িত-প্রবাহ বা রশ্মি সম্বন্ধে বহুল পরীক্ষা দ্বারা রণ্টজেন সাহেব নিরূপণ করিয়াছেন যে, উক্ত অপরা তাড়িত-প্রবাহ সকল দ্রব্যের মধ্য দিয়াই অল্পাধিক পরিমাণে পরিচালিত হইতে থাকে। তবে যে দ্রব্যটীর মধ্য দিয়া পরিচালিত হইবে, সেই দ্রব্যের ঘনত্ব ও স্থূলত্ব প্রভৃতির উপরই উহার পরিচালন-ক্ষমতা নির্ভর করে; অর্থাৎ কোন পাতলা বা অল্প পরমাণু দ্রব্যের মধ্য দিয়া যাইতে হইলে প্রবাহ যত সহজে এবং সতেজে যাইতে পারে, পুরু অথবা ঘন পরমাণু বিশিষ্ট দ্রব্যের মধ্য দিয়া তেমন সহজে বা সতেজে যাইতে পারে না।

এই সমস্ত তথ্যের উপর হইতে রণ্টজেন সম্প্রতি ফটোগ্রাফের এক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন,—তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে সাধারণ ফটোগ্রাফ কিরূপে লওয়া হয়, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

সাধারণতঃ যে ফটোগ্রাফ দেখা যায়, তাহার মূলতত্ত্ব এই যে, সূর্য্যালোকে সিলভার নাইট্রেট নামক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। যদি একখানি কাচের উপর অন্যান্য পদার্থে জমি করিয়া সিলভার নাইট্রেট মাখাইয়া রাখা যায় এবং ঐ কাচের প্লেটখানির উপর সূর্য্যালোক পড়ে, তবে সিলভার নাইট্রেটটুকু বিশ্লিষ্ট হইয়া সমস্ত প্লেটখানি অতি শীঘ্রই কাল হইয়া যাইবে।

যদি ঐ প্লেটের উপর এক অংশে কোন দ্রব্যের ছায়া পড়ে, তবে যেখানটীতে ছায়া পড়ে নাই, অল্প সময়েই সেখানটা যত কাল হইবে, যেখানে ছায়া পড়িয়াছে (সেখানে আলোক কম বলিয়া) কাল তত হইবে না। ছায়ার বা প্রতিবিম্বের মধ্যেও গাঢ়তার ভেদ থাকে। আরসীতে মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রতিবিম্বটী আলোক ও ছায়ার তারতম্য অনুসারেই প্রস্তুত। উহাতে অন্য জিনিস কিছুই নাই। প্রতিবিম্বে এইরূপ ছায়ার গাঢ়তার তারতম্য থাকায় সিলভার নাইট্রেটও প্রতিবিম্বের অনুরূপভাবে অতি সূক্ষ্মরূপে মিল রাখিয়াই অল্প বা অধিক কাল হয়। সিলভার নাইট্রেটের প্লেটে বা কাচপাত্রে প্রতিবিম্ব ফেলিয়াই তাড়াতাড়ি প্লেটটী আলোক হইতে সরাইয়া লইয়া সিলভার নাইট্রেট ধুইয়া ফেলিলে দেখা যায় যে, চতুর্দ্দিকের ঘোর কালক্ষেত্র মধ্যে অপেক্ষাকৃত সাদা অংশে একটী প্রতিবিম্ব উঠিয়াছে। সিলভার নাইট্রেট জলে গুলিয়া যায়। উহা বিশ্লিষ্ট হইলে যে কালটে রূপ বাহির হয়, তাহা জলে গুলিয়া যায় না। এই জন্য ছবি তুলিয়া প্লেটটীকে আস্তে আস্তে সূর্য্যালোকহীন ঘরে জলে ডুবাইলে সিলভার নাইট্রেট ধুইয়া যায়। সূক্ষ্মরূপে প্রতিবিম্ব অনুযায়ী বিশ্লিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ রৌপ্যের দাগগুলি ধুইয়া যায় না। ঐ রৌপ্যের দাগেই যে ছবি প্রস্তুত হইয়াছে দেখা যায়, তাহাই ফটোগ্রাফের নেগেটিভ। ঐটী উপরে দিয়া নীচে সিলভার নাইট্রেটের ফটোগ্রাফী কাগজ রাখিলে অপেক্ষাকৃত সাদা প্রতিবিম্বের নীচের স্থানটি অধিকতর কাল হয়। কালর নীচে আলো না যাওয়ায় ছবির চারিদিকের ঐ অংশ সাদা থাকে। ঐ কাগজ ধুইয়া লইলেই ফটোগ্রাফের ছবি হয়।

যে সূত্র অনুসারে সূর্য্যরশ্মি হইতে প্রথমে কাচখণ্ডে উল্টানো নেগেটিভ ও পরে ফটোগ্রাফ ছবি প্রস্তুত হইয়া থাকে, রণ্টজেন রশ্মি বা অপরা তাড়িত প্রবাহ হইতেও সেইরূপে ফটোগ্রাফ লওয়া যায়। ঐ প্রবাহও সিলভার নাইট্রেটের বিশ্লেষণ করিতে পারে।

ঐ তাড়িত প্রবাহের সম্মুখে যদি আমি আমার হাতের চেটোটি রাখি, তাহা হইলে সেই তাড়িত প্রবাহ চেটোর মধ্যভাগ এবং আশপাশ দিয়া সহজেই বাহিরে পরিচালিত হইবে; কিন্তু চেটোর মধ্য দিয়া বাহিরে পরিচালিত সেই তাড়িতাংশের আর পূর্ব্বমত শক্তি থাকিবে না। চেটোর অস্থি মাংস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশের স্থূলতা ঘনত্ব প্রভৃতি ভেদে তন্মধ্যে পরিচালিত তাড়িতাংশেরও শক্তির বিভিন্নতা ঘটিবে। চেটোর আশপাশ দিয়া যে তাড়িতাংশ বাহিরে পরিচালিত হইতেছে, তাহার শক্তির আর কোন ব্যত্যয় হইবে না।

এখন চেটোর পশ্চাতে যদি একখানি ফটোগ্রাফি প্লেট রাখা যায়, তাহা হইলে সেই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বিশিষ্ট তাড়িত প্রবাহের ক্রিয়া সেই প্লেটের উপর বিভিন্নভাবে পরিস্ফুট হইবে। চেটোর আশপাশ দিয়া যে তাড়িতাংশ প্রবাহিত হইয়া প্লেটের যে অংশে পড়িবে, সেই অংশটি সমস্তই কাল হইয়া যাইবে। চেটোর মধ্য দিয়া যে তাড়িতাংশ যাইয়া প্লেটে পড়িবে, সেই তাড়িতাংশের শক্তির অনুক্রমে চেটোর সর্ব্বাংশের সমগ্র প্রতিকৃতি বিভিন্ন সেডে (shade) প্লেটে উঠিবে। ভিন্ন ভিন্ন মাংসল অংশের মধ্য দিয়া যে প্রবাহ পরিচালিত হইয়াছে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকৃতি এবং ভিন্ন ভিন্ন অস্থ্যংশের মধ্য দিয়া যাহা পরিচালিত হইয়াছে, তাহারও বিভিন্নরূপ প্রতিকৃতি প্লেটে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতে থাকিবে।

এইরূপে প্লেটে হাতের চেটোর যে ছবিটী উঠিল, তাহা উল্টা (negative) ছবি। ঐ নেগেটিভ প্লেট হইতে সাধারণ ফটোগ্রাফের প্রক্রিয়া অনুসারে ফটোগ্রাফি কাগজে উঠাইয়া লইলেই সোজা ছবি হয়।

রণ্টজেনের এই নূতন আবিষ্কারের সম্যক্ বিকাশ হইলে, ইহা দ্বারা প্রধানতঃ অস্ত্র চিকিৎসারই বিশেষ উন্নতি হইবে। শরীরাভ্যন্তরে কোথায় কি আছে, তাহার স্পষ্ট ছবি লওয়া যাইতে পারিবে। একটি গুলি অথবা মাছের কাঁটা যদি শরীরের কোথাও প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও ছবিতে প্রকাশ পাইবে, পেটের ছেলে কোথায় কি ভাবে আছে জানিতে পারায় প্রসব কৃচ্ছ্রতার অনেকটা নিবারণ হইবে। ফলকথা, এটী যে একটি মহান্ আবিষ্কার হইয়াছে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

এডুকেশন গেজেট।

বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিবরণ।

কোন দেশের ইতিহাস উত্তমরূপে জানিতে হইলে প্রথমে সেই দেশের ভৌগোলিক বিবরণ জানা আবশ্যক। দেশটী পৃথিবীর কোথায়—উহার প্রকৃতি কি উষ্ণ, কি শীতল, জল বায়ু কেমন—স্বাস্থ্যকর কি অস্বাস্থ্যকর, মৃত্তিকা উর্ব্বরা

কি অনুর্ব্বরা, ইহাতে কিরূপ খাদ্য সামগ্রী কেমন পরিশ্রমে উৎপন্ন হয়—উহাতে আকরিক কি কি পাওয়া যায়, কেমন সকল জন্তু থাকে, কি প্রকারের মনুষ্যেরা বাস করে—এই সমস্ত বিবরণ স্থূল স্থূল না জানিলে দেশের ইতিহাস কখনই ভালরূপে বুঝিতে পারা যায় না।

বঙ্গদেশের একখানি মানচিত্র লইয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, এই দেশটী উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত সীমার (দার্জিলিঙ্গে) হিমালয় স্পর্শ করিয়া ক্রমে বিহার প্রদেশ, সাঁওতাল পরগণা এবং ছোটনাগপুর অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যা পর্য্যন্ত দক্ষিণে নামিয়াছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া হিজলী কাঁথির নিকট হইতে বঙ্গোপসাগর নামক সমুদ্র ভাগের উত্তরে পূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। অনন্তর রামুর সন্নিধানে আরাকান প্রদেশ স্পর্শ করিয়া পূর্ব্ব দিকে কতকগুলি পর্ব্বত-শ্রেণীর ব্যবধানে ব্রহ্মদেশ এবং মনিপুর রাখিয়া আসাম পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইহার উত্তর ভাগে নাগা জয়ন্তী খাসি এবং গারো পর্ব্বত মালা আসাম প্রদেশের কিয়দংশ এবং ভুটান ও সিকিমের রাজ্য। দেখিতে দেখিতেই বোধ হইবে যে, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূভাগ কখনই ইহার প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশ সমস্ত হইতে নিতান্ত পৃথক্‌ভূত হইয়া থাকিতে পারে না। ইহা বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা এবং আসাম এই কয়েকটী প্রদেশের সহিত একান্ত লয় হইয়াই আছে। ইতিহাসেও বাঙ্গালার সহিত ঐ সকল প্রদেশের চিরকাল অতি নিকট সম্বন্ধ। এক্ষণের ত কথাই নাই। অল্প কাল পূর্ব্বে বাঙ্গালা ঐ সকল প্রদেশের সহিত একীভূত হইয়াই এক জন প্রধান রাজকর্ম্মচারীর (লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের) কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল—এক্ষণে আসামের জন্য পৃথক চীফ কমিসনর নিযুক্ত আছেন।

পূর্ব্বকালের ইতিহাসেও দৃষ্ট হয় যে, যিনি বিহার প্রদেশ অধিকার করিয়াছেন, বাঙ্গালাও তাঁহার অধীন হইয়া পড়িয়াছে—যিনি উড়িষ্যার প্রধান হইয়াছেন, তিনিও বাঙ্গালার মধ্যে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতে গিয়াছেন—যিনি আসামে প্রবল হইয়াছেন, তিনি বাঙ্গালারও সন্নিহিত ভাগে আপন প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, বাঙ্গালায় আধিপত্য হইলেই বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের প্রতি আধিপত্য বিস্তারের স্পৃহাটী যেন সহজেই জন্মিয়া যায়। বাঙ্গালার কর্ত্তা হইলেই ঐ সকল প্রত্যন্ত দেশের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করাও যেন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

দেশের এবং তাহার ইতিহাসের প্রকৃতি, তত্রত্য প্রধান নদীর প্রকৃতির উপর যথেষ্ট নির্ভর করে। যে দেশে কোন বৃহৎ নদী বর্ত্তমান থাকে, সে দেশটী

প্রকৃত প্রস্তাবেই নদীমাতৃক অর্থাৎ সে দেশ ঐ নদী-কর্ত্তৃকই প্রসূত। যে দেশে কোন বৃহৎ নদী বিদ্যমান, সে দেশে কোন্ দিক হইতে প্রথমে মনুষ্য সঞ্চার হইয়াছিল, কোথা হইতে বিজিগীষু রাজগণ আসিয়াছিলেন, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। যেমন নদী প্রবাহ ধরিয়াই প্রস্তর বালুকা এবং মৃত্তিকাদি আসিয়া প্রথমতঃ চরের, পরে ক্ষেত্রের, অনন্তর গ্রামের এবং পরিশেষে দেশের সৃষ্টি করে, সেইরূপে নদীর তীরে তীরেই বিজিগীষু রাজগণ আপনাদিগের সৈন্য পরিচালন করিয়া থাকেন। নদী তীর ধরিয়াই উপনিবেশের সংস্থাপন হয়।

বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর হইতে গঙ্গা এবং পূর্ব্বোত্তর হইতে ব্রহ্মপুত্র—এই দুইটী অতি বৃহৎ জলরাশি হিমাচলের অঙ্গ ধৌত করিয়া যে মৃত্তিকা আনয়ন করিয়াছে, তাহাই বহুকালে ক্রমে ক্রমে জমা হইয়া প্রকৃত বঙ্গভূমি জন্মিয়াছে। গঙ্গা গাজিপুর নগরের সন্নিধানে বিহার প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তর দিক হইতে ঘর্ঘরা এবং দক্ষিণ দিক হইতে শোণের জল পাইয়াছেন। অনন্তর হাজিপুরের নিকটে গণ্ডকী নদী এবং ভাগলপুরের নিকটে কুশী (বা সরযু) নদীও উত্তর দিক হইতে আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। এপর্য্যন্ত গঙ্গার গতি পূর্ব্বাস্য। পরে রাজমহলের পাহাড় উত্তীর্ণ হইয়াই গঙ্গা একবারে দক্ষিণাভিমুখ হইয়াছে এবং সেই অভিমুখে ভাগীরথী নদীকে বাহির করিয়া দিয়াছে। গঙ্গার গতি ঐ স্থান হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখ, অনন্তর উহার সহিত ব্রহ্মপুত্রের প্রধানতম শাখা যমুনা নদীর সংযোগ এবং সংযোগস্থান হইতে উভয়ের সম্মিলিত গতি ঈষৎ পূর্ব্ব, অধিকাংশ দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের সাগরাভিমুখে গতি যে ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, আদিমকালে বাঙ্গালা দেশে মনুষ্যসঞ্চারও ঐ দুই নদীর অনুক্রমে হইয়াছিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত বোধ হয় না। গঙ্গা এবং তাহার করপ্রদা নদীগুলির কূলে কূলে আসিয়া আর্য্যজাতীয়েরা এই দেশে লব্ধ প্রবেশ হন। অনন্তর তাঁহারা ব্রহ্মপুত্রের সহিত গঙ্গার সঙ্গমস্থল প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে আবার ঐ নদের তীরে তীরে উত্তর মুখে গমন করেন। যিনি বাঙ্গালা দেশের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইবে যে, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের উপকূলভাগই আর্য্য-বহুল—অপরাপর অংশের লোকেরা সে পরিমাণে আর্য্যমুখ-শ্রী এবং শরীর সৌষ্ঠব-সম্পন্ন নহে। ছোটনাগপুর, সাঁওতাল-পরগণা, চট্টগ্রাম বিভাগ, খাসি জয়ন্তী পর্ব্বত এবং কুচবিহার প্রদেশ সকল গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের দূরবর্ত্তী পর্ব্বতময় বনাকীর্ণ। ঐ সকল স্থানের অধিবাসিগণের মধ্যে অনার্য্য উপাদানের আধিক্য সহজেই অনুভূত হয়।

কোন দেশের প্রধানতম নদীর গতি দেখিলেই সেই দেশটীর কোন ভাগ উচ্চ, কোন ভাগ নীচ, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালার প্রধান নদী গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র। তন্মধ্যে গঙ্গা ইহার পশ্চিম উত্তর দিক হইতে আসিয়া পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র উত্তর পূর্ব্ব হইতে আসিয়া দক্ষিণ পশ্চিমে গিয়াছে। এই দেশটীর উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব্ব ভাগ উচ্চভূমি এবং দক্ষিণ ভাগ ক্রম-নিম্ন। যে স্থানে গঙ্গা এবং (ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা) যমুনার সম্মিলন, সেই ভাগের ভূমি সর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর নিম্ন। অতএব সমস্ত বাঙ্গালা দেশের আকার একখানি সুপ্রশস্ত পত্রের পর—তাঁহার চতুর্দ্দিক উচ্চাবয়ব এবং দক্ষিণ প্রদেশ নিরতিশয় নিম্ন।

উচ্চভূমিতে প্রায়ই পর্ব্বত থাকে অথবা উচ্চভূমি মাত্রই পর্ব্বত-সন্নিহিত হয়। বাস্তবিক বাঙ্গালার উত্তর দিকে হিমালয় পর্ব্বত—ইহার পশ্চিম ভাগে বিন্ধ্য পর্ব্বতের শাখা প্রশাখা এবং ইহার পূর্ব্বদিকেও একটী পর্ব্বত-মালা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে হিমালয়ের যে ভাগ বাঙ্গলার সন্নিহিত, তাহার সর্ব্বোচ্চ গিরি কাঞ্চনশৃঙ্গ নামে বিখ্যাত। উহা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২৮ হাজার ফুট উচ্চ। বিন্ধ্যাচলের যে খণ্ড বাঙ্গালার পশ্চিমাংশের অন্তর্গত, তাহার প্রধান গণ্ডশৈল পরেশনাথ পর্ব্বত নামে খ্যাত। উহার উচ্চতা ৪ হাজার ৪ শত ফুট। বাঙ্গালার পূর্ব্বদিকে যে সকল পর্ব্বত আছে,তাহারও কোন কোনটীর শৃঙ্গ ১১।১২ হাজার ফুট উচ্চ হইবে। এই সকল পর্ব্বত এবং পার্ব্বতীয় দেশে অনেকানেক অনার্য্য জাতির বাস। বোধ হয়, কোন সময়ে উহারাই আপনাপন সন্নিহিত সমতল দেশ ভাগ ও অধিকার করিয়াছিল। আর্য্যেরা আসিয়া তাহাদিগের স্থানে নদীমাতৃক সমস্ত উর্ব্বরা ভূমি গ্রহণ করিলে উহারা ঐ সকল পর্ব্বত ও বনময় স্থানে প্রস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করে। উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী পর্ব্বতে যাহারা বাস করে, তাহারা শিখ, গুর্খা, ভোট, লেপ্‌চা, আবর, মেক্ এবং গারো প্রভৃতি নামধারণ করিয়া আছে। পশ্চিম-দিগ্‌বর্ত্তী পর্ব্বত নিবাসীরা সাঁওতাল, পাহাড়িয়া, গোন্দ এবং কোল নামধারী হইয়াছে। পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী পার্ব্বতীয় জাতীয়দিগের নাম, লুসাই, খাসি এবং কাছাড়ি। এই সকল অসভ্য জাতির মধ্যে যাহারা উত্তর দিক নিবাসী, তাহাদিগের আকার কতক তাতারীয়দিগের ন্যায়—যাহারা পূর্ব্বদিক নিবাসী তাহাদিগের আকার কিয়ৎপরিমাণে ব্রহ্মদেশীয়দিগের ন্যায়—কিন্তু যাহারা পশ্চিম দিক নিবাসী, তাহাদিগের আকার ভারতবর্ষের বহিঃস্থ অপর কোন দেশের লোকের ন্যায় নহে। অনুমান হয়, উহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতভূমির আদিম

অধিবাসী ছিল। এক্ষণে অল্পমাত্রাবশেষ হইয়াছে। পার্ব্বতীয় জাতীয়েরা কেহ অল্প, কেহ অধিক পরিমাণে আর্য্যদিগের ধর্ম্মপ্রণালী এবং আচার গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা হিন্দুজাতির সংস্রব অধিক পাইয়াছে, তাহারা গো-ব্রাহ্মণের সম্মাননা করে, যাহারা ঐ সংস্রব অল্প পাইয়াছে, তাহারা তাদৃশ সম্মাননা করে না।

পৃথিবীর যে ভাগে যে দেশ অবস্থিত হয়, প্রায়ই সেই অবস্থানের অনুসারে উহার বায়ু উষ্ণ বা শীতল হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশ ১৯·১৮ এবং ২৮·১৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮২ ও ৯৭ পূর্ব্ব দ্রাঘিমাংশের অন্তর্বর্ত্তী ; অতএব উহার অধিকাংশই পৃথিবীর উষ্ণকটি বন্ধের বহির্ভাগে অবস্থিত। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা অতি উষ্ণ প্রদেশের মধ্যেই গণ্য। এক বৎসর ধরিয়া এখানে তাপমান দ্বারা দৈনিক গড় উত্তাপ দেখিলে বৎসরের গড়ে প্রায় তাপমানের ৭৯° পাওয়া যায়। ইহাকে বার্ষিক তাপমান বলা যাইবে। কিন্তু তাপের পরিমাণ বাঙ্গালার, সকল ভাগে অথবা বর্ষের সকল সময়ে সমান থাকে না। যে ভাগ সমুদ্র-কুল হইতে যেমন দূর, তাহার বার্ষিক তাপমানের ইতরবিশেষ প্রায়ই তত অধিক হয়। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে (কাছাড় প্রদেশে) অথবা উত্তর-পশ্চিম কোণে (পাটনা প্রদেশে) গ্রীষ্মকালে যেমন গ্রীষ্ম অধিক, শীতকালেও তেমনি শীত অধিক হয়। কিন্তু সমুদ্র-সন্নিহিত কলিকাতা অথবা চট্টগ্রামে ওরূপ শীত-গ্রীষ্মের ভয়ানক আতিশয্য হয় না। সমুদ্র-সন্নিহিত প্রদেশের বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকিতে পায়—সমুদ্র হইতে দূরস্থ প্রদেশের বায়ুতে জলীয় বাষ্প অল্প থাকে, এই জন্যই ওরূপ প্রভেদ ঘটে। বাস্তবিক বাঙ্গালা দেশের বায়ুতে যত অধিক জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে, তেমন আর কুত্রাপি নহে। বিশেষতঃ ইহার যে ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন, তাহার বায়ু একান্ত বাষ্পপূর্ণ। উষ্ণপ্রধান-দেশবাসীরা প্রায় পরিশ্রম-কাতর হয়। প্রকৃত বঙ্গদেশ-নিবাসীগণ যদিও নিতান্ত শ্রমবিমুখ না হউন, তথাপি শীতপ্রধান-দেশবাসী ইউরোপীয়দিগের ন্যায় কিম্বা পর্ব্বতনিবাসী কষ্টজীবী মনুষ্যদিগের ন্যায় বিশেষ শ্রমশীল নহেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যে শ্রমশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেশের গুণে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না ; তাঁহারা যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর্য্য-বংশ-সম্ভূত, তাহারই পুরুষানুক্রমিক পরিণামদর্শিতার ফল ঐ শ্রমশীলতা।

বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ দিকের বায়ু নিতান্ত জলসিক্ত। ঐ বায়ু যেখানে পর্ব্বত দ্বারা প্রতিহত হয়, তথায় তাহার বাষ্প ঘনীভূত হইয়া অজস্রধারে

বারিবর্ষণ করে। বাঙ্গালার পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী পর্ব্বততলীতে পৃথিবীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে। চেরাপুঞ্জি নামক যে প্রসিদ্ধ নগর বাঙ্গালার ঐ ভাগে অবস্থিত, তাহার বার্ষিক বৃষ্টিমান ৫২৭ ইঞ্চি। বৃষ্টি অধিক পরিমাণে হইলেই উদ্ভিদ জন্মে—কৃষিকার্য্যের সুবিধা হয়—এবং অল্পায়াসেই মনুষ্যের খাদ্য-সামগ্রী উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গালার কৃষিকার্য্য অতি সহজ। কৃষিকার্য্য সহজে নির্ব্বাহিত হয় বলিয়া এখানকার লোকের অবকাশ অধিক এবং তাঁহারা বিদ্যাচর্চ্চায় উন্মুখ। বঙ্গদেশনিবাসীরা চিরকালাবধি লেখা-পড়ার চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন এবং বিদ্যাবত্তার যৎপরোনাস্তি গৌরব করেন। কিন্তু বাঙ্গালা অতি বিস্তীর্ণ দেশ। ইহার পরিমাণফল ২৫১৭৩৮ বর্গমাইল। এই সুপ্রশস্ত ভূভাগের সর্ব্বত্রই যে এক প্রকৃতিক, তাহা হইতে পারে না। ইহার সর্ব্বত্র সমান উষ্ণ বা সমান উর্ব্বরা নহে। সকল স্থানে বৃষ্টিপাত সমান হয় না। বায়ুর উপর বৃষ্টির পরিমাণ নির্ভর করে। শীতঋতুতে যে উত্তরবায়ু বহে, তাহা হিমালয়ের নিম্নদেশ হইতে আইসে। ঐ সময়ে হিমালয়ের ঊর্দ্ধভাগে দক্ষিণ দিকের বায়ু বহিতে থাকে। শীতকালে সমুদ্র হইতে প্রবাহিত জলসিক্ত উচ্চ বায়ুপ্রবাহের অধিকাংশ জলই হিমাচলে তুষার-সম্পাতে পর্য্যবসিত হয়। কিছু অংশ নামিয়া পড়ে এবং উত্তর দিক হইতে যে নিম্নের বায়ুপ্রবাহ তখন চলিতে থাকে, তাহার সহিত মিশে। এই দুই বায়ুপ্রবাহের সম্মিলনে অল্প অল্প বৃষ্টিপাত হয়। তাহাতে বিহার প্রদেশে, ছোটনাগপুরে এবং বাঙ্গালার মধ্যভাগে রবিশস্য জন্মে। গ্রীষ্মঋতুর প্রারম্ভে দেশের উপরিস্থিত বায়ু উত্তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে এবং ঊর্দ্ধ দিয়া সমুদ্রের দিকে যায়। দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী সমুদ্র হইতে দক্ষিণে বায়ুর প্রবাহ জমির ঠিক উপর দিয়া বহিতে আরম্ভ হয়। ঐ বায়ু প্রথমতঃ দেশের অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যন্ত যায় না, সমুদ্রের কূল লইয়াই থাকে। অনন্তর উহা ক্রমে ক্রমে দেশের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। এই সমুদ্রাগত বায়ুর সহিত ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ হইতে আগত পশ্চিম-বায়ুর যে সংঘাত হয়, তাহাতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝটিকা সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরে যখন সমুদ্র-বায়ুর বল বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তখন আর ঝড় হয় না—বর্ষাঋতু প্রবৃত্ত হইয়া যায়। ঐ বর্ষার আগমনে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান আহারীয় যে তণ্ডুল, তাহার চাষ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে যে সকল ঝটিকার উৎপাত হয়, তাহার মধ্যে যে গুলি অধিক ভয়ানক, সে গুলি প্রায়ই বঙ্গোপসাগরে জন্মে। অনন্তর উত্তর-পশ্চিমাভিমুখী হইয়া দেশের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহার সর্ব্বনিম্ন যে ভাগ, তাহাতেই বিশেষ বিক্রম প্রকাশ করিয়া চলিয়া যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আশ্বিন এবং কার্ত্তিক এই কয় মাসেই ঝটিকার উৎপাত অধিক হয়।

বাঙ্গালার আকরিকের মধ্যে পাথুরে কয়লা প্রধান। এ দেশের অনেকানেক স্থানেই পাথুরিয়া কয়লা পাওয়া যাইতে পারে। যেখানে পাথুরে কয়লা থাকে, সেখানে লৌহও থাকে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত অধিক লৌহ এখানে প্রস্তুত হয় নাই। বাঙ্গালা দেশের অনেকানেক স্থলে যথেষ্ট পরিমাণে চূর্ণ-প্রস্তরও পাওয়া যায়। এবং ভাগলপুর জেলার কোন কোন অংশে সীসক, রজত এবং তাম্র-খনি আছে। মুঙ্গের জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে শ্লেট প্রস্তর পাওয়া গিয়া থাকে। উড়িষ্যা এবং আসামের স্থলবিশেষে অল্প পরিমাণ স্বর্ণও পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালার বাণিজ্য এক্ষণে কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

বাঙ্গালা দেশের এবং তন্নিবাসীদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা যাহা স্থূল স্থূল কথা বলা হইল, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে দুইটী বিষয়ের প্রতি বিশেষরূপ লক্ষ্য হইতে পারে; প্রথমতঃ বিবেচনা হয় যে, বঙ্গবাসিগণের পক্ষে প্রকৃতপ্রস্তাবে একজাতিত্ব প্রাপ্তির উপায় কি? দ্বিতীয়তঃ বিবেচনা করিতে হইবে যে, বাঙ্গালার বাণিজ্য-কার্য্য যাহাতে কেবলমাত্র কৃষি-উৎপন্নের উপর নির্ভর না করিয়া শিল্পজাতের উপরে আইসে, তাহার উপায় কি? এই দুইটী বিষয়ের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইতিহাসপাঠের প্রকৃত উদ্দেশ্যও সুসিদ্ধ হইবে। আমরা ইংরাজরাজের অধীন হইয়া কিরূপ ভাবে চালিত হইতেছি? আমরা কি আপনাদিগের ভাবি মঙ্গলগ্রাম দর্শনে যাইতেছি, না দিন দিন হীনবল, হীনবুদ্ধি, হীনঅর্থ হইয়া পরিণামে প্রধ্বস্ত হইয়া যাইব, এরূপ পথে পদার্পণ করিতেছি? যেমন জ্যোতিষশাস্ত্র আকাশবিহারী গ্রহগণের কক্ষ নিরূপণ করিয়া দেয়, ইতিহাসও সেইরূপ মনুষ্য জাতির গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিবার সময় বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য, তাঁহারা আপনাদিগের ভাবি মঙ্গলামঙ্গল অনুসন্ধান করিয়া বুঝিয়া লন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহদিগের যে পথ নির্ণীত হয়, গ্রহগণ কদাপি সে পথের কেশ-মিত বিপর্য্যয় করিয়া চলিতে সমর্থ নহে। কারণ গ্রহগণ জড় পদার্থ। কিন্তু ইতিহাস-প্রদর্শিত পথ যদি অশুভ বলিয়া নিশ্চয় হয়,

তবে পরিণামদর্শী মনুষ্যজীব আপনাদিগের চেষ্টা দ্বারা অবশ্যই সেই পথের কতক ব্যতিক্রম করিতে পারেন। যে দেশের লোকেরা ঐরূপ চেষ্টা করেন, তাঁহারাই সুসভ্য, স্বাধীন এবং সজীব জাতি। যাহারা ওরূপ কোন চেষ্টা করিতে হয় জানে না, তাহারা বর্ব্বর এবং অসভ্য; যাহারা করিতে পারে না, তাহারা নির্জ্জীব; যাহাদিগকে করিতে দেয় না,—তাহারা দাসবৎ পরাধীন।

মটর কার।

মটর কার (Motor Car) নামক যানের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। এই যান সাধারণ রাস্তার উপর দিয়া চালান যায়। রেল বা ট্রামকারের ন্যায় ইহার জন্য বিশেষ রাস্তা প্রস্তুত করিতে হয় না। ইহা চালাইতে ঘোটকেরও আবশ্যকতা হয় না। কেরোসিন তৈলের বাষ্প দ্বারা ইহা চলে। আমাদের দেশে, এমন কি কলিকাতাতেও মটর কার এখনও কেহ ব্যবহার করে না। গাড়ী-ব্যবসায়ী সকল দোকানে এখনও মটর কার খরিদ করিতে পাওয়া যায় না। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, ইহা ১৭ নং চৌরঙ্গী রোড The Western Trading Co'র দোকানে খরিদ করিতে পাওয়া যায়। আমি উক্ত কোম্পানীকে চিঠি পত্র লিখিয়া মটর কার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি এবং আমার স্থির ধারণা যে, কোন শিক্ষিত লোক যদি উক্ত গাড়ী চালাইবার ব্যবসায় করেন, তাহা হইলে চাকরীর জন্য পরের তোষামোদ করিতে হইবে না। কোন রেলষ্টেসন হইতে ভাল পাকা রাস্তা যদি কোন বড় গ্রাম বা নগর পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে, সেই স্থানে মটর কার চালাইলে যথেষ্ট উপার্জ্জন হইতে পারে।

মটর কার নানা প্রকারের আছে। আরোহীর সংখ্যানুসারে মূল্যের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। দুই ব্যক্তির আরোহণোপযোগী একটী মটর কারের মূল্য ৩০০০৲ টাকা, ৪ জনের উপযোগী গাড়ির মূল্য ৬৪০০৲ টাকা ইত্যাদি। বড় লোকেরাই নিজেদের ব্যবহারের জন্য উক্তরূপ গাড়ি খরিদ করিতে পারেন। ব্যবসায় করিতে হইলে ওয়াগোনেট (Wagonette) নামক গাড়ীই সুবিধাজনক। চালকসমেত ৮ জন আরোহীকে উক্ত গাড়ী বহন করিতে সক্ষম। আমাদের দেশের পাকা রাস্তার উপর চালাইবার পক্ষে এই গাড়ীই সম্পূর্ণ উপযোগী। উক্ত গাড়ীর মূল্য ৮১০০৲ টাকা। কোন শিক্ষিত ভদ্রযুবক যদি একটী কোম্পানী গঠন করিয়া অথবা নিজেই মূলধন সংগ্রহ করিয়া ওয়াগোনেট মটর কার চালাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অন্য কোনরূপ উপায় আর দেখিতে হয় না। উক্ত গাড়ীর গতি, ঘণ্টায় ১৫ হইতে ১৮ মাইল পর্য্যন্ত। নিম্নে আয়-ব্যয়ের হিসাব দিলাম।

ব্যয়।——	মূলধন——
ওয়াগোনেট গাড়ীর মূল্য	৮১০০৲
কলিকাতা হইতে আনাইবার খরচ ও গাড়ী রাখিবার ও চালক প্রভৃতির জন্য গৃহ প্রস্তুতের খরচ	৯০০৲
	৯০০০৲

মাসিক ব্যয়।——

কোন রেলষ্টেসন হইতে কোন প্রধান নগর বা গ্রাম যদি ১৪ মাইল হয়, তাহা হইলে যাতায়াতে ২ ঘণ্টা লাগিবে।

উক্ত ২৮ মাইল ভ্রমণ করিতে কেরোসিন তৈলের মূল্য ৩॥০ টাকা।

যদি দৈনিক ২ বার যাতায়াত করা যায়, তাহা হইলে তৈলের মূল্য—

দৈনিক ৭৲ টাকা হিসাবে মাসিক	২১০৲
২ জন চালকের বেতন মাসিক	৪০৲
১ জন চাকরের বেতন মাসিক	৮৲
১ জন মুহুরির বেতন মাসিক	১৫৲
অন্যবিধ ব্যয় মাসিক	২৭৲
	৩০০৲

চালক সমেত ৮ জন আরোহীর বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সুতরাং চালককে বাদ দিলে ৭ জনের নিকট হইতে ভাড়া পাওয়া যাইবে। ১৪ মাইল রাস্তার জন্য যদি জন প্রতি ১৲ টাকা ভাড়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে অসঙ্গত হইবে না। তাহা হইলে প্রতি বারে ৭৲ ও দৈনিক ২বার যাতায়াতের ভাড়া ৭ × ৪ = ২৮ × ৩০ দিনে মাস,—৮৪০৲

প্রতি বারে ৭ জন আরোহী নাও যুটিতে পারে, অথবা রাস্তার মধ্যে কেহ কেহ নামিয়া যাইতে পারেন, তজ্জন্য বাদ দিতে হইবে	১৪০৲
	৭০০৲
বাদ পূর্ব্বধৃত খরচ	৩০০৲
মাসিক লাভ	৪০০৲
মহাজনের নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়া ব্যবসায় করিলে মহাজনের ৯০০০৲ টাকার সুদ শতকরা ১৲ হিঃ মাসিক দেয়	৯০৲
	৩১০৲
গাড়ী মেরামত ও আবশ্যক গৃহাদি প্রস্তুত জন্য মজুত থাকিবে	৬০৲
নিকর লাভ	২৫০৲

যে ব্যবসায়ে সমস্ত খরচ বাদ দিয়া মাসিক ২৫০৲ টাকা মুনাফা পাওয়া যায়, সেই ব্যবসায় কি অবহেলার যোগ্য? বার্ষিক মুনাফা ৩০০০৲ টাকার মধ্যে যদি প্রথম বর্ষেই ২০০০৲ টাকা মহাজনের দেনা পরিশোধ করা যায়, তাহা হইলে সুদ কমিয়া লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। The Western Trading Co'র এজেন্ট মহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন যে, যদি সমতল রাস্তার উপর প্রতি ঘণ্টায় ১৫ হইতে ১৮ মাইল গতিতে গাড়ী চালাইয়া প্রত্যহ ৫০ মাইল ভ্রমণ করা যায়, তাহা হইলে ওয়াগোনেট গাড়ী ২ বৎসর মেরামত করিতে হইবে না। মেরামতের প্রয়োজন হইলে উক্ত কোম্পানীই মেরামত করিয়া দিবেন। একজন বি এ, কিম্বা এম এ, উপাধিধারী ব্যক্তি ২৫০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইবার সহসা আশা করিতে পারেন কি? অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত কোম্পানীকে লিখিতে হইবে। তাঁহারা গাড়ী চালাইতে শিক্ষা দিতে ও নানা প্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

শ্রীশীতলদাস রায়।

ছাতার বাঁটের কারখানা।

কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট—আর্য্য-মিশন স্কুলের পার্শ্বে এক বাড়ীতে ইহার কারখানা খোলা হইয়াছে। কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে এক প্রকার সরু তল্তা বাঁশ জন্মে। তাহা কলিকাতায় আমদানী হইতেছে। দাম শস্তা। বড় ছাতার মাপের ১২টা কাটির দাম ও উহা আনিবার পাথেয় খরচা ধরিয়া ৭॥ হিসাবে ।১০ আনা মাত্র। কাটিগুলির গাত্র ছুরি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইয়া উহা রৌদ্রে অল্প শুকাইয়া লইতে হয়। পরে একস্থানে অগ্নিকুণ্ড করিয়া কামার-দোকানের লৌহ তাতাইবার মত ভাবে কয়লা চাপাইয়া আগুন করিতে হয়। পরে টানাপাখা টানিবার হুইলের মত এক প্রকার বাঁটওয়ালা যন্ত্র আছে, (টানাপাখার হুইল ঘুরিতে থাকে, ইহা ঘুরে না) এই লৌহ-যন্ত্রকে পূর্ব্বোক্ত আগুনে কয়লা চাপা দিয়া তাতাইতে হয়। এক দল ৫।৭ জন লোক প্রত্যেকে এইরূপ এক একটা যন্ত্র লইয়া উহা আগুনে তাতাইতেছে। ইহা ভিন্ন তাহাদের নিকট এক প্রকার সাঁড়াশী আছে, এই সাঁড়াশী এমন ভাবে গঠিত যে, তদ্দ্বারা তল্তাগাছটীর মুখ বসিয়া পায়ের ভারে অনায়াসে ধরা চলে। পূর্ব্বোক্ত তল্তাগাছটীর প্রথম পাক পর্য্যন্ত যে স্থানে ফাঁপা গর্ত্ত আছে, উহাতে বালি পূরিয়া দেওয়া হয়; কারণ তাহা হইলে অল্প তাপে শীঘ্র তলতাগাছটী ফাটিতে পারিবে না; তথাপি অনেক নষ্ট হয়। এই বালিপূর্ণ তল্তার মুখটী অগ্নিকুণ্ড-ঢাকা উত্তপ্ত কয়লার উপর রাখিয়া কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিতে হয়। পরে উক্ত মুখ সেই পদস্থ সাঁড়াশী দ্বারা ধরা হয়। ওদিকে সেই উত্তপ্ত পাখাটানা হুইলবৎ তাতাল অগ্নি হইতে বাহির করিলে দেখা যায় যে, যদি উহা লোহিতাকৃতি ধারণ করিয়া থাকে, তাহাহইলে অল্প জলে ভিজান নেকড়া দিয়া মুছাইয়া উহার তেজ কমাইয়া পদস্থ সাঁড়াশীবদ্ধ কাটির মুখে উহাকে রাখিয়া আস্তে আস্তে কাটির মধ্যদেশ ধরিয়া কাৎ করিয়া নোয়াইলে, উহা সেই চাকার গাত্রে গরমে নরম হইয়া অর্থাৎ চাকার তাপে তল্তাবাঁশের অপর পৃষ্ঠা অল্প দগ্ধ হয়, সেই সময় অল্প নরম হয়, কোন কোনটা বা নরম হইয়া আসিবার সময় উপর পৃষ্ঠা ফাটিয়া চটিয়াও যায়, এইরূপ অবস্থা হইলে উহা ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া লইতে হয়। যাহা হউক, উক্ত উত্তপ্ত চক্রের কিছুদুর পর্য্যন্ত তলতাটী আসিলেই উহার দুই প্রান্তে তৎক্ষণাৎ এক

গাছি দড়ি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই দড়ি বাঁধা পর্য্যন্ত এক দলের কাজ। তাহার পর অপর দল, অন্য এক স্থানে ঐ ভাবে অগ্নিকুণ্ড করিয়া তাহা ঘেরিয়া বসিয়া থাকে। ইহারা দড়িবাঁধা কাটি লইয়া, উক্ত কাটিটী পুনঃরায় উত্তপ্ত কয়লার উপর রাখিয়া নাড়াচাড়া করিয়া তাতাইয়া লয়। এ স্থানে সমুদয় কাটিতে তাতাইবার কারণ এই যে, তল্‌তাবাঁশ প্রায় সমান আকৃতির হয় না, উহা বাঁকাচোরা থাকে, এই কারিকরদলে কাটিটীর বাঁকা সংশোধন করিয়া সমান করিয়া লয়। তৎপরে ১২ দিন বাদে উক্ত কাটির মুখের বক্রস্থানের দড়ি খুলিয়া দিয়া, অন্য একদল কারিগরে এই কাটিতে বার্ণিশ করে। কাষ্ঠ বার্ণিসের সঙ্গে এই বার্ণিসের মিল আছে। পরন্তু ইহারা বার্ণিস করিবার পুর্ব্বে এই কাটির গাত্রে কালিবিশেষ দিয়া নানাবিধ কারুকার্য্য করিয়া পরে বার্ণিস দিয়া উহাকে স্থায়ী করিতে পারে। উপস্থিত কাল দাগ স্থানে স্থানে দিয়া বার্ণিস করা হয়, অর্ডার করিলে, লতা-পাতা-ফুল ইত্যাদি আঁকিয়াও বার্ণিস করা চলিবে। এই শ্রেণীর কারখানায় কেবল ছাতার বাঁট প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়। ইহারা বার্ণিস করা ১২টা কাটি ॥৵০ আনা ৵০ আনায় বিক্রয় করেন। অতএব ডজনকরা ।০ আনা বা ।৵০ আনা লাভ থাকে। আমরা যে কারখানা দেখিলাম, ইহাতে ৮ জন লোক তিন দলে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে। ৩ জন তাতাল দিয়া কাটির মুখ বাঁকাইয়া দিতেছে, ৩ জন উহা তাতাইয়া সোজা করিতেছে। ১ জন বার্ণিস করিতেছে, এবং অপর ১ জন কাটির ভিতর বালি পুরিতেছে ও কাটিগুলি কারিগর সকলের নিকট যোগান দিতেছে।

১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ৭ ঘণ্টায় এক জন লোক, ঘণ্টায় ১২টা হিসাবে কাটি প্রস্তুত করিলে ৭ ঘণ্টায় সে ৮৪ টা কাটি বা ছাতার বাঁট প্রস্তুত করিবে। এই হিসাবে পারস্পরিক-পরিশ্রম বলিয়া, ১ জনে এক দিনে ৮৪টা করিলে ৭ জনে ৫৮৮টা বাঁট করিবে। উহার মূল্য গড়ে প্রতি ডজন ৵০ আনা হিসাবে ধরিলে ২৭॥০ টাকা হয়। অতএব ৭ জন লোক লইয়া

প্রাত্যহিক কারখানার আয়— ২৭॥০ টাকা
তৎপরে ৭ জন লোকের ১৲ হিসাবে রোজ ধরিলে ৭৲ টাকা
এবং কয়লা ২ মণ ১৲ টাকা। মোট ব্যয়— ৮৲

লাভ— ১৯॥০

এ শ্রেণীর কারখানা এ দেশে এই নূতন। এখনও ইহার প্রত্যহ চালাইবার মত অবস্থা হয় নাই। ২।৪ দিন চালাইয়া যে মাল উৎপন্ন হয়, উহা বিক্রীত হইয়া ফুরাইয়া গেলে, আবার ২।৪ দিন এই কারখানা চলে। যে সে কুলীকে এ কাজ একবার দেখাইয়া দিলেই সে করিতে পারে।

দেশীয় শিল্প-সংবাদ।

শুনিতেছি, এক সময়ে দেশীয় শিল্পজাতের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতা স্বদেশী ভাণ্ডার এবং নাগপুর ন্যায়সুধা আফিস হইতে চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু আমরা সাধারণে তাহার ফল জানিতে পারিলাম না। দেশীয় জিনিস যে কি কি হয়, তাহা অনেকে জানেন না; আর কোথায় পাওয়া যায়, তাহা আরও কম লোকে জানেন।

এখন এদেশী জিনিস এত হইয়াছে যে, বিদেশী জিনিসের ব্যবহার ব্যতীত অনেকটাই চালান যায়। যাহা সম্পূর্ণরূপে বিদেশে প্রস্তুত, তাহাই এ স্থলে বিদেশী বলিয়া ধরিতে হয়, এবং যাহা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রস্তুত, তাহাই দেশীয়। ফরাশডাঙ্গার কাপড়ের সূতা বিলাতী, দেশীয় হেটো কাপড়ের সূতাও প্রায়ই বিলাতী, কিন্তু ও সকলকে দেশীয় বলিয়াই ধরিতে হয়। নাগপুরের মিলের বা বোম্বাই মিলের সকল কাপড় এবং কানপুর মিলের মোটা কাপড়গুলির সূতাও বিদেশী। কানপুরী টুইলের সূতাও শুনিয়াছি, বিলাতী। কিন্তু ও সকলই এদেশী বলিতে হইবে। চীনেবাড়ীর জুতার চামড়া, টোয়াইন, পেরেক সমস্তই বিদেশী এবং কারিকরেরাও বিদেশী; তথাপি ঐ "জুতা" এদেশে প্রস্তুত হয় বলিয়া এদেশী ধরিতে হয়। নচেৎ শিল্পপ্রধান ইংলণ্ডের "শিল্প" নাই বলিয়া যে ধরিতে হইবে! চামড়া বল, পাট বল, সূতা বল, সবই ইংলণ্ডে "বিদেশ" হইতে গিয়াই "তথায়" শিল্পজাতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এবং ধনবান্ কলওয়ালা ও সাধারণ কারিকরের মধ্যে ইহুদী, গ্রীক প্রভৃতি সকল জাতীয় লোকই তথায় আছে। তবে বিলাতী কলওয়ালাদের সহিত সংসৃষ্ট কল বলিয়া কানপুরের কোন কলওয়ালা যদি ফ্ল্যানেল কাশ্মীরাদি বিলাত হইতে আনাইয়া সুধু এদেশী কলের আফিস

হইতে বিক্রয় করেন, তাহাকে দেশী জিনিস বলা যায় না। ধারিওয়ালের কলের লুই বা র‍্যাপার ও ফ্ল্যানেল এদেশী মালে এ দেশেই প্রস্তুতি হয়।

এক্ষণে এ দেশে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুতি হয়, তাহার একটী মোটামুটি তালিকা দিতেছি। কোন "বিশ্বস্ত" এজেন্সি দ্বারা লইলে বা নিজে চেষ্টা করিয়া জিনিস বাজারে অনুসন্ধান করিলে সকলেই পাইতে পারিবেন। "বিশ্বস্ত" কথাটী বলিবার কারণ এই যে, কোন সময়ে আমি দেশীয় মোজা চাহিলে একজন দোকানদার সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট বিলাতী মোজা দেশীয় বলিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। তাহা দু'দিনে ছিঁড়িয়া গেল! তখনও কানপুরের কলের মোটা কিন্তু যথেষ্ট মজবুত মোজা প্রস্তুতি হয় নাই।

আমার অসম্পূর্ণ তালিকা যদি পাঠকগণ সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশীয় শিল্পীদিগের হয় ত কোন উপকার হইতেও পারে।

কাপড়।

ধুতি ও উড়ানি—প্রতি মঙ্গলবারে হাবড়ার হাটে সর্ব্বপ্রকার দেশীয় ধুতি বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে। তথা হইতে গৃহস্থেরা এবং পাইকারেরা কাপড় কিনিয়া লইয়া যান। হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়া ও পাবনা জেলার কাপড়ই অধিক আইসে বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। ছিট্, লুঙ্গি প্রভৃতি ফরিদপুর ও চট্টগ্রাম হইতেও পাইকারের হাতে আইসে। গামছা অজস্র বিক্রয় হয়। কঁইকালা, রামজীবনপুর, কল্মে, বালী-দেওয়ানগঞ্জ, হরিপাল, ফরাশডাঙ্গা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে মোটা ও সরু উড়ানি ও ধুতি এখনও যথেষ্ট প্রস্তুত এবং হাবড়ার হাটে বিক্রীত হয়।

ফরিদপুর ও যশোহরের মোটা ধুতি বেশ টেঁকসই বলিয়াই দেখিয়াছি। বাঙ্গালায় এমন জেলা নাই; যেখানে আজও কিছু না কিছু ধুতি প্রস্তুত হয়। রিষড়ার ও নাগপুরী কলের খুব মোটা ধুতি ছোটনাগপুর ও বাঁকুড়া প্রভৃতির দরিদ্রগণ ব্যবহার করেন। ঐ সব অঞ্চলে ঘরের সূতার বুনান খুব মজবুত ও খুব মোটা কাপড় আজও ব্যবহার হয়।

২। চাদর ও জামা প্রভৃতির জন্য থান—পশ্চিমে "মোটিয়া" কাপড়ে গৃহস্থ ব্যক্তিরা "দোহর" বা দুই পাট জোড়া দিয়া দুই ফর্দ্দের দোলাইয়ের ন্যায় গাত্রবস্ত্র প্রস্তুত করেন। সৌখীন বাঙ্গালী দরিদ্রাবস্থায়ও আর তাহা ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু এক ফর্দ্দ মাঞ্চেষ্টরী বা বোম্বাই চাদরে ততটা শীত কাটে না। ঐরূপ মোটা কাপড়ের থান চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া অঞ্চলেও প্রস্তুত হয়। ঐ গুলিকে "জোলার কাপড়" বলে। সম্ভবতঃ সকল জেলাতেই ঐরূপ কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কুষ্টিয়ার চৌখুবি ডোরাদার ও রঙ্গিন বিছানার চাদরও অনেক বিক্রয় হয়। আমি দেখিয়াছি, সাধারণতঃ সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমানেরা এই সকল দেশীয় বস্ত্র অবিকতর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া স্বধর্ম্মী তাঁতিদের উপকার করিয়া থাকেন। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, নাগপুর ও কানপুরের কলের মোটা "বোম্বাই চাদর", দানাপুর, শিউড়ী, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানের ট্যারচা-বুনান ও ফুলদার চাদর, ক্যানানোরের উৎকৃষ্ট টেবল-ক্লথ, শিউড়ির ও নাগপুরের ও ভুটিয়া রঙ্গিণ মোটা সূতার পর্দ্দার ও ফরাশের ও বিছানা ঢাকা রাখিবার উপযুক্ত চাদর, ফেরিওয়ালাদের নিকট ও ভাল দোকানে খুঁজিলে পাওয়া যায়। কুষ্টিয়াদির পাতলা ছিট, নাগপুরী মার্কিন ও নয়ানশুক ও টুইল, আমেদাবাদী লংক্লথ, কানপুরী টুইল ও টি-ক্লথ এক্ষণে পিরান ও কামিজের এবং লেপের ও বালিসের ওয়াড়, বিছানার চাদর প্রভৃতির অভাব মোচন করিতেছে। নানাপ্রকার "শিটিং"—মোটা চওড়া বহরের কাপড়—কলে হইতেছে। কানপুরী ক্লোরক্লথ ও চৌকা ক্লথ হইতে বেশ ফরাশের চাদর হয়। নদীয়ার দামুরহুদার "রিব"-দেওয়া মোটা থানের চাদর সুদৃশ্য ও টেঁকসই।

৩। তোসক ও বালিশের খোল প্রভৃতির উপযুক্ত কাপড়—নদীয়ায় শিকারপুরের ডোরাদার মোটা থান পাটনাই বা মাদ্রাজী খেরো (খেরো যে বিলাতীও আছে, তাহা সকলে জানেন না) ও কুষ্টিয়াদির মোটা ছিট হইতে এবং পশ্চিমে মোটা কাপড় রঙ্গাইয়া তোসকের খোল প্রভৃতি বেশ হয়। কানপুরী শালু, লক্ষৌ-ছিট, রঙ্গিন লেপের খোল, ভাগলপুরী রঙ্গিন বাফতা প্রভৃতি হইতে নেপের খোল, বালাপোষ প্রভৃতি ভালই প্রস্তুত হয়। নাগপুরী বা কানপুরী ড্রিল ও দেশীয় খেরো হইতে বেশ বালিশের খোল প্রস্তুত হইতে পারে। অনেকে মুসলমানী লুঙ্গি জোড়া দিয়াও বেশ লেপ প্রস্তুত করেন।

৪। কোট, পেণ্টুলন, টুপি প্রভৃতির কাপড়—কুমিল্লা ও কুষ্টিয়াদির মোটা ছিটে, কানপুরী, নাগপুরী ও বোম্বাই কলের সাদা জিন, খাকি ও নীল রঙের ও নানা প্যাটার্ণের চৌখুবী ড্রিলে কোট পেণ্টুলেন প্রভৃতি বেশ হয়।

জাহানাবাদ, ঘাটাল, বহরমপুর, বাকুড়া, ভাগলপুর ও আসামের তসর, বাফতা, গরদ, এড়িমুগা, মটকা প্রভৃতি এই কার্য্যে বেশ চলিতেছে। হুগলীর জাহানাবাদ মহকুমার বালী দেওয়ানগঞ্জের "মুরেঠার" কাপড় হিন্দুস্থানী ও মুসলমান ভদ্রলোকদিগের প্রিয়। টুপিও যে সে রেশমী ও পশমী কাপড়ে প্রস্তুত করা যায়। পশমী টুপি কাবুলীদের নিকটে পাওয়া যায়। মলিদা ও শালের ওরূপ টুপি অমৃতসহর প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ভারতে শিল্পশিক্ষা।

পুনা-শিল্প-সমিতিতে মহাত্মা শ্রীযুক্ত তালাতির বক্তৃতা।

শিল্পাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের আমি কয়েকটী উপদেশ দিতে চাই।—১ম উপদেশ, শিল্প শিখিবার কালে এবং শিক্ষা শেষ হওয়ার পর পর্য্যন্তও যতদিন না কাজে কর্ম্মে পাকা হইয়া বসিতে পারা যায়, ততদিন কোনরূপ আমোদ-প্রমোদ, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়াস পাওয়া উচিত নয়। পুনায় কিরূপ বলিতে পারি না, কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলে এবং আমার নিজের দেশ আহমদাবাদেও দেখিতে পাই, যুবকদল বেশ-ভূষা করিয়া ছড়িহাতে সায়ং সময়ে আমোদ করিয়া বেড়াইতে বাহির হন। শিল্প শিখিবার সময় এ সকল করিলে চলিবে না। তখন খুব প্রাতঃকালে কারখানায় যাইতে হইবে এবং রাত করিয়া বাড়ী ফিরিতে হইবে। ইহাতে আপাততঃ একটু ক্লেশ বোধ হইবে সত্য, কিন্তু পরিণামে সুখ হইবে।

২য় উপদেশ—সহিষ্ণু ও অধ্যবসায়শীল হওয়া চাই। একবারেই সকল কাজ করিতে পারিব, এমন আশা করিতে পারা যায় না। আমি যে সকল শিল্পের কথা বলিব, তন্মধ্যে অনেকগুলিই নূতন, উহাদিগের সম্বন্ধে পুস্তকাদিতে তেমন কোন কথা নাই। আর যদিও কিছু থাকে, তাহারও অধিকাংশ এ দেশের জলবায়ুর অবস্থা-বিভেদে তেমন কার্য্যকারী হইবে না। ফলে, শিক্ষা নিজে নিজেই করিতে হইবে, সুতরাং প্রথম প্রথম পরীক্ষা-স্থলে অনেক সময়েই অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু তাহাতে ভগ্নোদ্যম না হইয়া সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়সহ কার্য্য করিতে পারিলেই পরিণামে মঙ্গল হইবে।

৩য় উপদেশ—কোন শিল্পব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া উহাকে হীনকার্য্য মনে

করিলে উহাতে উন্নতি লাভ করিতে পারা যায় না। যে ব্যবসায়ই অবলম্বন কর, উহা সততার সহিত চালাইতে পারিলেই প্রতিপত্তি লাভ হয়; নতুবা ব্যবসায়ের উৎকৃষ্টতা, নিকৃষ্টতা বিবেচনায় ব্যবসায়ীর প্রতিপত্তি হয় না। কাটিবারের রাজনৈতিক বিষয়ের সরকারী এজেন্ট কর্ণেল হণ্টার বলিয়াছিলেন যে, এক জন ভাল মুচি একজন কু-রাজমন্ত্রী অপেক্ষা সমাজের অধিকতর উপকারী।

আমার শেষ উপদেশ—স্বহস্তে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি যেন হয়। ইহা মর্য্যাদার হানিজনক বলিয়া মনে করিতে নাই। শিল্প ব্যবসায়ের মধ্যে এমন অনেক বিষয় (কি কি উপাদান কিরূপ পরিমাণে মিশাইয়া একটা দ্রব্যের উৎপাদন করিতে হইবে ইত্যাদি) থাকে, যাহা কারিগরদিগের নিকট কতকটা গোপন রাখিতে হয়। কাজেই সে স্থলে নিজ হস্তে কর্ম্ম করিতে না পারিলে আর উপায় নাই। আর এক কথা, নিজে হাতে কাজ করিতে না জানিলে কারিগর প্রভৃতির নিকট প্রতারিত হইতে হয় না। একজন কারিগর দিনে কতটুকু কাজ করিতে পারে, তাহা জানিয়া কারিগরদিগের কাজের নিকাশ লইতে পারা যায়। কোন একজন কারিগরের অনুপস্থিতিতে কারবার বন্ধ যায় না। সুতরাং খরিদ্দারদিগকেও সন্তুষ্ট রাখিতে পারা যায়।

এই উপদেশ-বাক্যগুলি আমার নিজের অভিজ্ঞতার ফল। আজ দশ বৎসরের কথা বলিতেছি, আমার ছেলেটী তখন ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে; আমি স্থির করিলাম, গবর্ণমেণ্টের চাকরী অথবা ডাক্তারী ওকালতী প্রভৃতির অন্যতম বিষয়ে ছেলেকে না ঢুকাইয়া উহাকে কোনরূপ শিল্প শিখাইব। কিন্তু কি শিল্প শিখাইব, তখন তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। করাচীতে থাকিতে দেখিয়াছিলাম, অনেক চামড়া জাহাজে বোঝাই হইয়া বিদেশে রপ্তানী হয়। আমার মনে হইল, পুত্রকে সেই চামড়ার "পাট" করিতে শিখাইব। পুত্রও ঐ সময় মধ্যে ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। উক্ত শিল্প অবলম্বন করাই স্থির হওয়ায় পিতা-পুত্রে উহার অভ্যাস করিতে লাগিলাম। উহার সম্বন্ধে কি কি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল তখন আমার জানা ছিল না। সুতরাং "রসায়ন বিজ্ঞানের সাধারণ কার্য্যে ব্যবহার" শিক্ষা আরম্ভ করিলাম এবং "চামড়া" প্রবন্ধটী পড়িয়া ফেলিলাম।

ইহার কিছুদিবস পরে ইংলণ্ডে যাইয়া আমি পুত্রকে চামড়ার শিল্পসম্বন্ধে একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দি। আমার পুত্র তখন মিঃ স্যাঞ্চার্জ্জি শাপুর্জ্জি কোম্পানীর চামড়ার কারখানায় শিক্ষা-নবিশী করিতেছিল—খুব প্রাতে যায়,

রাত্রিতে আসে, আমোদ-প্রমোদ তাহার কিছুই ছিল না। কারখানায় "হাতে হেতেরে" কাজ শিখিত এবং পুস্তক হইতে তৎসম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিত। এইরূপে সে লণ্ডন ইন্‌ষ্টিটিউট কর্ত্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় ঐ বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে পারিল।

চামড়া রঙ্গাইয়া কিরূপে উহার পাট করিতে হয়, তাঁহার শিক্ষা হইয়া গেলে, উহাকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী করিবার মত শিক্ষা আরম্ভ করা গেল। এ সম্বন্ধে পুস্তকাদি হইতে আমাদের দেশের উপযোগী তেমন কিছু জানা গেল না। সুতরাং আমাদের নিজেকেই নিজেদের শিক্ষক হইতে হইল। ইহাতে অনেক মাল মসলা, অনেক অর্থের অপব্যয় হইতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইতে লাগিলাম। আমার পুত্র একবার নিরুৎসাহ হইয়া কার্য্যই ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিল। আমি নিয়তই তাহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলাম। এইরূপে ৮ বৎসরকাল নিয়ত চেষ্টার পর জীবনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থগুলি ব্যয় হইয়া যাইবার পর—আমরা কৃতকার্য্য হইলাম।

এই কার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণকে আমরা পিতা-পুত্রে অনেক বিষয়ে উপদেশ দিতে পারিব। আমরা যাহা না পারিব, তাহা ইংলণ্ড, জর্ম্মনী ও আমেরিকার শিল্পীদিগের নিকট হইতে জানিয়া লইতে পারা যাইবে। পুনার শিল্পসমিতিও শিল্পশিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারিবেন।

এখন কেহ এই বলিবেন যে, আমার কিছু জ্ঞান, পয়সা ও প্রভুত্ব ছিল বলিয়াই, আমার ছেলেকে ওরূপে তৈয়ারী করিতে পারিয়াছি। আমি বলি যে, এই নগরীর মধ্যে আমার ন্যায় জ্ঞান, পয়সা ও প্রভুত্ব পৃথকভাবে এবং একাধারে অনেকেরই ত আছে। ফলকথা, উদ্যমশীলতার অভাব। একটা নূতন শিল্পশিক্ষায় অর্থব্যয় ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। অর্থব্যয় করিতে যাঁহারা পারেন, তাঁহাদের মধ্যেও আবার অনেকে এমন বলেন, "ছেলের জন্য টাকা খরচ করিতে পারি, কিন্তু ছেলের কিসে উন্নতি হইবে না হইবে, সে চিন্তায় নিজেকে জ্বালাতন করিতে চাহি না।" তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার কথা এই, পিতা, পুত্রের উন্নতিসাধনের জন্য যথাসাধ্য যত্ন না করিলে, পুত্রের সম্বন্ধেই তাঁহার কর্ত্তব্যই পালন করা হয় না। পুত্রের বিদ্যা-শিক্ষায় পিতাকে যোগ দিতে হইবে, উপযুক্ত শিল্প-নির্ব্বাচন বিষয়ে পুত্রের সহিত পরামর্শ করিবেন, অথবা নিজেই তাহা স্থির করিয়া দিবেন। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় পিতা স্বয়ং যদি যোগ নাও দিতে পারেন, তথাপি পুত্রের কিরূপ শিক্ষা হইতেছে, সে

সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখিবেন। পুত্র কৃতকার্য্য হইলে পিতা আনন্দ প্রকাশ করিবেন, অকৃতকার্য্য হইলে পুত্রের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবেন। এইরূপে পুত্র কাজ-কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া যত দিন না উহাতে পাকা হইয়া বসিতে পারে, তত দিন উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পুত্রের প্রতি পিতার এইটুকু কর্ত্তব্যাংশ বলিয়াই আমি মনে করি।

উপসংহারে আমার একটী বক্তব্য এই যে, দেশময় শিল্পসমিতি সংগঠিত হইলে শিল্পশিক্ষায় উৎসাহ হয়। এই সমস্ত সমিতির সহায়তায় ক্রমশঃ ভবিষ্যতে আমাদের দেশ শিল্পসমৃদ্ধি বিষয়ে প্রধান দেশ সমূহের মধ্যে যে গণ্য হইবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। এডুকেশন গেজেট।

মিশ্রিত দ্রব্য স্বতন্ত্র করিবার উপায়।

সাধারণতঃ, গৃহস্থ-ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা স্বতন্ত্র করা হয়।

(১) কেবল জল দ্বারা, (২) কেবল অগ্নি দ্বারা, (৩) কেবল বায়ু দ্বারা, (৪) কোথাও জল ও অগ্নি, (৫) কোথাও চুম্বক শক্তি এবং (৬) কোন কোন স্থলে জল, অগ্নি ও অপর দ্রব্য, সকল গুলিরই একত্র কার্য্যে প্রয়োজন হয়।

নিম্নে কয়েকটী মিশ্রিত দ্রব্য স্বতন্ত্র কারবার প্রক্রিয়া বলা যাইতেছে।

(১) কেবল জল দ্বারা।—নারিকেল শস্য শুকাইয়া, ঘানিতে পিশিয়া, নারিকেল হইতে উহার তৈল স্বতন্ত্র করা হয়। কিন্তু ঐ চাপ দ্বারা তৈল স্বতন্ত্র করিলে তৈলের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ থাকে। তাহা এখানে বলা অনাবশ্যক। কেবল জল দ্বারা উহার তৈল স্বতন্ত্র করা হয়, আর তাহাই বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল।

নারিকেল শস্য কুরিয়া, কাপড় দিয়া নিংড়াইলে, নারিকেল দুগ্ধ পাওয়া যায়। ঐ দুগ্ধ পরিষ্কার জলে ঢালিয়া স্থিরভাবে কিছুক্ষণ রাখিলে, তৈল জলে ভাসিয়া উঠে। পরে ঐ তৈল সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা এত উৎকৃষ্ট তৈল যে, ইহার গন্ধ নাই এবং ইহা কাঁচা খাওয়া যায়।

(২) কেবল অগ্নি দ্বারা।—সকলেই জানেন, মিশ্রিত ধাতু হইতে ধাতু স্বতন্ত্র করিতে কেবল অগ্নিরই প্রয়োজন হয়। যদি ঘৃত ও মৃত্তিকা একত্র

থাকে, তাহা হইলে উহাকে কেবল অগ্নির তাপ দ্বারাই স্বতন্ত্র করা যায়। রজন ও গর্জ্জন তৈল দু'য়ে মিশ্রিত হইলে উৎকৃষ্ট টীন বার্ণিস হয়, কিন্তু ঐ বার্ণিস বিশিষ্ট টীন-পাত্রে অগ্নির তাপ দিলে, উক্ত দুই দ্রব্য স্বতন্ত্র হইয়া যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৩) কেবল বায়ু দ্বারা।—সকলেই জানেন, স্ত্রীলোকেরা দাইল হইতে ভূষি স্বতন্ত্র করিতে যে কুলা ব্যবহার করেন, তাহার দ্বারা কেবল বায়ুর সাহায্যেই দাইল হইতে ভূষি স্বতন্ত্র হয়। পশ্চিমাঞ্চলে পুষ্পের তৈল বায়ুর দ্বারা তিল তৈলের ভিতর আনয়ন, করা হয়, তাহাকেই ফুলেল তৈল বলে। কতকগুলি সুগন্ধি ফুলের পাপড়ী সংগ্রহ করিয়া এবং কতকগুলি তুলার পাত করিয়া, ঐ পাতগুলি তিলের তৈল অথবা জলপাই তৈলে (সুইট অয়েল) যদি ভিজাইয়া লওয়া হয়, এবং পরে কোন পরিষ্কার মৃত্তিকা-পাত্রে অগ্রে ফুলের পাপড়ী রাখিয়া তাহার উপর তৈলসিক্ত তুলার পাত রাখিয়া, পরে পরে ঐ পাতের উপর যদ্যপি পুনরায় পাপড়ী রাখা যায়, এবং ঐ ভাবে পাপড়ী ও তুলার পাত পর পর সাজাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে বায়ুর সাহায্যে পাপড়ীর তৈল তুলার পাতে আসিয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। কিছু দিন ঐ ভাবে রাখিলে এই প্রক্রিয়া দ্বারা সহজে ফুলেল তৈল প্রস্তুত হয়।

(৪) কোথাও জল ও অগ্নি দ্বারা।—আসব করিবার সময় রিটর্টে (বক-যন্ত্রে) ফুল ও জল দিয়া অগ্নির সাহায্যে চোলাই করিয়া ফুল হইতে তৈল স্বতন্ত্র করা হয়। এই তৈলে বায়ু থাকে না বলিয়া ইহা শীঘ্র বায়ুর সহিত মিশিতে যায়, এই জন্য ইহার নাম "বায়ী তৈল।" মদ্য প্রভৃতিও, জল ও অগ্নির দ্বারা স্বতন্ত্র করা হয়।

(৫) কোথাও চুম্বক শক্তি দ্বারা।—দরজীদের ছুঁচ মাটিতে হারাইয়া গেলে, চুম্বক প্রস্তর দ্বারা তাহাকে বাহির করা হয়। বারুদের লৌহচূর্ণ স্বতন্ত্র করিবার সময় কেবল চুম্বক প্রস্তর ব্যবহৃত হয়।

(৬) জল, অগ্নি ও অপর দ্রব্য দিয়া।—অপরিষ্কার চিনি (দলুয়া চিনি) পরিষ্কার করিবার সময়, প্রথম জল দিয়া তাহাকে রস করা হয়, পরে অগ্নি দিয়া জাল দিলে চিনির মধ্যস্থ অপরিষ্কার দ্রব্য জলে উপস্থিত হয়। পরে তাহাকে (ঐ রসকে) কোন তলদেশ-ছিদ্রযুক্ত পাত্রে রাখিলে, উহার অপরিষ্কার জল ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। এক্ষণে ঐ রসকে পাটাশেয়ালা দ্বারা শুষ্ক করা হয়।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
২য় খণ্ড, ১০ম সংখ্যা ; অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ সাল।

কাসাভা আলুর চাষ।

(২)

(লেখক—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, M. A, M. R. A. C.
and F. H. A. S.)

'কাসাভা' দুই জাতীয়। দুই জাতীয় কাসাভা হইতেই আমেরিকা মহাদেশে 'ট্যাপিওকা' প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু উহাদের মধ্যে এক জাতীয় কাসাভা (মানিহোৎ উতিলিসিমা) বিষাক্ত। মানিহোৎ আইপি বা মিষ্ট-কাসাভা বিষাক্ত নহে ; ইহার মূল কাঁচা অবস্থাতে খাইলেও তিক্ত লাগে না, বা অখাদ্য মনে হয় না। এই জাতীয় কাসাভা লাগানই শ্রেয়ঃ। তিক্ত কাসাভাতে প্রুসিক এসিড নামক তীব্র বিষাক্ত পদার্থের ভাগ কিছু অধিক পরিমাণে থাকাতে, ইহা কাঁচা অবস্থাতে ব্যবহার করিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। ট্যাপিওকা প্রস্তুতকালে যে অগ্নির উত্তাপ ব্যবহার হয়, উহা দ্বারাই এই বিষাক্ত পদার্থটী উড়িয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ট্যাপিওকা চাই না ; কাজে কাজেই আমাদের মিষ্ট কাসাভার (মাণিহোৎ আইপির) উপরেই নির্ভর করা উচিত। শিবপুর-গবর্ণমেণ্ট-কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্রে আমি এই জাতীয় কাসাভাই লাগাইয়াছি।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই গাছ এখন দেখিতে পাওয়া যায়। আসামে ইহার নাম হিমুল (অর্থাৎ সিমুল) আলু। এই গাছের পাতা দেখিতে ঠিক সিমুল তুলার গাছের পাতার ন্যায় বলিয়া ইহাকে 'সিমুল-আলু' গাছ বলা যাইতে পারে। 'গাছ-আলু' ও 'রুটী-আলু' নামে এই গাছ স্থানবিশেষে আখ্যাত। পোর্ত্তুগীজেরা আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে প্রথমে এই গাছ রোপণ করে। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এ গাছের কোন ব্যবহার প্রচলিত নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে, কটকে, ব্রহ্মদেশে ও আসাম প্রদেশে সিমুল-আলুর মূল কাঁচা, সিদ্ধ বা রন্ধন করা অবস্থায় ভক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের কোন স্থানেই মূল হইতে ময়দা প্রস্তুতপ্রণালী প্রচলিত নাই।

উদ্যানের জন্য একটি শোভমান গাছ বলিয়া কলিকাতার কোন কোন উদ্যানে ইহা যত্নে রক্ষিত হয়, দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কাসাভা গাছের মূল আস্বাদন করিয়া আপনারা দেখিতে পারেন, ইহারা কোন্ জাতীয় কাসাভা, তিক্ত জাতীয় বা মিষ্ট জাতীয়।

গত চৈত্র মাসে আমি কিরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ট্যাপিওকা, ট্যাপিওকা মীল (বা ব্রেজিলিয়ন্ এরারুট) এবং কাসাভা-ময়দা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহা এখন বর্ণনা করিব। ইহাতে যে সকল মূল ব্যবহার করি, সে গুলি সমস্ত এক বৎসরের গাছের নিম্ন হইতে খুঁড়িয়া বাহির করি। সর্ব্বসমেত নয়টি গাছের মূল ব্যবহার করি। গাছের পাতাগুলি ও মূলের মোটা মোটা ছালগুলি গরুতে আগ্রহ সহকারে খায়। ডালপালাগুলি সমস্তই কলম করিয়া শিবপুর কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে লাগাইয়া দিয়াছি। গাছ নয়টির কোন অংশই অপচয় হয় নাই। ডাল-পালাগুলি যদি সমস্ত কলম করিবার জন্য ব্যবহার না হয়, উহাদের শুকাইয়া অনায়াসে জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। এক কাসাভার আবাদ হইতে গরু ও মানুষের আহার এবং জ্বালানী কাষ্ঠ, এই সমস্তই উৎপন্ন হইতে পারে।

এক্ষণে ময়দা প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রক্রিয়া বর্ণনা করা যাউক। মূলগুলি খুঁড়িয়া বাহির করিয়া, উহাদের উপরিভাগের মৃত্তিকা ও পাতলা ছাড়া-ছাড়া ত্বকের ন্যায় পদার্থ, জলে ধৌত করিয়া ফেলা হয়। পরে ৬।৭ ঘণ্টা কাল মূলগুলি এক গামলা জলের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে জলের মধ্যে মূলগুলি ডুবাইয়া রাখাতে উহাদের উপরিভাগের মোটা ছাল আলগা হইয়া আইসে এবং ছুরিকা দ্বারা হাঁসাইয়া দিলে অনায়াসেই ছাল অঙ্গুলি দ্বারা খুলিয়া লওয়া যায়। একে একে মূলগুলি জল হইতে বাহির করিয়া উহাদের ছাল খুলিয়া ফেলিয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া উহাদের অন্য আর এক গামলা পরিষ্কার জলে রাখা হয়। এই জলে খণ্ড গুলি এক ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে ঢেঁকিতে কুটিয়া লইয়া উহাদের মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। মণ্ডের তাল শক্ত কাপড়ে বাঁধিয়া চাপের নিম্নে রাখা হয়। চাপ দিবার জন্য আমি 'চিজ-প্রেস' নামক পনির প্রস্তুতের একটি যন্ত্র ব্যবহার করি। মূলের খণ্ড গুলিকে জলে এক ঘণ্টা কাল ডুবাইয়া রাখা এবং মণ্ড হইতে চাপ দিয়া রস বাহির করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, মিষ্ট কাসাভাতেও প্রুসিক এসিড নামক বিষের অতি সামান্য পরিমাণ থাকা সম্ভব। এই পরিমাণ বিষের দ্বারা মূল কাঁচা অবস্থায় আহার করিলেও কিছু ক্ষতি হয় না; কিন্তু মিষ্ট কাসাভা কাঁচা চিবাইয়া খাইলে জিহ্বা কেমন একটু সামান্য "রি রি" করে। খণ্ডগুলি জলে ধৌত করিলে এবং মণ্ড চাপিয়া লইলে এই সামান্য মন্দ আস্বাদটি ময়দাতে পাওয়া যায় না।

ট্যাপিওকা মীল বা ব্রেজিলিয়ান এরারুট প্রস্তুত করিতে হইলে, মণ্ডটি মোটা কাপড়ে রাখিয়া এক গামলা পরিষ্কার জলের মধ্যে কাপড় শুদ্ধ মণ্ড কিঞ্চিৎ ডুবাইয়া দিয়া নাড়িতে হয়। মণ্ডটি নাড়িতে নাড়িতে দেখা যাইবে, উহা হইতে শ্বেতসার (Starch) নির্গত হইয়া জলের নিম্নে স্তরে স্তরে বসিতেছে। মূলের মধ্যে যে পদার্থ থাকিবার কারণ মিষ্ট কাসাভা খাইলে সামান্য ভাবে জিহ্বা "রি রি" করে, সেই পদার্থ এই গামলার জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া আরও হ্রাস হয়। এক ঘণ্টা এইরূপ নাড়িবার পরে কাপড় শুদ্ধ মণ্ডটী আর এক গামলা পরিষ্কার জলে কিছু ডুবাইয়া দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর ৫,৭ মিনিট নাড়িতে হইবে। এই দুই গামলার জল গামলা দুইটী কাত করিয়া ফেলিয়া দিয়া নিম্নস্থ শ্বেতসার সংগ্রহ করিতে হয়। শ্বেতসার ভারি পদার্থ বলিয়া গামলার নিম্নে জমাট হইয়া বসিয়া থাকে এবং ইহা সহজেই রৌদ্রে শুকাইয়া উঠাইয়া লওয়া যায়। গামলার তলদেশ রৌদ্রে দিবার পূর্ব্বে পরিষ্কার জল ছিটাইয়া দিয়া গামলা কাত করিয়া ঐ জল বাহির করিয়া দিয়া শ্বেতসার আরও পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। গামলার নিম্নভাগের শ্বেত পদার্থ রৌদ্রে শুকাইয়া গেলেই ট্যাপিওকা মীল বা ব্রেজিলিয়ান এরারুট প্রস্তুত শেষ হইয়া গেল। ঐ শুষ্ক শ্বেত পদার্থ যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, স্পর্শ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা ঠিক এরারুট। ইহাই লণ্ডনে জেমেকা এরারুট বা ব্রেজিলিয়ান এরারুট নামে বিখ্যাত। মূল খুঁড়িয়া বাহির করা হইতে, এই এরারুট প্রস্তুত ও কাসাভা ময়দা প্রস্তুত, সমস্তই এক দিবসের মধ্যে হওয়া উচিত; নতুবা ময়দাতে ও এরারুটে একটু গন্ধ হয়। যদি সন্ধ্যার সময় মূলগুলি উঠাইয়া উপর উপর ধুইয়া লইয়া রাত্রি নয়টা হইতে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত উহাদের জলে ডুবাইয়া রাখা হয়, বেলা আটটার মধ্যে মোটা ছাল খুলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে ফেলা হয়, বেলা নয়টার সময় জল হইতে উঠাইয়া টুকরাগুলি ১০টার মধ্যে ঢেঁকিতে কুটিয়া মণ্ড করিয়া ফেলা হয়, এবং বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে যদি শ্বেতসার বাহির করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে

শ্বেতসার ও মণ্ডের অবশিষ্ট ভাগ রৌদ্রে শুকাইয়া লইবার জন্য সমস্ত অপরাহ্ন কাল পাওয়া যাইবে। এ সকল কার্য্য, বৎসরের মধ্যে যে কালটী সর্ব্বাপেক্ষা শুষ্ক কাল, সেই কালেই (অর্থাৎ ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত) হওয়া কর্ত্তব্য। এই কালে বেলা দুই প্রহর হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে শ্বেতসার এবং চাপ দিয়া অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া মণ্ডের অবশিষ্ট ভাগ, অনায়াসে রৌদ্রে বিচাইয়া দিয়া শুকাইয়া লওয়া যায়।

কাসাভা-ময়দা মণ্ডের অবশিষ্ট ভাগ হইতে প্রস্তুত করা হয়। শুষ্ক হইয়া গেলে, এই পদার্থটী অনায়াসে যাঁতায় পিসিয়া পরে চালুনী দ্বারা সূক্ষ্ম অংশ পৃথক করিয়া লওয়া যায়। এই সূক্ষ্ম অংশই কাসাভা-ময়দা, যাহা আপনারা দেখিতে পাইবেন। ইহা কেমন পরিষ্কার, খাইতে কেমন সুমিষ্ট। চারি মাস ধরিয়া ইহা টিনের কৌটার মধ্যে পুরিয়া রাখিলেও তথাপি ইহাতে জটা ধরে নাই।

ট্যাপিওকা প্রস্তুত করিতে শ্বেতসারকে শুকাইয়া না লইয়া সিক্ত অবস্থাতেই উহাকে পিত্তলের কটাহে তুলিয়া লইয়া, ঢিমে আগুনের উপর ঐ কটাহ বসাইয়া পিত্তলের একটী খুন্তি দ্বারা ক্রমাগত নাড়িয়া নাড়িয়া, শ্বেতসারটি যখন দেখিতে ট্যাপিওকার মত হইবে, তখন উহা নামাইয়া রৌদ্রে ভাল করিয়া শুকাইয়া লইবে। এই ট্যাপিওকা যাহা এইরূপে প্রস্তুত হইল, তাহা বাজারের ট্যাপিওকা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট হইবে না।

আপনারা বোধ হয় জানিতে ইচ্ছা করেন, নয়টি গাছ হইতে ঠিক কি পরিমাণ কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হয়? আমি নয়টি গাছ হইতে ঠিক ১০১ সের মূল পাই। উহা হইতে পৌনে ৭৫ সের চাপ দেওয়া মণ্ড পাই। ইহা হইতে প্রায় সাড়ে ১৬ সের কাসাভা-ময়দা, পৌনে ৩ সের জামেকা এরারুট এবং প্রায় সওয়া ৩ সের ট্যাপিওকা, অর্থাৎ পৌনে ২৩ সের নিট শুষ্ক খাদ্য প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত, সাড়ে তিপান্ন সের গরুর আহারের উপযুক্ত পত্র ও নবপল্লব এবং ৯৩৭টি কলম (যাহা শিবপুর-কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে লাগান হইয়াছে) এই দুইটি সামগ্রীও ধরিতে হয়।

৫ ফিট অন্তর একটি করিয়া কলম লাগাইলে এক একার জমিতে ন্যূনাধিক ১৭০০ গাছ জন্মিবে। গত চৈত্রে নয়টি গাছ হইতে যে ফল পাইয়াছি, বড় আবাদের ফল যদি সেই অনুপাতে ফলে, তাহা হইলে আমাদের উচিত এক একার হইতে $\left\{\frac{১৭০০\times১০১}{৯\times৪০}\right\}$ ৪৫০ মণেরও অধিক কাঁচা বা সিদ্ধ করিয়া খাওয়ার উপযুক্ত মূল, এবং $\left\{\frac{১৭০০\times২২৮}{৯\times৪০}\right\}$ ১০০ মণেরও অধিক ময়দাতে ও এরারুটে পাওয়া। আরও উচিত $\left\{\frac{১৭০০\times৫৩॥}{৯\times৪০}\right\}$ ২৪০ মণেরও অধিক গরুর খাওয়ার উপযুক্ত কাঁচা পাতা পাওয়া। যদি স্মরণ করিয়া দেখেন, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে গরুর খাওয়ার উপযুক্ত কাঁচা ঘাস-পাতা পাওয়া কত দুরূহ, এবং একার প্রতি ২৪০ মণ কাঁচা আহার এই কয় মাসের মধ্যে আলগা লাভ ভাবেই পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনাদের সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে—কাসাভার চাষ বিশেষ লাভজনক। এই কাঁচা আহারের মূল্য যদি মণ প্রতি ৵০ আনা ধরা যায়, তাহা হইলে এক একারের কাঁচা পাতার মূল্য ৩০৲ টাকা হয়। কলম বা জ্বালানী কাষ্ঠ এ চাষের আর একটি আল্‌গা লাভ। আমি ৯৩৭টি কলমই ব্যবহার করিয়াছি। ঐ গুলি শুকাইলে কি ওজনের জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া যাইত, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে উহারা শুকাইলে যে অন্ততঃ এক মণ হইত, ইহা আমার বিশ্বাস। নয়টি গাছ হইতে যদি এক মণ জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তবে ১৭০০ গাছ হইতে ১৭৫ বা ২০০ মণ পাওয়া যাইতে পারে। স্থান-বিশেষে ইহারই দাম ৫০৲ টাকা।

কলিকাতার বাজারে ট্যাপিওকার দাম ।৵০ সের। লণ্ডনের বাজারে গত মাসে ট্যাপিওকার দাম পাউণ্ড প্রতি এক পাঁচের-আট পেনি ছিল। স্পেনবাসীরা কাসাভার ময়দা ব্যবহার করিয়া থাকে শুনিয়াছি; কিন্তু এই সামগ্রী কি দরে বিক্রয় হয়, বলিতে পারি না। ট্যাপিওকা, কাসাভা-ময়দা ও জ্যামেকা এরারুট সমস্ত যদি ৵০ আনা সেরে বিক্রয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এক একার জমির উৎপন্ন সামগ্রী ন্যূনাধিক ৫০০৲ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে।

[ক্রমশঃ।

ইন্কম্ ট্যাক্স রহস্য।

কলিকাতায় লালদীঘির কোণে বা পুরমিটের পার্শ্বে ইন্কম্ ট্যাক্স আদায় করিবার জন্য সুবৃহৎ অট্টালিকা বাটিতে আফিস আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, এই আফিসের এক কোণে না কি অন্ধকূপ-হত্যার গহ্বর অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই আফিসে স্কুলের মত ক্ল্যাস আছে। তাহার প্রথমটিতে কালেক্টর সাহেব থাকেন; ইনি খাস বিলাতী ইংরাজ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ডেপুটি কলেক্টার আছেন, ইনি বাঙ্গালী। ইহা ব্যতীত পুলিসের পাহারাওয়ালার মত কলিকাতা সহরটা ঘাটি বিলি করিয়া, এক এক ঘাটি আগলাইয়া এক এক জন এসেসর প্রভু আছেন। ইহারা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের মোটা-বেতনভোগী। ট্যাক্স আদায় বিষয়ে ইহাদের যত্ন অসীম। ইহারা অসংযত অন্যায় কথা অতি তীব্রতার সহিত মহাজনদিগকে বলিয়া থাকেন; মনে ভাবেন, আমরা এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাব সিরাজউদ্দৌলা। এদেশীয় মহাজনেরা তাঁহাদের নিকট বর্ব্বরের জাতি বলিয়া বিবেচিত। মূর্খ ত বটেই! নচেৎ এদেশীয় এক এক জন মহাজনের এত বিষয় আছে যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ঐরূপ এসেসর বাটীর চাকর রাখিতে পারেন; কিন্তু তাহা করেন না। কেন না, মহাজন চিরকালই মহাজন, অহঙ্কার করিতে ইহারা জানেন না; অত্যাচার সহ্য করাই ইহাদের ধর্ম্ম। এসেসরেরা টাকা আদায় করিবার জন্য যেমন অবিশ্বাস এবং কটু কথার দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন, মহাজনের দোকানে তাহা নাই। তাঁহাদের মাল লইয়া অনেক সময় গ্রাহক ফেল হইয়া যায়, টাকা পান না। মহাজনের নিকটে দাঁড়াও, শান্তি আসিবে; এসেসরের নিকটে দাঁড়াও, তাঁহার কথা শুনিলে মনের বমি হইবে। ইহারা সব জানেন, সব বুঝেন, অথচ কিছুই জানেন না, কিছুই বুঝেন না। মহাজনের খাতার সত্যতা এদেশীয় কোন আদালতে কোন জজ বাহাদুর এ পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই; কিন্তু এই এসেসর মহাশয়েরা অবাধে খাতার সত্যতা দেখিয়াও বলিয়া থাকেন, “আমি বিশ্বাস করি না। তোমরা খাতা নকল করিয়া আনিয়াছ।” মহাজনের তিন পাতার খাতা নহে, যে তাহা নকল হইবে। উহা একত্র করিলে এক গরুর গাড়ী বোঝাই হয়,—একটা কুলিতে উঠাইতে পারে না। উহা

এসেসরের মত অত বেতনের বা অত দামের চাকর না হইলেও ১৫৲ ২০৲ ৩০৲ টাকা দামের ২।৪ জন চাকর প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া, তবে উহা প্রস্তত করে। সুতরাং উহা নকল করিতে গেলে ঐ লোকগুলি চাই, উহাদের বেতন চাই। ইহাতে খরচ বেশী, না তুমি যে ইনকম টেক্স ৩৩০৲ টাকা ধরিয়াছ, তাহা বেশী? বল বল, তুমিই বল কোন পথটা সুবিধাজনক? আমরা টাকাও দিই, অথচ এসেসরের দুর্ব্বাক্য দ্বারা মনে আঘাত পাই। এই এসেসর নিযুক্ত করিবার সময় ইহাদের স্বভাবের পরীক্ষা হওয়া উচিত কি না, অথবা মহাজন পক্ষ হইতে ভোট লইয়া ইহাদের নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য কি না? দয়াময় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ইহা বিবেচনাপূর্ব্বক যাহাতে মহাজনের ভোট লইয়া এসেসর বাহাল হয়, তাহা করিবেন। এদেশীয় মহাজনদিগকে বিশ্বাস করুন, কোন মহাজনের খাতা অবিশ্বাস করিবেন না। এসেসরের অগোচরে এদেশে এমন অনেক ইন্কম্টেক্স দিবার উপযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাহাও মহাজনের খাতা হইতেই পাইতে পারিবেন। ইহা এসেসরেরা বুঝিবেন কি? অবিশ্বাস করিলে পিতার মীমাংসা হয় না। মহাজন বিশ্বাসের দাস! এসেসরেরা জ্ঞানী, কাজেই তাঁহারা মহাজন পক্ষে এই সকল বীভৎস রসের কথা বলিয়া থাকেন। আপনার দোকান চুণখাম করা হইল, তাহাও সাধ করিয়া নহে, প্লেগের গুঁতায়—মিউনিসিপালিটীর জ্বালায়! কিন্তু এই এসেসর মহাশয়েরা অনুমান করিলেন, ইহার এ বৎসর কিছু বেশী লাভ হইয়াছে, দাও ইহাকে ফাষ্ট ক্ল্যাসে উঠাইয়া। বস্তুতঃ এইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই এসেসরগণ আফিস হইতে একটা টাকা ধরিয়া নোটীশ দিয়া থাকেন। সেই রেজেষ্ট্রী পত্রে বলা হয়, “এত দিনের মধ্যে খাতা তৈয়ারী করিয়া দেখাইবে, অথবা এই টাকা জমা দিবে।” তাহার পর দরখাস্ত করিলে দিন স্থির করিয়া পোষ্টকার্ডে উত্তর আসিল, “অমুক দিনে খাতা আনিও, দেখিব।”

আফিসে খাতা দেখিবার মুহুরী আছেন। ইহারা খাতা-পত্রও বেশ বুঝেন। প্রথমে “খরিদ ও বিক্রয়” দেখেন, তাহার লাভ ধরেন, তাহার পর টাকার সুদ ইচ্ছামত ধরেন। যে নামে ফারম আছে, সেই নামের উপাধিযুক্ত সকলকেই ফারমের অংশী বলিয়া ধরা হয়। মনে করুন,—ফারমের নাম “অমুক দাঁ বা দত্ত।” এখন খাতার মধ্যে যত দাঁ ও দত্ত উপাধিযুক্ত নাম আছে, তাঁহারা বাহিরের অন্য লোক হইলেও, যথার্থতঃ তাঁহাদের সুদ ফারম হইতে বাহির হইয়া গেলেও, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে; ইহাদের ধারণা,

উহা ফারমেরই বেনামী টাকা। বাজে খরচ ইহারা কিছুই ধরেন না। এদেশী আড়তদারী কাজ এইরূপ যে, মফস্বলে যত ব্যাপারী থাকেন, তাঁহারা সময় সময় কলিকাতায় আসিলে অথবা দেশের গ্রাহক মাল লইলে তাঁহাদিগকে থাকিবার স্থান এবং আহার্য্য দিতে হয়। তুমি না দাও, অপর মহাজন ইহা দিবে। তোমার গ্রাহক থাকিবে না, দোকানে লাভ হইবে না। অতএব এ জন্য স্বতন্ত্র বাটী ভাড়া এবং পাচক ব্রাহ্মণ বার মাস রাখিতে হয়; উহাদের বেতন, ঘরভাড়া এবং আহারের খরচ সব ফারম হইতে দিতে হয়। কিন্তু উহা ইন্‌কম টেক্স আফিসে ধরিয়া পাওয়া যায় না, অথবা যাহা পাওয়া যায়, তাহা তাঁহাদের ইচ্ছা ও অনুগ্রহমূলক। ফারমে অপরাপর যত জন লোক থাকে, তাহাদের বেতন, দোকান ঘর ও গুদাম ভাড়া ভিন্ন আর কিছুই ধরা হয় না। অনেক ফারমে বৎসর ১৫০৲, ২০০৲ শত টাকার কাগজ খাতা ইত্যাদির জন্য লাগে, কিন্তু তাহা ধরা হয় না। লাভের প্রতি টাকায় ইংরাজী পাঁচ পাই হিসাবে ইন্‌কম্ ট্যাক্স লওয়া হয়।

সে বৎসর আমরা খাতা দেখাইতে উক্ত আফিসে গিয়াছি। সে দিন বড় ভিড়, বাহিরে বসিয়া আছি; আমরা ফার্ষ্ট ক্ল্যাসের ছেলে। উপরে আমাদের ক্ল্যাস। তথায় একখানি টানাপাখা, একখানি বড় টেবিল দেওয়া আছে। লাষ্ট ক্ল্যাসে কিন্তু ঐ খাতিরটুকু নাই। তথায় ফোড়েরা পড়ে কি না! যাহা হউক, আমার পার্শ্বেই এক কাপড়-ব্যবসায়ী হিন্দুস্থানী পরিচিত মহাজনকে দেখিয়া ট্যাক্সের প্রসঙ্গ উথাপিত করায় তিনি বলিলেন—"এক বৎসর আমার দোকান-খরচ, সুদ, ভাড়া, মাহিনা এবং বাজে খরচ ধরিয়া ৬ হাজার টাকা হয়, কিন্তু সে বৎসর আমার সূতা ও কাপড়ের কাজে ১৬ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছিল। প্রভুরা হিসাব করিয়া খরচ বাদসাদ দিয়াও কিছুতেই আর আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিলেন না। কাজেই সেবার তাঁহাদিগকে লিখিতে হইল, "ক্ষতি হইয়াছে।" অতঃপর সেই কাগজ এই সাহেবের ঘরে আসিল; তখন আমাকে সাহেব ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি প্রতি বৎসর যে ৩ শত টাকা ইন্‌কম্ ট্যাক্স দাও, এবার তোমার তাহা লাগিবে না। এবার তোমার ক্ষতি হইয়াছে, অতএব একটা রফা কর। তোমাকে প্রতি বৎসর খাতা দেখাইতে হয়। এক কাজ কর, এবৎসর তোমার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া ৩ শত টাকার স্থলে না হয় দুই শত টাকা দিও এবং ৩ বৎসর তোমার যতই লাভ হউক, ঐ দুই শত টাকার হিসাবে তুমি তিন বৎসর জমা দিবে, এবং তিন বৎসর আর তোমাকে খাতা দেখাইতে হইবে না।" সাহেবের কথায় আমি স্বীকৃত হইলাম না। শেষে ঐ সাহেব ১৫০ টাকা ধরিলেন। আমি টাকা জমা দিয়া, রেভিনিউ বোর্ডে আপীল করিলাম। রেভিনিউ বোর্ডে ৯ মাসের পর সুবিচার এই হইল যে, কালেক্টার সাহেব যাহা ধার্য্য করিয়াছেন, তাহাই ঠিক। সেকালের কাজীর বিচার হিন্দুর নিকট যেমন ঘৃণার বিষয় ছিল, এই সুসভ্য ইংরাজরাজ্যে ইন্‌কম্ ট্যাক্সের বিচার তাহা অপেক্ষা ঘৃণার্হ হইয়া উঠিয়াছে।"

তাহার পর আমাদের পক্ষেও ঐ বিচার হইল। কালেক্টার বাহাদুরের ঐ বাঁধি গৎ। ফারমে ক্ষতি হইলে ঠিক ঐ কথাগুলিই বলিয়া তিনি টাকা আদায় করেন। তখন আর খাতার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, তখন চাই টাকা আর টাকা! রেভিনিউ বোর্ড কালেক্টার সাহেবের পোঁ ধরা যন্ত্র; কালেক্টার সাহেব বাহাদুর যাহা করেন, তাহার বড় এদিক ওদিক হয় না। এইরূপ শত শত মহাজনের পক্ষে ক্ষতির বেলায় এই বিচার হইতেছে। আবশ্যক হইলে তাঁহাদের সকলকেই উপস্থিত করাইয়া সাক্ষ্য দেওয়াইতে পারি।

যাঁহাদের খাতার ঠিক নাই, অথবা পলাইবার উপায় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যাহা হউক, ক্ষতি নাই। কিন্তু যে সকল বাঙ্গালী মহাজনের খাতায় প্রতি বৎসর রেওয়া করিয়া সুন্দর ভাবে ঠিক হিসাব দেখান হয়, তাঁহাদের পক্ষে অন্যায় বিচার হয় কেন? এই জন্য হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালীদের বোকা বলে। তাঁহাদের মত এই যে, দোকানে ক্ষতি হইলেই পর বৎসর সে দোকানের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। নামের সঙ্গেই ত এসেসরদিগের এবং ইন্‌কম্ আফিসের সম্বন্ধ। উহা না পাইলে, "ভাগ" গিয়া বলিলে, আর কাহাকে ধরিবে? প্রতি বৎসর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দোকান করিলে লাভ হইলেও আয়কর লয় কে? ইহা ধরা পড়ে কি? বাঙ্গালী মহাজনেরা এরূপ করিতে পারেন না, নামের সঙ্গেই ইহাদের প্রসার-প্রতিপত্তি। গ্রাহকের নিকট টাকা বাকী থাকে, নামের বলেই তাহা আদায় হয় এবং শরিকানেরা নামের মাহাত্ম্যেই সুস্থ থাকে। নচেৎ অনেক আপত্তি হয়, কাজেই দেশের পুলিসের অত্যাচার, রেলের অত্যাচার, মিউনিসিপালিটীর অত্যাচার, বসন্ত রোগের অত্যাচার, কলেরার অত্যাচার ও প্লেগের অত্যাচারের সঙ্গে ইন্‌কম্ ট্যাক্‌সের অত্যাচারও সহ্য করিতে হয়!

জিজ্ঞাসা করি, খাতা দেখিয়া যথার্থ ক্ষতি হইয়াছে, ইহা কালেক্টার সাহেব বুঝিয়াও তবু টাকা চান কেন? যদি তাঁহার ইচ্ছাই আইন হয়, তবে কেন খাতা দেখা হয়? কেন মহাজনের পবিত্র খাতার অবমাননা করা হয়? কেন এ ধর্ম্মের ঢাক বাজাইয়া, তৎসঙ্গে জোর করিয়া টাকা লওয়া হয়? যে বৎসর লাভ হয়, সে বৎসর মহাজনেরা কোন কথা বলেন না, হাসিতে হাসিতে টাকা দিয়া আইসেন। কিন্তু লোকসানের বৎসর ‘মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা’ মারা হয় কেন? গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে দয়া করিয়া তদন্ত করিবেন কি?

বিগত ৩ বৎসর ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স্ হইতে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের কত আয় হইয়াছে, প্রথমে তাহা দেখুন,—

সাল	কলিকাতা	বঙ্গের অন্যত্র	মোট।
১৮৯৯	২২৪২৯০৭৲	২২৯৪৪৩৫৲	৪৫৩৭৩৪২৲
১৯০০	২২৩৫১০৫৲	২৩৫০৫৫৮৲	৪৫৮৫৬৬৩৲
১৯০১	২৪৯৪৯৪৫৲	২৪৩৮৮৬৩৲	৪৯৩৩৮০৮৲

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, এক কলিকাতা ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স্ যাহা দেয়, বঙ্গের অন্যত্র একত্র প্রায় উহা উঠে। এদিকে প্রতি বৎসর ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স্ আদায় পক্ষে শ্রীবৃদ্ধি। যে দেশের লোক দুই বেলা অনেকে খাইতে পায় না, সেই দেশের আয় এসেসর প্রভুদের গুণে প্রতি বৎসর বাড়িতেছে। চিনি, নীল প্রভৃতির কাজগুলি ত উঠিয়া যাইবার মত হইয়াছে। জাহাজী কাজগুলি মাত্রই জুয়াখেলার মত; হয় ত এক ঢেউ আসিলে মহাজন ২।৪ হাজার টাকা লাভ পাইল, আবার এক ঢেউ আসিল, তাহাতে মহাজনের ৫।৬ হাজার টাকা ক্ষতি হইল। জাহাজী দ্রব্যের লাভ হইবার সময় বড় জোর মণকরা ।০ আনা ।৵০ আনা হয়। বাজার পড়িয়া গেলে, মণকরা ২।১ টাকা উড়িয়া যায়। এই বৎসর যে চিনির মণ ৬৲ টাকা ছিল, তাহাই ৪।।০ টাকা হইয়াছিল। যে ঘৃতের দর ৪৪।৪৫৲ টাকা মণ ছিল, তাহাই ৩০।৩২৲ টাকা হইয়াছে। বলুন দেখি, মহাজনের গুদামে যে মাল মজুত থাকে, তাহাতে কত ক্ষতি হয়? গুদামে মাল থাকে কেন, ইহা বলা চলে না। কারণ দোকানে মাল থাকাই চাই। মালশূন্য দোকান হয় না। এসেসর প্রভুরা এইরূপ সমুদয় দ্রব্যের বাজার বুঝিয়া ইন্‌কম্ ধরিলে, কখনই এদেশে প্রতি বৎসর ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স্ বাড়িবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, প্রতি বৎসর যে টাকা ইন্‌কম্ আদায় হয়, তাহা কি কেবল ব্যবসায়ীরাই দিয়া থাকেন? কাহারা কত ইন্‌কম্ দিয়া থাকেন, তাহারও একটা হিসাব দেখুন,—

কোন্ শ্রেণী হইতে।	সন ১৮৯৯	সন ১৯০০	সন ১৯০১
গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ও পেন্সনভোগী হইতে।	৬৪৪২০৮৲	৬৭১৯৮৭৲	৭২১২৫৬৲
কোম্পানী যুক্ত আফিস এবং মহাজন ও ব্যবসায়ী।	৪৮৩৫৭৬৲	৪৩২০৭৭৲	৫৫৭৬৪৪৲
যাঁহাদের কোম্পানীর কাগজ ও বাটীর আয় আছে।	৭৫৯১২৲	৭৪৭৪৪৲	৭৩৮১৭৲
সর্ব্বসাধারণ লোক	৩৩৩৩৬৪৬৲	৩৪০৬৮৫৫৲	৩৫৮১০৯১৲
মোট—	৪৫৩৭৩৪২৲	৪৫৮৫৬৬৩৲	৪৯৩৩৮০৮৲

ইহাদের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী ও পেন্‌সন্‌ভোগীর টাকা—গবর্ণমেণ্টের তহবিলেরই টাকা, উহা তিনিই দেন মনে হয়; উহা যে অত্যাচার করিয়া আদায় হয়, ইহা কেহই মনে করিবেন না। তৎপরে কোম্পানী কাগজের বাজারের দর কম বেশী হয়, বাটীর ভাড়াটিয়া না থাকিলে উহা শূন্য থাকে, ব্যবসায়ীর লাভ-লোকসান আছেই; অতএব এই তিন শ্রেণীর প্রতিই অত্যাচার হইয়া থাকে, এবং এই তিন শ্রেণী হইতেই টাকা বেশী উঠে।

কলিকাতার ছোট আদালত ও ৩৯ ধারা।

বোধ হয় অনেক মহাজনই অবগত আছেন যে, এক হাজার বা ততোধিক দাবীর নালিস কলিকাতার ছোট আদালতে রুজু করিলে আসামী ইচ্ছা করিলে ৩৯ ধারা অনুসারে হাইকোর্টে transfer করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। অতএব যেখানে আসামী অযথা সময় লইয়া ফরিয়াদীকে হায়রাণ বা কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন, অথবা আপনার স্থাবর সম্পত্তি সকল হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করেন, সেই খানই এই ধারা অবলম্বন করিয়া হাইকোর্টে এক

তরফা দরখাস্ত করতঃ মোকর্দ্দমা হাইকোর্টে transfer করাইয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে ভাল বিচার অভিপ্রায়েও প্রতিবাদী মোকর্দ্দমা হাইকোর্টে লইয়া গিয়া থাকে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বাদীকে কষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে বা অযথা সময় লইবার অভিপ্রায়ে প্রতিবাদী এই ধারার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এই ধারা অনুসারে মহাজন সম্প্রদায় সময় সময় অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকেন। মনে করুন, আপনি পলাতক এক আসামীর নামে ১০০০ টাকা বা ততোধিক দাবী দিয়া কলিকাতা ছোট আদালতে নালিস রুজু করিলেন। আসামী ৩৯ ধারা অনুসারে হাইকোর্টে একতরফা দরখাস্ত করিয়া ঐ মোকর্দ্দমাটি হাইকোর্টে transfer করাইয়া লইল। তখন ছোট আদালতের খরচ ত হইল; আবার হাইকোর্টের জন্য আপনাকে নূতন খরচ ও নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইল এবং হাইকোর্টের দুই তরফা মোকর্দ্দমার শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় মোকর্দ্দমাটি প্রায় ২।১ বৎসরের মত মুলতুবী হইতে চলিল। কাজেই বাধ্য হইয়া আপনাকে আসামীর নিকট যৎকিঞ্চিৎ লইয়া বা সময়ে সময়ে না লইয়াও মোকর্দ্দমাটী আপোষ করিয়া লইতে হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আপোষ হইলে এই মোকর্দ্দমাটী পুনর্ব্বার ছোট আদালতে ফেরত লইয়া যাইতে পারিলে অর্দ্ধেক খরচ আপোষে পাওয়া যাইত। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে, একবার মোকর্দ্দমাটী হাইকোর্টে যাইলে, আর ছোট আদালতে ফেরত আসিতে পারে না; সুতরাং অর্দ্ধেক খরচ আর ফেরত পাওয়া যাইবে না। দেখুন, ইহাতে ফরিয়াদীর কেমন সমূহ ক্ষতি হইবে। এক্ষণে যাহাতে এই ধারাটী রদ হয়, তজ্জন্য সকল বণিক বা মহাজন সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ যাহাতে দুই হাজার পর্য্যন্ত টাকার মোকর্দ্দমা কলিকাতা ছোট আদালতে হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু কলিকাতার ছোট আদালতের বিচারপ্রণালী ভাল নহে, ইহা সকলেরই জানা আছে অর্থাৎ এখানে সাক্ষীর জবানবন্দী ও দলিলাদির ফাইল ও লিখিত রায় না থাকায়, সময় সময় যথেচ্ছাচার হইয়া থাকে। অতএব এই আদালতে যাহাতে সুবিচার হয় ও ৫০০ শত টাকার উপর মোকর্দ্দমার সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিত থাকে, ও লিখিত রায় হয় এবং কোন পক্ষ ইচ্ছা করিলে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারে, এইরূপ বন্দোবস্ত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। নূতন রুল জারি হওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতা ছোট আদালতের জজদিগের কাজ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। অনেকেই বেলা ১২টা না হইতে হইতেই খাস কামরায় বিশ্রাম করিতে গিয়া থাকেন। অতএব এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতে গেলে জজদিগের কোন বিশেষ অসুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আর প্রত্যেক বেঞ্চে একজন দ্বিভাষী ও একজন পেস্কার আছেন। পেস্কারের কাজ শুদ্ধ ডিক্রী ডিস্‌মিস্ মাত্র লেখা। অতএব যদি তাঁহাকে, জবানবন্দী লিখিতে হয়। তাহা হইলে নূতন লোকেরও প্রয়োজন হইবে না। অতএব রেকর্ড রাখিবার বন্দোবস্ত থাকিলেও গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কোন খরচ না হইয়া আপাততঃ কার্য্য চলিতে পারে এবং হাইকোর্টে আপীলের প্রথা থাকিলে জজ সকল একটু মনোযোগ দিয়া বিচার করিতে বাধ্য হইবেন। আর এক্ষণে আদালতে যে সকল অবিচার ও অত্যাচার চলিতেছে, হাইকোর্টে আপীল থাকিলে ও হাইকোর্ট জজদিগের দৃষ্টি তাহাতে আকৃষ্ট হইলে, কলিকাতা ছোট আদালত শীঘ্রই আদর্শ আদালতের মধ্যে গণ্য হইবে।

শুনা যাইতেছে, ইংরাজী বণিক্-সম্প্রদায় অর্থাৎ Chamber of Commerce এ জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। অতএব দেশীয় বণিক্ সম্প্রদায়ের ইহাতে যোগ দিয়া যাহাতে ইহা কার্য্যে পরিণত হয়, তৎপক্ষে সময় থাকিতে সচেষ্টিত হউন।

লৌহ ব্যবসায়।

আজ কাল লৌহ ও তন্নির্ম্মিত দ্রব্যের ব্যবসায় অতি বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছে এবং উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ইহা স্থির। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম "লৌহ বিনা কোন্ কর্ম্ম হয় সম্পাদন?" এখন সেই পাঠ্যের সার্থকতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি, গমনাগমনের জন্য রেলপথ, জাহাজ প্রভৃতি, বাসগৃহের জন্য কড়ি, বরগা, করোগেট প্রভৃতি, এমন কি চাষের জন্য লাঙ্গল, এবং সামান্য কাঁচিখানি পর্য্যন্ত যখন লৌহের সাপেক্ষতা করে, তখন ইহার প্রয়োজনীয়তা কি, সহজেই তাহা অনুমিত হইবে। রেলওয়ে প্রস্তুত, ষ্টীমারাদি নির্ম্মাণ, বৃহৎ বৃহৎ কল সকলের প্রতিষ্ঠা, খনিজ পদার্থ সকলের আবিষ্কার, বৃহৎ বৃহৎ সেতু ইত্যাদি প্রস্তুত,

এ সকলই আমাদের দেশের নূতন সৃষ্টি এবং এখনও শৈশবাবস্থায় অবস্থিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ক্রমে ইহাদের বৃদ্ধির সহিত লোহার ব্যবসায়ও যে আরও অধিক উন্নতিলাভ করিবে, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এখনই বিদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য এদেশে আমদানী হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে একমাত্র বস্ত্র-ব্যবসায় ভিন্ন আর কোন ব্যবসায়ে এত অধিক মূলধন খাটিতেছে, কি না, সন্দেহ।

লৌহ ও লৌহজাত দ্রব্য প্রধানতঃ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে এদেশে আনীত হইয়া থাকে। ইউরোপের ইংলণ্ড, জর্ম্মণি ও বেলজিয়ম এবং আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ বা যুক্তরাজ্য ইহার প্রধান রপ্তানীকারক। অল্প দিন পূর্ব্বে এই ব্যবসায় ইংলণ্ডের একচেটিয়া ছিল। এখন শেষোক্ত তিনটী দেশ মিলিয়া ইংরাজের এই একচেটিয়া ব্যবসায় প্রায় অর্দ্ধেক খর্ব্ব করিয়া দিয়াছে। জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশ অপেক্ষাকৃত সুলভে চলনসই জিনিস প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে পারিতেছে বলিয়া, তাহারই কাট্‌তি অধিক হইয়াছে ও হইতেছে। বিলাতী দ্রব্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইলেও মূল্য অধিক বলিয়া লোকে লইতে চায় না। একটী সামান্য উদাহরণে ইহা বেশ বুঝা যাইবে। অনেকেরই স্মরণ আছে, বিলাতী ব্রায়ান্ট মেজ কোম্পানীর দেশলাই এদেশে খুব প্রচলিত ছিল; তৎপরে সুইডেন হইতে অপেক্ষাকৃত শস্তা দরের অথচ ব্যবহারোপযোগী দেশলাই আসায়, এখন আর ব্রায়ান্ট মেজের দেশলাই দেখা যায় না বলিলেই হয়। পক্ষান্তরে, জাপান আবার সুইডেনকে বাজার হইতে তাড়াইবার উপক্রম করিয়াছে। যদি জাপানী দেশলাই সকল ঋতুতে ব্যবহারোপযোগী হইত, তাহা হইলে এতদিন সুইডেন হইতে আনীত দেশলাইয়ের এদেশ হইতে তিরোধান করিত। লোহার ব্যবসায়েও ঠিক এই ব্যাপার ঘটিতেছে। জার্ম্মাণি, বেলজিয়ম ও আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লোহার বাজারে ইংলণ্ডকে হটিতে হইতেছে এবং শীঘ্র প্রতিকারের উপায় না করিলে অচিরে এই ব্যবসায় ইংরাজের হাত হইতে শেষোক্ত তিন দেশের লোকের হস্তে যাইবে। ইংরাজের ইহাতে সমূহ ক্ষতি হইতেছে ও হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরাজ স্বাধীন বাণিজ্যের পক্ষপাতী; সুতরাং ক্ষতি সহ্য করিয়াও নিজ অধিকারের মধ্যে বিদেশীয় দ্রব্যের প্রচলন-বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবেন না। অনেকে মনে করেন, ভারতের ক্ষতি ইংরাজ গ্রাহ্য করেন না বলিয়াই অবাধবাণিজ্যজনিত এ দেশের ক্ষতি তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না, নিজের দেশ হইলে তাঁহাদের আচরণ অন্যরূপ হইত; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে যাওয়াতে, ইংরাজের স্বদেশ ইংলণ্ড ভূমিকেও অনেক সময়ে প্রচুর ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে ও হইবে। এরূপ স্থলে ভারত সম্বন্ধে যে তাঁহারা ভিন্নপথ অবলম্বন করিবেন, ইহা আশা করা বৃথা।

লৌহ প্রথমতঃ খনির ভিতর অপরিষ্কৃত অবস্থায় মৃত্তিকাদির সহিত মিশ্রিত থাকে। যেখানে কয়লার খনি আছে, অনেক সময়ে সেই খানেই লোহার খনি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ থাকিলে লোহার খনির কাজের সুবিধা হয় বলিয়া, বোধ হয়, সেই সর্ব্বশক্তিমান, বিধাতা এই ভাবে ইহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের মধ্যস্থলে অনেক কয়লা ও লোহার খনি এইরূপ পাশাপাশি অবস্থায় অবস্থিত আছে। এদেশেও যে লৌহ-খনি নাই, তাহা নহে। এখানেও কয়লার নিকট লোহার খনি পাওয়া গিয়াছে। উদ্যোগ অভাবে সে সকলই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং আমরা আমাদের ব্যবহারের জিনিসের জন্য পর-মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া আছি। কেবলমাত্র এক বরাকর অঞ্চলে কয়লার খনির পার্শ্বেই যে লোহার খনি আছে, বেঙ্গল আয়রণ ও ষ্টীল কোম্পানী (Bengal Iron and Steel Co.) সেই খনিজ ধাতু তুলিয়া উপযুক্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে বরাকর পিগ আয়রণ (Pig Iron) নামে ঢালায়ের লোহা তৈয়ার ও রেলিং, থাম প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিলাতী আমদানী অপেক্ষা অনেক সুলভে বিক্রয় করতঃ লাভবান হইতেছেন। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ এক স্থানেই আকরস্থ ধাতু উত্তোলন করিয়া পরিষ্কার ও ব্যবহারোপযোগী করা হইয়া থাকে; অন্য কোথায়ও হয় বলিয়া জানি না।

(ক্রমশঃ)

ছবি ও খেলা।

প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ বালকদিগের প্রতি দুইটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। (১) তাহাদের স্বাস্থ্য, (২) মনের গতি। স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যকর দ্রব্য তাহারা না খাইতে চাহিলেও কৌশলে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে দিয়া উহা দিতে হয়। অন্য খাবার দ্রব্য না হউক, ছেলেরা ঔষধাদি সহজে খাইতে চাহে না, তাহা নিশ্চিত; উদাহরণ যথা,—আনারসের কচি পাতার রস

কিংবা চূণের জল খাইলে কৃমিরোগ নষ্ট হয়; কিন্তু ইহা বালকেরা সহজে খাইতে চাহে না। এইরূপ ক্ষেত্রে কৌশল আবশ্যক। এই জন্যই ক্রিটীং-সের বন্‌বন্ নামক ঔষধের উৎপত্তি। কুইনিন তিক্ত বলিয়া অনেকে খাইতে চাহে না, এ কারণ ক্যাপস্যুলের সৃষ্টি হইয়াছে। ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপের তুল্য নিরাপদ জোলাপ বোধ হয় জগতে আর নাই; কিন্তু তাহা বালক বলিয়া নহে, অনেকেই উহা খাইতে নারাজ। কাজেই, উহাকে লাইকর পোটাসি দিয়া গলাইয়া উহার সঙ্গে টিংচার কার্ডেমম-কম্পাউণ্ড এবং টীংচার ল্যাভেণ্ডার ও সিরাপ জিঞ্জার মিশ্রিত করিয়া সুগন্ধি সুস্বাদু করিয়া দিবার রীতি আছে। যাহা হউক, ঐরূপ ভাবে বালকদিগের মনের গতির প্রতিও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। তাহারা দৌড়াদৌড়ি করিবে, ইহা যেমন প্রার্থনা, তৎসঙ্গে উহাদের মস্তিষ্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তাকণাও প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। এদেশে দৌড়াদৌড়ি করার প্রথা আছে বটে, কিন্তু উহাদের মস্তিষ্কে চিন্তাকণা প্রবেশ করাইবার প্রথা নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যাহা কিছু উহাদের মস্তিষ্কে আমাদের বঙ্গমাতারা কিছু চিন্তা ঢুকাইয়া দেন, তাহাকে আমরা পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় উল্টা মনে করি। বঙ্গমাতারা ছেলেদের মাথায় চিন্তা তুলিয়া দিবেন বলিয়া "জুজু" "ভয়" ইত্যাদি ভীতিকর কথা দ্বারাই ছেলেকে ভাবাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করেন। ইহা করাকে আমরা ভাল বিবেচনা করি না। দুষ্ট ছেলের সঙ্গে মাতার উচিত, খেলা দ্বারা উহাকে হাসাইয়া, আমোদের সহিত চিন্তাকণা উহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে প্রবেশ করান। আজ একটী সেই রূপ খেলার কথা বলিতেছি।

দুই খানি কালী, দুইখানি দুর্গা, দুইখানি গণেশ এবং দুইখানি লক্ষ্মী মূর্ত্তিযুক্ত আজকালের আর্টষ্টুডিয়োর ছবি বা আপনার অভিরুচি মতে বিলাতী ছবিও লইতে পারেন, কিন্তু মোট কথা এই যে, ৮ খানি ছবি চারি প্রকারের হওয়া চাই, এবং ছবির মাপানুসারে ৪ খানি সরু পিসবোর্ড চাই। তৎপরে প্রত্যেক পিসবোর্ডের এক পৃষ্ঠায় আটা দিয়া এইরূপ ৪ খানি পিসবোর্ডে ৪ খানি ছবি আঁটিয়া দিতে হইবে। আটা শুকাইলে এইবার পিসবোর্ড ৪ খানিকে তাসের মত বা চৌকা কার্ড-সাইজে মাপ করিয়া কাটিয়া ফেল। এইবার কার্ডগুলি সাজাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিনের কানেস্ত্রা বা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্স বা চৌকা কৌটার মত করিতে হইবে। অর্থাৎ ৪ খানি পূর্ব্বোক্ত ছবি আটা কার্ড লইয়া, ছবি সাজান সঙ্গে মিল রাখিয়া, অর্থাৎ যে পিস্‌বোর্ড খানিতে গণেশ মূর্ত্তি আছে, সেইখানি যদি উক্ত কৌটার পাড়ন করা হয়, তাহা হইলে ঐ মূর্ত্তিযুক্ত সমুদয় পাড়নের কৌটায় উহাকে রাখিবে। এইরূপ ঢাকান বা কৌটার দুই পার্শ্ব করিবার জন্য যে ছবির কার্ড যে দিকে রাখিবে, সেই ছবির কার্ডগুলি যেন সেই এক দিকেই থাকে। এইরূপ ভাবে ৪ খানি কার্ড লইয়া একখানি মাটিতে রাখিয়া উহার দুই পার্শ্বে দুই খানি কার্ড দিয়া, উপরের ডালা বা ঢাকনিতে একখানি কার্ড রাখিয়া উহার কোণ এবং চারি ধার সরু কাগজে আটা মাখাইয়া আঁটিয়া দেও। তাহা হইলেই এইরূপ ৪ খানি কার্ডে এক একটী ছোট ছোট বাক্সের মত হইবে। পূর্ব্বোক্ত ৪ খানি পিস্‌বোর্ডে এই প্রকার এক মাপের যতগুলি বাক্স হয়, তাহা করিয়া এই বাক্সগুলি এক স্থানে সাজাইলে, ইহা হইবে যে, এই বাক্সগুলির যে পৃষ্ঠে গণেশমূর্ত্তি আছে, তাহা ঠিক রাখিলেই গণেশমূর্ত্তি ঠিক দেখা যাইবে। এইরূপ যে দিকে কালীমূর্ত্তি আছে, বাক্সগুলি সেই সেই দিক উল্টাইয়া সাজাইয়া দিলে উক্ত কালীমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িবে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌটা বা বাক্সগুলির ঠিক মাপের একটা কাঠের বাক্স করিলে ভাল হয়। উহার মধ্যে এই গুলি সাজাইয়া উল্টা পাল্টা করিয়া দিয়া ঐ সকল ছবির যে আদর্শ ছবি রাখিয়াছ, অর্থাৎ পূর্ব্বে ৮ খানি ছবি ৪ প্রকারের লইতে বলিয়াছি, উহার ৪ খানি আঁটা হইয়াছে, অপর ৪ খানি যাহা নিকটে আছে, সেই ছবি দেখাইয়া, ছেলেদের বলিতে হইবে, এই বাক্সের ছবিগুলি এমন ভাবে গুছাও, যাহা ঠিক এইরূপ এক খানি কালী মাতার ছবি হইবে। সে তখন চেষ্টা করিতে থাকিবে। এ জন্য সে কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে ভাবিবে, এবং ২।১ বার এইরূপ মিলাইলে, তাহার "দেখার" অবস্থাও ভাল হইবে।

এইরূপ ছবির বাক্‌স লণ্ডনে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ইহা তথাকার স্কুলের ছেলে মেয়েদের পারিতোষিক দেওয়া হয়। বোধ হয়, কলিকাতাস্থ পুরাতন চীনাবাজারের খেলানার দোকানে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। এদেশে কেহ এইরূপ বাক্‌স প্রস্তুত করিয়া, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদিগের পরামর্শ লইয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিলে, বোধ হয় ইহার ব্যবসায় চলিতে পারে।

শ্রীঃ—

একখানা কাগজের দুই পৃষ্ঠায় দুই প্রকার ছবি অঙ্কিত আছে, এই কাগজ-

খানি এমন ভাবে ছিঁড়িয়া ফেলুন, যেন উহা ১৬ অংশে বিভক্ত হয়। তৎপরে আপনার পুত্রকে উহার পূর্ব্ববৎ অবস্থায় লইয়া আসিবার জন্য জোড়া দিতে বলুন। তাহা হইলেই সহজে পরীক্ষা হইবে। এই ২ খানি ছবির বিষয় বালকদের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ৪ খানি ছবির খেলাপেক্ষা সরল নয় কি? মঃ বঃ সঃ।

সঙ্কেতে অঙ্ক।

কাগজ কলম কিংবা শ্লেট্ পেনসিল না দিয়া অঙ্ক কষিয়া সকলেই বলিতে পারেন। এইজন্য আমাদের মহাজনী কার্য্য স্কুল বা কালেজের ছেলের পচ্ছন্দ হয় না; কেন না তাঁহারা জানেন সব, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা উচ্চ বলিয়া একটা অঙ্ক কষিতেও উচ্চ সময় বা দীর্ঘ সময় লাগে অর্থাৎ অধিক বিলম্ব হয়। এই শ্রেণীর লোক উচ্চ আফিসে চলিতে পারেন; কিন্তু মহাজনী কাজে ইহারা অচল। কারণ, আমাদের কাজে একজন লোককে সব করিতে হয়, মাল বিক্রয় করিবে, উহার দাম কষিবে, সেই আবার টাকা আদায় করিবে। এইরূপ উপর্য্যুপরি একজনকে জিনিষ বিক্রয় ও সঙ্গে সঙ্গে দাম হিসাব করিয়া লইতে হয়। যে দিন বেশী বিক্রয় হয়, সেই দিন কেবল আমাদের মহাজনী কাজে একজন লোককে এইরূপ সঙ্গে সঙ্গে হিসাব করিতে হয়। নতুবা আমাদের অপেক্ষা মুদীখানার দোকানের যিনি বিক্রেতা, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হিসাব করা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়! অবশ্য উহার সঙ্কেত আছে। সেই সঙ্কেতগুলি মুখস্থ বা মর্ম্মস্থ হইয়া গেলেই এবং কিছুদিন ঐ সকল কাজে লিপ্ত থাকিয়া অভ্যাস করিলে, সবই সহজে হয়। শুভঙ্করীর প্রদর্শিত পথই উহাদের সঙ্কেত। ইহা ভিন্ন কড়ানিয়া, শতকিয়া, গণ্ডাকিয়া, বুড়কিয়া, পোণকিয়া, সেরকিয়া, দশকিয়া এবং নামতায় এই টেবিলগুলি বিশেষভাবে মুখস্থ করিতে হয়।

১০৲ টাকা মণ, অর্দ্ধপোয়ার দাম কত? উত্তরে "দুই পয়সা।" ৯।৵০ নয় টাকা ছয় আনা মণ, অর্দ্ধপোয়ার দাম কত? উত্তরে দুই পয়সার দশ কাগ্ কম, অর্থাৎ নয় গণ্ডা ছয় কাগ। এইরূপ মুখে মুখে অর্দ্ধপোয়ার দাম যাহা হিসাব করে, তাহার সঙ্কেত এই যে, যত টাকা এবং যত আনা মণের দাম হইবে, অর্দ্ধপোয়ার দামে ঐ টাকা গণ্ডায় এবং আনা কাগে পরিণত হইয়া যায়। যেমন এক টাকা এক আনায় এক মণ কোন দ্রব্য হইলে, উহার অর্দ্ধপোয়ার

দাম এক গণ্ডা এক কাগ হইবে। ৮।৵০ মণ হইলে ৮।৵০ কাগে অর্দ্ধপোয়া হইবে। এই অর্দ্ধপোয়ার দাম পাইলেই উহার অর্দ্ধেক এক ছটাক এবং এক ছটাকের অর্দ্ধেক অর্দ্ধ ছটাক বা দুই কাঁচ্চার দাম সহজে পাওয়া যাইবে। অথবা অর্দ্ধপোয়ার দামকে ডবল করিয়া এক পোয়ার দাম সহজে ধরা চলিবে।

ওহে! /২॥০ সের ঘৃত দাও, কত দর পড়িবে? আজ্ঞে ২৯৲ টাকা মণ। /২॥০ সেরে কত দাম দিব? আজ্ঞে ১৸/০ এক টাকা তের আনা। ইহার সঙ্কেত এইরূপ যে, যত টাকা মণ হইবে আড়াই সেরের দামে, তত টাকা আনা হইয়া পড়ে। ১০৲ টাকা মণ /২॥০ সেরের দাম কত বলিলে, উহাকে দশ আনা বলিতে হইবে। আচ্ছা চারি আনা মণ /২॥০ সেরের দাম কত হইবে? এস্থলে একটু বুঝিলেই ইহা বোধ হইবে যে, যখন টাকা আনা হইয়াছে অর্থাৎ যোলভাগের ১ ভাগ হইয়াছে, (ওদিকে মণেরও ১৬ ভাগের এক ভাগ /২॥০ হয়, ১৬ × ২॥০ = ৪০ সেরে /১ মণ।) তখন আনারও ১৬ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ৻১০ কড়া হইবে। মোটামুটী /২॥০ সেরের হিসাব যত টাকা তত আনা, পোণে পাঁচকড়া। চারি আনা মণ /২॥০ সেরের দাম চারি × পাঁচে কুড়ি কড়া = পাঁচগণ্ডা বা ৻৫ এক পয়সা। ১০।৵০ মণ /২॥০, সেরের দাম ॥৵৭॥০ অর্থাৎ দশ আনা দেড় পয়সা বা সাড়ে সাত গণ্ডা হইবে। /২॥০ দাম সহজে পাইলেই /৫ সেরের দাম উহার ডবল করিয়া লইতে হইবে।

ওহে! দশ সের চিনি দাও, কত দর পড়িবে? উত্তরে ৮।৵০ মণ। কত দাম দিব? উত্তরে ২/১০ দুই টাকা ছয় পয়সা বা দেড় আনা দিউন। এস্থলে ইহারা টাকা এবং আনাকে সিকি অর্থাৎ চারি ভাগ মুখামুখী করিয়া ফেলে।

৻৫ এক পয়সা মণ হইলে উহার /১ সেরের দাম ৵০ দুই কাক। /০ এক আনা মণ হইলে /১ সেরের দাম ॥০ দুই কড়া এবং ১৲ টাকা মণ হইলে /১ সেরের দাম ৻৮ আট গণ্ডা হইয়া থাকে। ৮৲ টাকা মণ /১ সেরের দাম ৶/৪ তিন আনা ৪ গণ্ডা। কারণ ৮ × ৮ = ৬৪ গণ্ডা ৶/৪ গণ্ডা।

ওহে, আজ বাঙ্গালা কত তারিখ হইল? উত্তরে, আজ ৬ই হইল। আচ্ছা বল দেখি, বাঙ্গালার ৬ই হইলে ইংরাজী তারিখ আজ ক'উই হইবে? উত্তরে "২২শে হইবে।" কি করিয়া কষিলে? কেন; বাঙ্গালা যত তারিখ, তাহা ধরিয়া তদ্সঙ্গে ১৬ যোগ দিলেই ইংরাজী তারিখ বাহির হয়। ঐরূপ ইংরাজী তারিখের সংখ্যা হইতে ১৬ বাদ দিলেই বাঙ্গালা তারিখ বাহির হয়। মনে কর, ইংরাজী আজ পাঁচ তারিখ, ইহা হইতে কি করিয়া ১৬ বাদ দিবে? কেন,

৩০ দিনে মাস ধরিয়া তাহার সঙ্গে ৫ যোগকর, তাহা হইলে ৩৫ হইবে, এইবার ১৬ বাদ দাও ১৯ থাকিবে, অতএব সেদিন বাঙ্গালা ১৯ শে। কিন্তু এখানে নিম্নলিখিত ইংরাজী শ্লোকটীর প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই।

Thirty days hath September,
April, June and November,
All the rest have thirty-one,
Excepting February alone,
Which has but twenty-eight days clear,
And twenty-nine in each Leap Year.

ইংরাজী এটা কি মাস যাইতেছে? তা'কি জানি, বাঙ্গালা কি মাস বল, তাহা হইলেই ইংরাজী মাস বলিয়া দিব। বাঙ্গালা অগ্রহায়ণ মাস। বেশ কথা। এইবার বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ ক'য় মাস হয় গণনা কর। ৮ মাস হয়। ঐ আটের সঙ্গে ৩ যোগকর, তাহা হইলে কত হইবে? ১১ হইবে। এক্ষণে জানুয়ারী হইতে এগারে পর্য্যন্ত পর পর মাস গণনা কর, তাহা হইলেই নভেম্বর হয়। অতএব এটা ইংরাজী নভেম্বর মাস। এইরূপ ইংরাজী মাস হইতে ৩ বাদ দিলেই বাঙ্গালা মাস বাহির হইবে।

বাঙ্গালা ১৩০৯ সাল, ইহার সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করিলেই ইংরাজী ১৯০২ সাল হইবে। অতএব বাঙ্গালা সন হইতে ইংরাজী সন করিতে গেলে ৫৯৩ সাল যোগ করিতে হয় এবং ইংরাজী সন হইতে বাঙ্গালা সন করিতে গেলে, ৫৯৩ বিয়োগ বা বাদ দিতে হয়। এই সঙ্কেতগুলি সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারিলে ভাল হয়; নচেৎ "মহাজনবন্ধু"কে সঙ্গে রাখিবেন। আগামী বারে "অন্ধদিগের অঙ্ক" শিক্ষার কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

জামালপুরের লৌহ-কারখানা।

ইহা দেখিবার যোগ্য। ভারতে যে কয়েকটি লৌহ-কারখানা আছে, তাহার মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলের যাহা-কিছু কাজ, এই কারখানা হইতেই সমাধা হয়। তজ্জন্যই এখানে নানা প্রকার কল আছে, সকলই আগ্রহোদ্দীপক। যেটী দেখা যায়, সেইটীই আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হয়। এখানে লোহা কচুর ন্যায় অতি সরল ও সহজ উপায়ে কাটা হয়, অল্প আয়াসে লোহা কাগজের ন্যায় টানিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, লোহা গলিত করা হয় এবং উত্তপ্ত অবস্থায় চাপ দিয়া টানিয়া, যে ভাব ইচ্ছা, সেই ভাব লৌহকে ধারণ করান হয়। উপরোক্ত কয়েকটী বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

লোহা গলান—একটী ফার্‌নেস বা বৃহৎ উনান আছে, তাহা দীর্ঘে ৩০ ফিট্ আন্দাজ। ইহার ২৫ ফিট্ ঊর্দ্ধে একটী লৌহ দরজা আছে, এটী প্রায়ই খোলা থাকে। এই দরজার নিকট যাইবার জন্য একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত ব্রিজ বা পোল আছে। এই পোল রেলের উপর সংরক্ষিত, দীর্ঘে প্রায় ২০ ফিট্। ইহাতে উঠিতে হইলে ইষ্টকনির্ম্মিত সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়। যেস্থলে সিঁড়ি আছে, সেটি সমতল ভূমি, এই স্থানটি অবশ্য উচ্চ। ট্রলি করিয়া বরাবর এই সিঁড়ির নিকট কয়লা বা লোহা আনীত হয়, পরে সেই ব্রিজের উপর দিয়া উপরিলিখিত ফার্‌নেসের দরজার নিকট যায়। ফারনেসের নিকটস্থিত ব্রিজের অংশটি লৌহনির্ম্মিত। এই লৌহ পাতটি একটি মাত্র লৌহ শলাকার সহিত কব্জা দ্বারা আটকান আছে, এবং সেই শলাকাটি ঐ পাতটির ঠিক মধ্যে সংরক্ষিত নয়, কাজেই যখন যেদিকে ভারী হয়, সেই দিকেই উঠিয়া পড়ে; কিন্তু এরূপ ভাবে তাহা বসান আছে যে, মানুষের ভারে তাহা নড়ে না। ট্রলি যখন কয়লা বা লোহা বোঝাই হইয়া আসে, তখন তাহা ফারনেসের নিকট যাইলে স্বতঃই উল্টাইয়া পড়ে; কয়লা বা লোহা ভিতরে পড়িয়া যায়।

ফারনেস,—ইহার বিবরণ।—ইহার ভিতর বারণ কোম্পানীর নির্ম্মিত ফায়ার ব্রিক দ্বারা নির্ম্মিত। এরূপ ভাবে গাঁথা, যেন দুইটি Cone বসান আছে, মধ্যভাগটির ব্যাস সর্ব্বাপেক্ষা বড়। প্রায়ই দেশের লোকেরা কাদা দিয়া ভিতরটি লেপিয়া দেয়। এইটী আবার ইষ্টকনির্ম্মিত দেওয়ালের দ্বারা বেষ্টিত, এই উভয় বেষ্টনের মধ্যভাগ সচরাচর বালির দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। এই ফারনেসের যে দরজা আছে, তাহার উপরেও চিমনি আছে। যেখানে ফার্‌নেসের আরম্ভ, সেইখানে একটী ছিদ্র আছে; তাহা ইচ্ছামত বন্ধ করা যায় ও খোলা যায়। এই ছিদ্রের কিছু উপরে, কিন্তু পূর্ব্বলিখিত ছিদ্রের ঠিক অপরদিকে আর একটী ছিদ্র আছে। ইহা পূর্ব্বটীর মত স্বেচ্ছামত বন্ধ করা ও

খোলা যায়। একটু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, একটী পাইপ এই ফারনেসের ভিতর নিম্নদিকে মুখ ঢুকাইয়া দিয়াছে। এই পাইপ, ফারনেসটীকে জড়াইয়া থাকে। ফারনেস সদাই গরম থাকে। হাওয়া এই নলের ভিতর দিয়া আসিলেই গরম হইয়া যায় এবং এই গরম হাওয়া লোহাকে তরল করিতে সাহায্য করে।

প্রথমে ট্রলি করিয়া কয়লা আনিয়া ফারনেসের ভিতর ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং অগ্নি-সংযোগে তাহা প্রজ্বলিত করা হয়। প্রায় স্তরে স্তরে লৌহ ও কয়লা, লৌহ ও কয়লা এইরূপে ফার্‌নেসের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হয়। উপরের দরজাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। লৌহ গলিয়া যায়, ও তরল হইলে কিছু কয়লা ও অন্যান্য সামান্য বিজাতীয় দ্রব্যকে সঙ্গে লইয়া, বরাবর নীচে নামিয়া যাইয়া নীচের ছিদ্র দ্বারা বহির্গত হইতে থাকে। গাদ লৌহাপেক্ষা হাল্কি, কাজেই তাহা লোহার উপর ভাসিতে থাকে, এবং বেশী হইলে উপরস্থিত ছিদ্র দ্বারা বাহির হইয়া যায়। কুলিরা লৌহপাত্রে (যাহার ভিতর দুই ইঞ্চি পুরু কাদা দ্বারা লেপা) এই লৌহধরে এবং রিংয়ে বসাইয়া দুইজনে ধরিয়া ছাঁচের নিকট লইয়া যায় এবং ছাঁচে ঢালিয়া দেয়। লৌহ জমাট বাঁধিলে কিছু আয়তনে বাড়ে। তজ্জন্য ছাঁচ-নির্ম্মাণকারীরা বিশেষ বন্দোবস্ত করে। ইহাকেই বলে কাষ্ট-আইরণ। এই লৌহে বিজাতীয় দ্রব্য শতকরা ৭ ভাগ আছে, (যথা কারবন্. সিলিকন, ফস্ফরাস, গন্ধক, ম্যাঙ্গানিস, ইত্যাদি।) ষ্টিলে শতকরা ২ ভাগ ও রট-আইরণে শতকরা ৫ ভাগ আছে। এই শেষোক্ত লৌহই বিশুদ্ধ। জামালপুরে বরাকরের লৌহ ও বিলাতী লৌহ উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

লোহা গরম হইলে তাহাকে পিটিয়া যেরূপ ইচ্ছা আকার ধারণ করান যাইতে পারে। আমাদের দেশে কর্ম্মকারেরা লোহাকে পিটিয়া হাতা, বেড়ী, খোন্তা, শাবোল, দা, কোদাল ইত্যাদি কত রকম আমাদের উপকারী দ্রব্য তৈয়ার করে। লোহা গরম হইলে নরম হইয়া যায়, এই অবস্থাতেই ইহাকে পেটা হয়। কোন লোহা সহজে পেটা হয়। কিন্তু জামালপুরের কারখানায় লোহাকে চাপিয়া লম্বা করা হয়, আর তাহাকে গোল ও চ্যাপ্‌টা করা হয়; যদি ব্যাসের পরিমাণ দেওয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যাসেরও মত করা যাইতে পারে।

কতকগুলি চাকা একটা রডের চারিদিকে আবর্ত্তন করে। এই রডটিতে সকল চাকার অবস্থিতি, কাজেই এই রডটি ঘুরাইলে সকল গুলিই ঘুরিতে থাকে। ঠিক এই রডের নীচে আর একটি রড আছে, ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত ভাবে কতকগুলি চক্র সংলগ্ন আছে। এই চক্রগুলিতে খাঁজ কাটা ও সকল গুলি এমনি ভাবে অবস্থিত যে, একটি চাকার উপর আর একটি চাকা আছে ও উভয় চক্রেরই খাঁজ এক আয়তনের। নীচেকার চাকাগুলির সামান্য ভাগই দৃষ্ট হয়, কারণ অধিকাংশই মাটীর ভিতর থাকে। এইরূপ করার আবশ্যকতা এই যে, কুলিরা সহজেই লৌহ খাঁজের মধ্যে ঢুকাইতে পারে, বেশী উচ্চে উঠাইতে হয় না।

লোহা গরম হইলে দুইজনে চিমটা দ্বারা ধরিয়া আনে ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ খাঁজটীর ভিতর দেয়। অপরদিকে দুইজন কুলি চিমটা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, চাকা ঘূরিয়া, লোহাটীকে চাপিয়া নিজের খাঁজের মাপ করাইয়া অপরদিকে বাহির করিয়া দেয়, ও কুলিদ্বয় তাহা টানিয়া লয়। এইরূপ পর পর ছোট ছোট খাঁজের মধ্য দিয়া চালান হইলে, যে মাপের মত তৈয়ারী করা হইবে, সেই মাপের মত করিয়া লোহাটীকে বাহির করিয়া লয়। কলে সমস্ত ক্ষণ জল পড়ে, পাছে চাকাগুলি অধিক গরম হয় এবং তাহা হইতে অগ্নি নির্গত হয়, কারণ friction বা সংঘর্ষণে অগ্নি উদ্গমের সম্ভাবনা। কুলিরা তাহাদের নিম্নাবয়ব চট দ্বারা আল্গাভাবে ঢাকিয়া রাখে; কারণ তাহা হইলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাহাদের গায়ে লাগে না, এবং যদি দৈবাৎ চাকায় আটকাইয়া যায়, সহজেই নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে, নতুবা বিষম বিপদ।

শিবপুর কালেজ পত্রিকা,—শ্রীশরদিন্দু রায়. বি এ।

সহজ শিল্প।

কলি চূণ—টাট্‌কা কলি চূণের প্রয়োজন হইলে, দুই চারি কড়া কড়ি আগুনে বেশ করিয়া পুড়াইয়া লইয়া তাহাতে জল দিবে, তাহা হইলেই পোড়া কড়ি সোঁ সোঁ শব্দে জল টানিয়া চূণ হইয়া যাইবে।

কাগজকে রৌপ্য মণ্ডিত করিবার উপায়।—সম পরিমাণ রাং এবং বিস্মথ্‌, অর্থাৎ ১ ভাগ রাং এবং ১ ভাগ বিষমথ্‌ অথবা মনে করুন, অর্দ্ধ-

ছটাক রাং এবং অর্দ্ধ ছটাক বিষ্মথ্, দু'য়ে একত্র করিয়া কোন পাত্রে রাখিয়া উহাতে অল্প রজন কিম্বা মোম দিয়া, আগুনে গালাইয়া লইবে। মোম কিম্বা রজন দিয়া গালাইলে, উক্ত ধাতুদ্বয় অগ্নিতাপে দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইতে পারে না। তাহার পর উক্ত ধাতুদ্বয়কে আগুন হইতে নামাইয়া, তরল থাকিতে থাকিতে উহাতে সমভাগ অর্থাৎ ১ ভাগ অথবা অর্দ্ধ ছটাক পারা ঢালিয়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়িবে। পরে উহাতে অণ্ডলাল কিম্বা শিরীষ আঠা মিশ্রিত করিয়া উক্ত ধাতুত্রয়কে তরল অবস্থায় রাখিয়া পরে কাগজে মাখাইয়া দিবে। প্রথমে মাখাইবার সময় ইহার বর্ণ কাল থাকে। পরে, কাগজখানি শুকাইলে উহাকে কড়ি দিয়া ঘসিবে, তাহা হইলেই কাগজ রৌপ্য মণ্ডিত হইবে। ইহার অপর নাম রূপালির কাগজ। অপেক্ষাকৃত মোটা কাগজে কিম্বা পিস্‌বোটে পাতা-লতার নক্‌সা কাটিয়া, উহার মুকুট বা টুপি তৈয়ারী করিয়া ঐ কাগজের টুপিকে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য দ্বারা রৌপ্য কলাই করিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে, উহা দূর হইতে, ঠিক রৌপ্য-দ্রব্য বলিয়া ভ্রম হয়।

জল রোধক পুটিন।—কাষ্ঠ, প্রস্তর কিম্বা ধাতু দ্রব্য অথবা কাচ এবং মৃত্তিকার দ্রব্য জোড়া দিতে, কিম্বা কাঠের সঙ্গে পাথর অথবা পাথরের সঙ্গে কাচ, কিম্বা কাচের সঙ্গে মৃত্তিকার ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্যে পরস্পর জোড় লাগাইতে নিম্নলিখিত পুটিন ব্যবহার হইয়া থাকে।

১। রজন ৫ ভাগ, মোম ১ ভাগ, ইটের গুঁড়া তিনের এক ভাগ একত্র করিয়া আগুনের তাপে গালাইয়া লও।

২। ধূনা ৫ ছটাক, সরিষার তৈল ২।৷০ ছটাক, বিলাতী মাটী ২ কাঁচ্চা, একত্র মিশ্রিত করিয়া আগুনে ফুটাইয়া লও।

৩। রজন ৪ ভাগ, রেড়ির তৈল ৩ ভাগ, চা-খড়ি গুঁড়া ১ ভাগ, এই তিন দ্রব্যকে আগুনে তাতাইয়া লও।

৪। রজন কিম্বা ধূনা ৬ তোলা, যে কোন স্থায়ী তৈল হউক;—যথা সরিষা, নারিকেল, রেড়ি ইত্যাদি; পরন্তু স্থায়ী তৈলের অভাবে মোম ১ তোলা, কাচ চূর্ণ অথবা পাথর চূর্ণ, অথবা সুরকী, অথবা খড়ি মাটী চূর্ণ, অথবা বিলাতী মাটী, অথবা রেড্‌ওকার—অপর নাম অক্‌সাইড্ অব আয়ারণ—বাঙ্গালা নাম লোহার মরিচা অর্দ্ধ তোলা, এই তিন দ্রব্যকে একত্র করিয়া আগুনে খুব গরম করিয়া লও।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
২য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা; পৌষ, ১৩০৯ সাল।

কাসাভা আলুর চাষ।

(৩)

(লেখক—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, M. A, M. R. A. C, and F. H. A. S.)

কাসাভার আবাদ বড় রকমের করিলে একার প্রতি ১০০ মণ ময়দা বা ছাতু না হইয়া ৫০।৬০ মণ মাত্র হওয়াই সম্ভব। ডাক্তার ওয়াট্ সাহেবের বৃহৎ অভিধানে কাসাভার ছাতু একার প্রতি কত জন্মে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশিত আছে। তবে নিম্ন প্রদত্ত উদ্ধৃতাংশ হইতে এ সম্বন্ধে কিছু হিসাব পাওয়া যায়।

"সিংহলে প্রতি একারে দশ টন কাঁচা মূল উৎপন্ন হয়, এরূপ অনুমান করা যায়। শুকাইলে ইহার এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকে; এবং শুষ্ক মূলের অর্দ্ধেকও যদি ময়দা পাওয়া যায়, তাহা হইলে একার প্রতি ২,৮০০ পাউণ্ড ময়দা জন্মিতে পারে, এরূপ অনুমান হয়।" ২৮০০ পাউণ্ড দেশী হিসাবে প্রায় ৩৪ মণ। এক একার ধান্য বা গোধূম হইতে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, এই হিসাবে তাহার তিন গুণ কাসাভা হইতে উৎপন্ন হয়। ডাক্তার ওয়াট্ সাহেব যে রিপোর্ট হইতে এই উদ্ধৃতাংশটী সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি যে হিসাব দেখাইয়াছি, তাহা প্রকৃত ওজনের ফল। ১০১ সের কাঁচা মূল হইতে বাস্তবিকই পৌনে ২২ সের ময়দা পাইয়াছি। যে অনুপাত ডাক্তার ওয়াট্ সাহেবের অভিধানে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই অনুপাত মানিতে গেলে ১০১ সের কাঁচা মূল হইতে আমি কেবল সাড়ে ১২ সের ময়দা পাইতাম। এমন হইতে পারে, ঠিক্ সময়ে মূলগুলি উঠাইবার কারণ আমি ময়দার ভাগ অধিক পাইয়াছি। ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন বায়ু ও মৃত্তিকা নিতান্ত শুষ্ক থাকে, তখন জলভাগ অধিক না থাকিয়া শুষ্ক শ্বেত-সারের ভাগ মূল মধ্যে স্বভাবতঃই অধিক থাকা সম্ভব। অন্যান্যকালে গাছগুলি সরস ও সতেজ থাকাতে মূলের মধ্যেও অধিক রস চলাচল করিয়া থাকে। কাসাভার কলম যে-সে কালে লাগান যাইতে পারে,

মূলগুলিও যে-সে কালে উঠাইয়া ময়দা প্রস্তুত কার্য্য চলিতে পারে, ইহা দুর্ভিক্ষ নিবারণ হিসাবে দেখিতে গেলে, কাসাভার একটী মহৎ গুণ বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু কাসাভা গাছ হইতে ফাল্গুন চৈত্র মাসেই অধিক ময়দা উৎপন্ন হয় এবং এই দুই মাসেই কলম লাগান বিধেয়। আমি যে মূলগুলি হইতে ময়দা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, ঐ গুলির ওজনের প্রায় এক চতুর্থাংশ ভাগ ওজনের আমি ময়দা পাই। যদি চৈত্রমাসে মূল উঠাইয়া ময়দা প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে কাঁচা মূল যত উৎপন্ন হইবে, তাহার এক চতুর্থাংশ ময়দা উৎপন্ন না হইবার কোন কারণ নাই। যদি ওয়াট্-নির্দ্দিষ্ট ১০ টন কাঁচা মূল একার প্রতি পাওয়া যায়, তাহা হইলে একার-প্রতি ৬০ মণ ময়দা উৎপন্ন হইবার কথা।

এখন একটী কথা আপনাদের মনে স্বতঃই উদয় হইতে পারে,—যে জমি হইতে বৎসর বৎসর এত অধিক পরিমাণ শস্য উঠাইয়া লওয়া যাইবে, তাহার উর্ব্বরতা কতদিন থাকিবে? নিশ্চয়ই এক বৎসর পরেই উৎপন্নের পরিমাণ এককালীন হ্রাস হইয়া যাইবে। যদি কোন সার ব্যবহার করা না হয়, তাহা হইলে দুই এক বৎসর পরে উৎপন্ন কমিয়া যাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি একার-প্রতি বৎসরে ৩০০৲ টাকার ফসল পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে কিছু ব্যয় না করিলে চলিবে কেন? এক বৎসর পরে প্রতি বৎসরে ২০।৩০ টাকার সার একার প্রতি (অন্যূন ৩॥০ বিঘায় এক একার হয়) প্রয়োগ করা আবশ্যক হইবে। পূর্ব্ব বৎসরে ঠিক যে স্থানে নয়টী কাসাভা গাছ জন্মিয়াছিল, সেই স্থানেই গত চৈত্র মাসে আমি নয়টী কলম লাগাইয়া দিই। প্রত্যেক কলমটীর সহিত এক এক মুঠা ছাই ভিন্ন আর কোন সার ব্যবহার করি নাই। তৎপরে চারি মাসের মধ্যে এই নয়টি গাছ যত বড় ও তেজস্কর হইয়াছে, শিবপুর কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে আর কোন কাসাভা গাছ তত বড় ও তেজস্কর হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, কত সহজে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বজায় রাখা ও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

কাসাভার আবাদ যদি বৃহদাকারের করিতে হয়, তবে ছুরিকা দ্বারা মূল খণ্ড খণ্ড করা, অথবা যাঁতা দ্বারা শুষ্ক মণ্ড পেষণ করা অসম্ভব। কৃষকদের বৃহদাকারে কার্য্য করা কোনরূপেই আবশ্যক হইবে না। উহারা ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে কাসাভা গাছ বেড়ার মত লাগাইয়া আবশ্যক মত মূল বাহির করিয়া কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করিতে, অথবা যে সামান্য উপায়ে ময়দা প্রস্তুতের কথা

বলা হইয়াছে, সেইরূপ উপায়ে ময়দা প্রস্তুত করিয়া ক্রমশঃ ব্যবহার করিতে পারে। যদি কোন ধনী ব্যক্তি এই গাছের আবাদ করিতে চাহেন, তাঁহাকে মূল খণ্ড খণ্ড করা, মণ্ড প্রস্তুত করা, মণ্ডকে চাপে রাখা, শুষ্ক মণ্ড পেষণ করা, এ সমস্ত কলের সাহায্যে নির্ব্বাহ করিতে হইবে। বিশেষতঃ বৃহদায়তনের আবাদ না করিয়া ৫।১০ একার জমিতে যদি কেহ কাসাভা লাগাইতে চাহেন, তাহা হইলে, শালগাম কাটা কল (Turnip Cutter), শালগাম মণ্ড করার কল (Turnip Pulper), পনির চাপ দিবার কল (Cheese Press) এবং ছোট ময়দা পেষা কল, এই কয়েকটী সামান্য কল তাঁহার ব্যবহার করা আবশ্যক হইবে; নতুবা ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসের মধ্যে ৫।১০ একার জমির মূল হইতে ময়দা প্রস্তুত করা অসাধ্য হইয়া উঠিবে। কৃষকের যে যে সরঞ্জাম আবশ্যক, সে সমস্ত তাঁহার গৃহে অথবা তাঁহার গ্রামেই পাওয়া যাইবে। গাম্‌লা, বঁটি, ঢেঁকি, বড় বড় দুই একখানা পাথর, এভিন্ন তাহার আর বিশেষ কিছুই সরঞ্জাম আবশ্যক হইবে না।

এখন আপনারা বলিবেন, ময়দা অবধি ত প্রস্তুত হইল; কিন্তু এই ময়দা লইয়া হইবে কি? সাহেবেরা পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া ট্যাপিওকার পুডিং প্রস্তুত করিয়া খাইয়া থাকেন, ইহা বোধ হয় আপনারা জানেন। কিন্তু এ দেশের লোকের পক্ষে ট্যাপিওকা পুডিং বোধ হয় মুখ-রোচক হইবে না। কাসাভার শ্বেত-সার হইতে ট্যাপিওকা প্রস্তুত না করিয়া "ব্রেজিলিয়ন্ এরারুট" অবস্থায় রাখিয়া দিয়া উহা এরারুটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এরারুট অপেক্ষা এই সামগ্রী অধিক পুষ্টিকর। কিন্তু সমস্ত মণ্ড হইতে যখন কাসাভা ময়দা প্রস্তুত হইতে পারে, এবং এই ময়দা হইতে যখন এদেশীয় লোকের খাদ্যের উপযুক্ত নানা সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে, তখন কাসাভা ময়দা প্রস্তুত করাই শ্রেয়ঃ। এই ময়দা হইতে আমি রুটী, লুচি, মালপো, হালুয়া, পুডিং এবং বিস্কুট, এই কয়েকটী সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছি। রুটী, লুচি ও বিস্কুট খুব ভাল হয় নাই, আমি স্বীকার করি; কিন্তু মাল্‌পো, হালুয়া ও পুডিংএর যদি উপযোগিতা বিচার করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, এই ময়দার অতি সুন্দর ব্যবহার হইতে পারে। রুটীগুলি অতি 'মোলায়েম্' এবং খাইতে ভালই হইয়াছিল, কিন্তু দোষের মধ্যে রুটীগুলি টানিলে কিছু অধিক বাড়ে। রুটী ও লুচি প্রস্তুত করিতে হইলে ময়দা মাখিবার সময় গরম জল ব্যবহার করা আবশ্যক। এই ময়দা ও গমের ময়দার ব্যবহার সম্বন্ধে এইমাত্র প্রভেদ।

কাভাসা-ময়দা হইতে হালুয়া প্রস্তত করিতে হইলে, প্রথমে অগ্নির উপর কড়া চড়াইয়া চিনির রস প্রস্তত করিয়া লইতে হয়। রস ঈষৎ চট্‌চটিয়া হইলেই উহার মধ্যে কাসাভা ময়দা জলের সহিত ‘গোলা’ করিয়া ফেলিতে হয়। ময়দার গোলা রসে ফেলিয়াই খুন্তি দ্বারা অনবরত নাড়িতে হয়। নাড়িতে নাড়িতে ময়দার রং সাদা হইতে ঘসা কাচের ন্যায় হইয়া যাইবে। রং পরিবর্ত্তিত হইলেই ঘি, বাদাম ও পেস্তা দিয়া, আর কিছু নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া লইলেই হালুয়া প্রস্তত হইয়া গেল। দশ পনের মিনিটের মধ্যে হালুয়া প্রস্তত হইয়া যাইবে। এই হালুয়া অনেক দিন রাখিয়া ব্যবহার করিলে নষ্ট হয় না। খাইতে ইহা ঠিক্ মস্‌কটের হালুয়ার ন্যায়।

১০০ তোলা হালুয়া প্রস্তত করিতে হইলে ১৩ তোলা কাসাভা-ময়দা ও ৪০ তোলা জল (অর্থাৎ এক ভাগ ময়দা ও তিন ভাগ জল) দ্বারা ‘গোলা’ প্রস্তত করিতে হয়। এই পরিমাণ গোলার উপযুক্ত চিনির রস প্রস্তত করিতে গেলে ৪০ তোলা চিনি ও ২০ তোলা জল ব্যবহার করিতে হয়। ঘি ও অন্যান্য মস্‌লা দিতে পারিলে আস্বাদন কিছু ভাল হয়। আমি ১০০ তোলা হালুয়া প্রস্তত করিতে ১০০ তোলা ঘি ও এক আনার বাদাম ও পেস্তা ব্যবহার করিয়াছিলাম। বাদাম বাটিয়া ব্যবহার করি। চতুর্দ্দিকে বরফ দিয়া জমাইয়া এই হালুয়া আহার করিতে অতি চমৎকার লাগে। [ক্রমশঃ।

পাথুরে কয়লা।

কয়লার উৎপত্তি ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, আমাদের দেশে যে কয়লা গণ্ডয়ানা (Gondwana) বিভাগের প্রস্তর রাশির মধ্যে এবং তালকির (Talchir) প্রস্তরের উপরে পাওয়া যায়, এবং যে কয়লা পলিজ (Sedimentary) প্রস্তরের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা আগ্নেয় (Igneous) প্রস্তরের মধ্যে পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। স্তরে স্তরে বিন্যস্ত মেটে পাথর (Shale mudstone), লৌহ মিশ্রিত পাথর (Ironstone), বেলে পাথর (Sandstone), কিংবা পাথরের নুড়ি জমিয়া পাথর (Conglomerate) এই কয় প্রকারের পলিজ প্রস্তর কয়লা-প্রদেশে পাওয়া যাইতে

পারে; সুতরাং যেখানে এই কয় প্রকারের কোন প্রস্তরই নাই, সেখানে কয়লা নিশ্চয়ই নাই, ইহা স্থির করিতে হইবে। কয়লার জমির সীমাস্থ স্থান অনেক সময়ে নাইস্ (Gneiss) নামক আগ্নেয় প্রস্তরে আবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তরও কতকটা স্তরে স্তরে থাকে এবং রৌদ্র বৃষ্টিতে বিনষ্ট ও বিকৃত হওয়ায় উপরিস্থিত প্রস্তরগুলি দেখিতে বেলে পাথরের ন্যায় হইয়া থাকে; কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া কিংবা একটু মাটী খুঁড়িয়া দেখিলে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তর বলিয়া পরিলক্ষিত হইবে। এ প্রকার স্থানে কয়লা থাকিবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

কয়লার কিংবা পাথরের স্তর সাধারণতঃ ঢালু ভাবে থাকে। উপরিস্থিত জমি অনেকটা সমতল, অন্ততঃ এই জমিকে কতকগুলি সমতল রেখাতে (Contour lines) বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক ঢালু স্তর কোন না কোন স্থানে নিশ্চয়ই মাটির উপরে দেখিতে পাওয়া উচিত। কোন স্তর যেখানে মাটির উপরে থাকে, তাহাকে সেই স্তরের স্তরমুখ বা আউট স্তর (Outcrop) বলে। কিন্তু কোন্ স্তরের মুখ কোথায় মাটির উপরে আছে, অনেক সময়ে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর; কারণ উপরিস্থিত প্রস্তর নষ্ট হইয়া প্রায়ই বিকৃত কিংবা মাটিতে পরিণত হয়, এবং কয়লা কিংবা পাথরের স্তরের মুখ ঢাকা পড়িয়া থাকে। এই প্রকারে কোন কয়লার স্তরের আরম্ভ বা স্তরমুখ প্রথমেই মাটির উপরে না পাইয়া ৫০।৬০ এমন কি কয়েক শত ফিট নীচে পাওয়া যাইতে পারে। রাণীগঞ্জ, তপসী অঞ্চলের অধিকাংশ কয়লার স্তর এই প্রকারের। কিন্তু গিরিডি, বরাকর বিশেষতঃ ঝারিয়া অঞ্চলের অধিকাংশ কয়লার স্তরের মুখ মাটির উপরই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয়লা বিকৃত হইয়া কতকটা কাল মাটির ন্যায় দেখায়, আবার অনেক স্থানে একটু খুঁড়িলেই ভাল কয়লা পাওয়া যায়। কোন স্তরের মুখ খুঁজিতে হইলে যদিচ সাধারণ জমির উপরে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু নদী, খাল কিংবা যোড়ের ধার দিয়া গমন করিলে অনায়াসে দেখা যায়। এই সমস্ত স্থানে জলস্রোতে বিকৃত প্রস্তর ও মাটি গলিয়া ধুইয়া যায় এবং পরিষ্কার পাথর ও কয়লার স্তর বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। রেলের লাইনের কিংবা পুষ্করিণীর ধারে মাটি কাটিয়া ফেলার জন্য অনেক সময় স্তরের মুখগুলি স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন্ স্থানে কয়লা আছে, স্তরমুখ দেখিয়া চিনিতে পারিলে, কিংবা চতু-

দিকের এবং সেই স্থানের জমি দেখিয়া যদি অনুমান করা যায়, তাহা হইলে প্রস্তরভেদী যন্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়া বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। কয়লা কি প্রকারের, উহার স্তর কত মোটা, কত মোটা কয়লার স্তর কি ভাবে ঢালু হইয়া গিয়াছে, স্তরের বিস্তৃতি কত দূর, ভূমিকম্পের দ্বারা জমি ফাটিয়া গিয়া কোন স্থানের কয়লা ও প্রস্তরের স্তর অন্য স্থান হইতে অত্যধিক উত্তোলিত হইয়া গিয়াছে কি না, অর্থাৎ সেখানের জমিতে দোষ, (ফল্ট Fault) আছে কি না, (এই প্রকার ফল্ট ভিতরে থাকিতে পারে, কিন্তু উপরে তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না ; কারণ উপরের জমির উত্তোলিত প্রস্তররাশি বহুলক্ষ বৎসর ধরিয়া বিনষ্ট হইয়া ও জলে ধুইয়া গিয়া উত্তোলনের চিহ্নমাত্র থাকে না এবং উপরের জমি প্রায় সমতল হইয়া মাটিতে আবৃত হইয়া যায়।) এই সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য জমিভেদ করিতে হয়। এই প্রকার জমি ভেদ করাকে ইংরাজীতে বোরিং (Boring) বলে এবং কয়লার খনি অঞ্চলে এই ইংরাজী কথাই ব্যবহৃত হয়। সাধারণ বোরিং যন্ত্র একটী বড় ছেনি কিংবা সাবলের আকারের। ইহার ধারাল মুখ ৫।৬ অঙ্গুলি চওড়া হয় এবং ইহা প্রায় এক হাত লম্বা হয়। এই সাবলে আবার ইস্ক্রু কাটা থাকে, এবং যেমন বোরিং গর্ত্ত অধিক নীচে নামে, ১০ ফিট লম্বা একটী লৌহদণ্ড ইহার মাথার স্ক্রুর সঙ্গে লাগাইয়া দিতে হয়। এই যন্ত্রটী কতকগুলি লোকে উচ্চ করিয়া ধরে এবং ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ফেলে। এই প্রকারে প্রস্তরগুলি গুঁড়া হইয়া যায়। ৮।৯ ইঞ্চি পাথর এই প্রকারে কুচা হইয়া গেলে, যন্ত্রটী উঠাইয়া তাহার মাথার সাবল খুলিয়া লইয়া তৎস্থানে একটী পাইপ (Pipe) লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং পাইপ লাগান যন্ত্রটী সজোরে বোরিং গর্ত্তে উঠাইয়া ফেলা হয়। ইহাতে কুচা পাথরগুলি পাইপের মধ্যে ঢুকিয়া যায়। তখন আস্তে আস্তে তুলিয়া দেখিতে হয়, কি প্রকারের পাথর উঠিল। বোরিংতে কয়লা লাগিলে, তাহা উঠাইয়া অনায়াসে দেখিতে পারা যায়। এই প্রকারে বোরিং ২০০।২৫০ ফিট পর্য্যন্ত মানুষ দ্বারা অনায়াসে করিতে পারা যায়। ইহা অপেক্ষা অধিক নীচে নামাইতে হইলে, ইঞ্জিন লাগাইবার প্রয়োজন হয় ; কিন্তু ২০০ ফিটের অধিক বোরিং করিতে হীরক-ভেদক (Diamond Boring) যন্ত্র ব্যবহার হয়। ইহাতে প্রস্তরগুলি গুঁড়া না হইয়া, মাটীর ভিতর যে ভাবে থাকে, ঠিক সেই ভাবেই লৌহের পাইপের মধ্যে উঠে। এই যন্ত্রে একটী ইস্পাতের পাইপের মুখে ৫।৬ খান হীরক বসান থাকে এবং সেই পাইপ ইঞ্জিন সাহায্যে ঘোরান হয়। তাহাতে প্রস্তর কাটিয়া পাইপ ভিতরে প্রবেশ করে, এবং মধ্যস্থিত প্রস্তর পাইপের ভিতরের ন্যায় গোল হইয়া পাইপের মধ্যে যায়। এ প্রকার বোরিং দ্বারা জমির প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বোরিং যেমন নিম্নে নামে, একটী একটী করিয়া পাইপ স্ক্রু দ্বারা জুড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ইচ্ছামত অনেক দূর পর্য্যন্ত বোরিং করা যায় ; কিন্তু খরচ বেশী পড়ে। কিলবরণ কোং ৫০০ ফিট পর্য্যন্ত প্রত্যেক ফুটে ৫৲ টাকা করিয়া গ্রহণ করেন। প্রথমোক্ত সাধারণ বোরিং যন্ত্র ১০০০৲ টাকা হইলে পাওয়া যায়। ইহাতে ২০০ ফিট পর্য্যন্ত প্রস্তর ভেদ করা যাইতে পারে এবং প্রত্যেক ফুট ভেদ করিতে ২৲ টাকা করিয়া খরচ পড়ে। একবার যন্ত্রগুলি কিনিলে অনেকগুলি বোরিং করা যাইতে পারে। একটী কয়লার স্তর কি ভাবে জমির ভিতর আছে, জানিতে হইলে, অন্ততঃ তিনটী বোরিং করা আবশ্যক। আমাদের স্বদেশবাসীগণের অনেক কয়লার খনি আছে ; কিন্তু তাঁহারা প্রথমে বোরিং করিতে সাধারণতঃ বেশী পয়সা খরচ করিতে চাহেন না। এই জন্য খনি করিয়া তাঁহাদিগকে খনির মধ্যে জলের জন্য এবং কয়লা উঠাইবার জন্য ভবিষ্যতে অনেক সময় কষ্ট পাইতে হয়। রেলের লাইন করিতে হইলে যেমন প্রথমতঃ অনেক বার জরিপ করিয়া দেখা উচিত এবং সে বিষয়ে কার্পণ্য করিলে ভবিষ্যতে অনেক লোকসান হইতে পারে ; খনি করিতে হইলে সেই প্রকার ভাল করিয়া বোরিং না করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে ভবিষ্যতে অনেক অসুবিধা ভোগ হইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত বোরিং হইয়াছে, তাহার মধ্যে রুশিয়ার পারুশেইজের বোরিং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীর হইয়াছিল। এই বোরিং ৬৫৭২০৭ ফিট পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইহাতে ৮৩টা কয়লার স্তর পাওয়া গিয়াছিল ; এই সমস্ত কয়লার স্তরগুলি সর্ব্বসমেত ২৯৩৬ ফিট মোটা। লিপজিকের নিকটবর্ত্তী শলডেককের বোরিং ৫৭৩৬ ফিট পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ৩।৪ হাজার ফিট বোরিং পৃথিবীর অনেক স্থানে হইয়াছে। খনিজ পদার্থ কোথায় কি ভাবে আছে, তাহা জানিবার জন্য বোরিং যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহারাই বুঝিয়াছেন। প্রুসিয়া রাজ্যের এ সম্বন্ধে ব্যয়ের কথা শুনিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন—সেখানকার গবর্ণমেণ্ট ১৩ বৎসরে ৪০০ বোরিং করিয়াছিলেন, ইহাতে সর্ব্বসমেত ৮০ মাইল বোরিং হইয়াছিল, এবং ৯৭॥০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

বোরিং করিয়া কয়লার স্তর কি ভাবে আছে জানিতে পারিলে, কয়লা উঠাইবার জন্য কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। কয়লার স্তরের মুখ যদি মাটির উপরেই থাকে, ও এমন কি ৫০।৬০ ফিট নিম্নেও থাকে, তাহা হইলে শ্রীমোহন (Incline) কাটিয়া কার্য্য আরম্ভ করা সুবিধাজনক এবং বেশী নিম্নে কয়লা তুলিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। মোট কথা, মূলধন বুঝিয়া ব্যবস্থা করা উচিত। যাঁহারা প্রথমে বেশী খরচ করিতে পারেন, তাঁহাদের ভবিষ্যতে লাভের সম্ভাবনা বেশী। কয়লা যদি ভাল হয় এবং তুলিয়া যদি বিক্রয় না হইবার আশঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে প্রথমতঃ যত অধিক ব্যয় করিতে পারা যায়, ততই ভাল। এমন কি দেখা গিয়াছে, কার্য্য আরম্ভ করার দুই এক বৎসরের মধ্যেই অনেকের মূলধন উঠিয়া আইসে। কয়লা যদি ৫০।৬০ ফিটের নিম্নেই পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইঁদারা (Shaft) অপেক্ষা শ্রীমোহন (Incline) কাটিতে খরচ অনেক বেশী হইবে নিশ্চয়; কিন্তু যাঁহারা একটু অঙ্ক জানেন, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, যে ইঞ্জিনে ইঁদারা হইতে একবারে এক টন কয়লা তুলিবে, সেই ইঞ্জিনে শ্রীমোহনের ঢালু যদি ৫ ফিটে এক ফুট হয়, তাহা হইলে প্রায় ৫ টন কয়লা অনায়াসে উঠাইতে পারিবে। অর্থাৎ প্রায় একই সময়ের মধ্যে একই খরচে ৫ গুণ কয়লা উঠিবে। ঢালু যত কম হইবে, প্রায় তত গুণ অধিক কয়লা উঠিবে। ইঁদারা হইতে শ্রীমোহনে অনেক কম খরচে কয়লা উঠে বলিয়া, ই, আই রেলওয়ে কোম্পানী তাহাদের গিরিধিস্থ বিটগেড়া খাদে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া প্রায় ১০০০ ফিট লম্বা পাথরের ভিতর দিয়া শ্রীমোহন (Inclined rock tunnel) কাটিয়াছেন। ইহা প্রায় ৪ ফিটে ১ ফুট ঢালু আছে, এবং ইহা দ্বারা দুইটী খনির কয়লা উঠিবে।

খনিতে কার্য্য করিবার নিমিত্ত বায়ুর যাতায়াত (Ventilation) আবশ্যক। সুতরাং উপর হইতে বায়ু প্রবেশের একটী রাস্তা এবং বায়ু নির্গমের একটী রাস্তার প্রয়োজন। সেই নিমিত্ত শ্রীমোহন কাটিলে আর একটী শ্রী-মোহন কিম্বা একটী ইঁদারা কাটার প্রয়োজন এবং ইঁদারা করিলে দুইটী ইঁদারার প্রয়োজন। উপর হইতে খনির ভিতর যাইবার দুইটী রাস্তার মধ্যে খনির ভিতর দিয়া যোগ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। যাহাতে বাতাস প্রবেশ করিয়া শীঘ্র বাহির হইতে পারে, সেই জন্য একটী রাস্তাকে বাষ্প ছাড়িয়া অথবা আগুন জ্বালিয়া গরম করা হয় এবং অন্য রাস্তাকে কখন কখন জল সেচন দ্বারা ঠাণ্ডা করা হয়। যে সমস্ত স্থানে, লোকে কয়লা কাটে, সেখানে সুচারুরূপে বায়ু লইয়া যাওয়া খনি-ইঞ্জিনীয়ারের একটী বিশেষ আবশ্যক কার্য্য। ইউরোপের অনেক খনিতে এই নিমিত্ত বড় বড় বায়ুযন্ত্র (Ventilating machines) আছে। এখানে সেরূপ ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত কোন খনিতে হয় নাই। কারণ এখানকার খনি সমূহের কার্য্য ইউরোপীয় খনির ন্যায় অত বৃহদাকার হইবার সময় এখনও আসে নাই। আর আমাদের দেশের অধিকাংশ খনিতে মাটির অল্প নিম্নেই এখনও কয়লা কাটা চলিতেছে। এমন কি ঝড়িয়া অঞ্চলে অনেক স্থানে পুষ্করিণীর ন্যায় মাটি কাটিয়া (quarrying) কয়লা উঠান হইতেছে। মাটির যত নিম্নে যাওয়া যায়, ততই বেশী উষ্ণতা অনুভব হয়। গড়ে প্রায় প্রত্যেক ৬৬ ফিট নিম্নে যাইলে, ফারণহিট এক ডিগ্রি করিয়া বেশী উষ্ণ অনুভব হয়। ৩০০ ফিটের অধিক গভীর খনি আমাদের দেশে অতি অল্পই আছে; গিরিডির রেলওয়ে কোম্পানীর ২ নং জুবিলি খনি ৬৯৫ ফিট গভীর। ভারতবর্ষ মধ্যে ইহাই অত্যধিক গভীর খনি। এত অল্প নিম্নে কার্য্য হইতেছে বলিয়া এবং খনিগুলি ছোট ও তজ্জন্য খনিসমূহে তত অধিক লোক কার্য্য করে না বলিয়া, আমাদের দেশের খনিতে বাতাস দিবার কলের এখনও তত আবশ্যকতা হয় নাই। ইউরোপ ও আমেরিকায় কত নিম্নে খনিতে কার্য্য হয়, তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটী খনি হইতে বুঝিতে পারিবেন।

আমেরিকার রেড জ্যাকেট, সুপিরিয়ার হ্রদ তাম্রখনি	৪৯০০ ফিট।
আমেরিকার তামারক, সুপিরিয়ার তাম্রখনি	৪৪৫০ „
বেলজিয়ম প্রভৃতি কয়লার খনি	৩৯৩৭ „
বেলজিয়ম বিবিয়ার্স কয়লার খনি দিসি	৩৭৫০ „
অস্ট্রিয়া হন্দারি আডেলবার্ট মিসার খনি প্রিজিব্রাস	৩৬৭২ „
বেলজিয়ম সাইমন ল্যাম্বাট কয়লার খনি	৩৪৮৯ „
ইংলণ্ড পেণ্ডেল্টন কয়লার খনি ম্যাঞ্চেষ্টার	৩৪৭৪ „
ইংলণ্ড এমটনমস্ কয়লার খনি ম্যাঞ্চেষ্টার	৩৩৬০ „
অস্ট্রেলিয়া ল্যানমেন স্বর্ণ খনি বেনাডিলো	৩০০২ „
বেলজিয়ম বিয়ার্ণয় কয়লার খনি	৩৩০০ „

১৮৯৭ সালে ১৫০০ ফিটের অধিক গভীর খনি, গ্রেটবৃটনে ৮৪, বেলজিয়মে ১২, জর্ম্মনীতে ১১, আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে ৮, অস্ট্রিয়া ইফরিতে ৭, অষ্ট্রেলিয়াতে ৬, ফ্রান্সে ৪, দক্ষিণ আফ্রিকায় ২ এবং নরওয়েতে ১টী ছিল।

প্রত্যেক ৬৬ ফিটে ১ ডিগ্রি করিয়া উত্তাপ বাড়িলে, এই সমস্ত গভীর খনিতে উত্তাপ কত ভয়ানক হয় ভাবিয়া দেখুন। এই সমস্ত খনিতে কেবল বায়ুযন্ত্র কেন, খনিজ পদার্থ সুচারুরূপে উঠাইবার নিমিত্ত বড় বড় কল কারখানার প্রয়োজন হয়, সকলেই জানেন; এই কলের জন্য সচরাচর অধিকাংশ খনির ভিতর ভিজা থাকে। এই সমস্ত ভিজা খনির মধ্যে প্রবল বেগে কলের দ্বারা বায়ু সঞ্চালিত হইলে, বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়। কিন্তু আবার অনেক খনি আছে, যেখানে বায়ুর সঞ্চালন হয় না; সেখানে কলের স্বাভাবিক উষ্ণতা হেতু সাধারণ লোকের পক্ষে এক দণ্ডও দাঁড়ান দুষ্কর।

অন্ধের অঙ্ক শিক্ষা।

অন্ধদিগকে নানা উপায়ে অঙ্ক শিখান যাইতে পারে। চীনদেশে অঙ্ক কষিবার এক প্রকার বাক্স আছে। বাক্সটীর ডালা খোলা; খোলাস্থানে শ্রেণীভাবে কতকগুলি কাটি আঁটা আছে। উক্ত কাটির ভিতর কাষ্ঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল সংযুক্ত আছে। এই বলগুলিই তাঁহাদের ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্ক চিহ্ন লেখা প্রকাশ করে। কিন্তু ইহারা বল বা কাষ্ঠ গোলকগুলির প্রকার ভেদ রাখেন নাই। এজন্য ইহাঁদের স্মৃতির কার্য্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে করিতে হয়, অর্থাৎ উক্ত বলের সাহায্যে উহাদের "সাট" রাখিতে হয়। মনে করুন, একটা বল "১" দুইটী বল "২" এইরূপে দশটা বলকে "১০" করিয়া, প্রকৃত "১০" রাখিবার সময় উপর কাটিতে একটী বল সরাইয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখিলেই, উক্ত একটা বলের দ্বারাই "১০" লেখা হইয়া গেল; এজন্য "দশটা বল" রাখিতে হয় না।

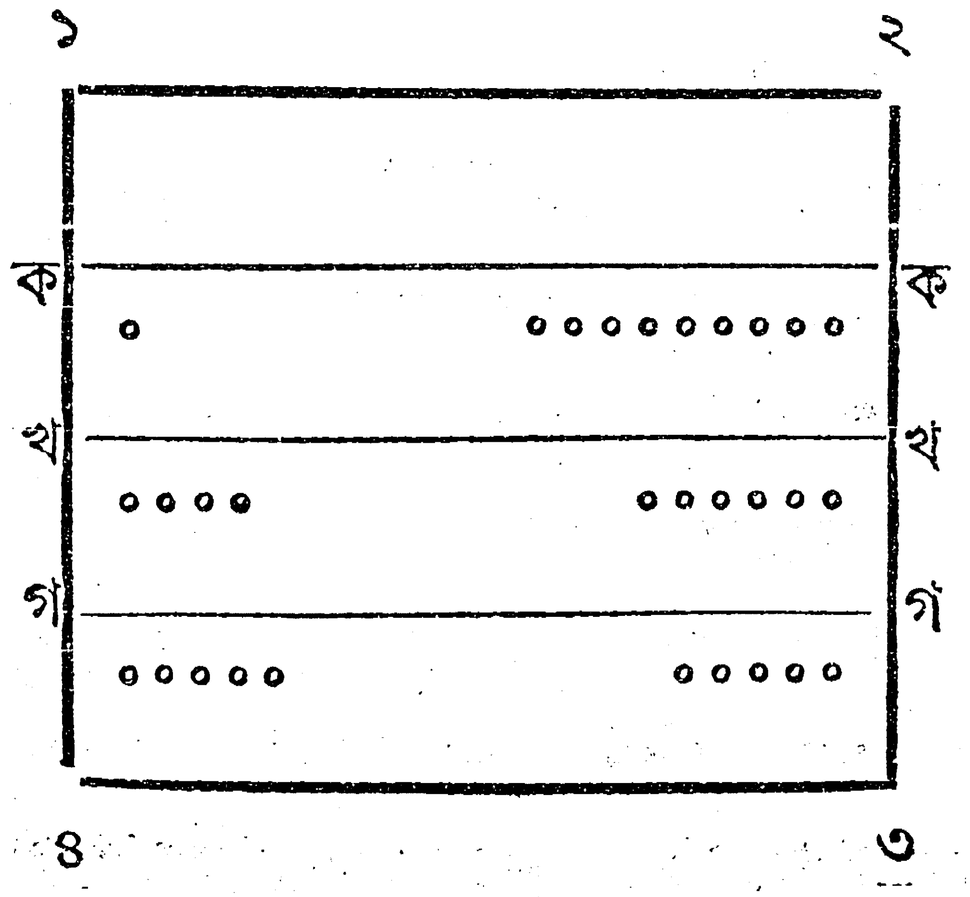

১, ২, ৩, ৪ এই চতুষ্কোণবিশিষ্ট একটা, বাক্স। "ক" "ক" চিহ্নিত একটী কাটি উহাতে আট্‌কান হইয়াছে। উক্ত কাটির এক দিকে নয়টা শূন্য যাহা দেখান হইয়াছে, উহা "৯" বল বা কাষ্টগোলক জানিতে হইবে। এবং এই লাইনটি "এক শত হইতে হাজার" অঙ্ক লিখিবার ঘর। উক্ত লাইনের একটী বল স্বতন্ত্র রাখিলে, (যেমন চিত্রে রাখা হইয়াছে) "১০০" শত বুঝায়। ঐরূপ দশটা বলকেই বাঁ ধারে টানিয়া দিলে "হাজার" লেখা হইয়া যায়। দুইটাকে দিলে "২০০" শত বুঝায়। তিনটাকে দিলে "৩০০" শত বুঝায়। এইরূপ ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০টাকে দিলে ক্রমান্বয়ে "৪০০" "৫০০" "৬০০" "৭০০" "৮০০" "৯০০" এবং "১০০০" বুঝাইয়া থাকে। উহার নিম্নেই "খ" "খ" চিহ্নিত দ্বিতীয় কাটি। উক্ত লাইনেও দশটি বল আছে। এই লাইনের একটী বল সরাইলে, "১০" লেখা হইয়া যায়। অতএব এই লাইনের বলের দ্বারা "১০" হইতে "১০০" পর্য্যন্ত লেখা যায়। এই লাইনের ,একটা বল সরাইয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখিলে যেমন ১০ হয়, সেইরূপ ২টা সরাইলে ২০ হয়, ৩টা সরাইলে ৩০ হয়; এইরূপ যথাক্রমে ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০ সরাইলে, ক্রমান্বয়ে ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০ এবং ১০০ লেখা হইয়া থাকে। তৎপরে কতকগুলি শত লিখিতে গেলেই উহার উপরের লাইনের বল সরাইতে হয়।

তৎপরে "গ" "গ" চিহ্নিত কাটিতে "দশটা" বল আছে। উহা দ্বারা আমাদের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ বুঝাইয়া থাকে, অর্থাৎ উহার ১টা বল সরাইলে ১ হয়, ২টা সরাইলে ২ হয়। এইরূপ ১০টা সরাইলে ১০ হয়।

"গ" চিহ্নিত লাইনে আমরা ৫টা সরাইয়াছি, অতএব উহা ৫ হইয়াছে। তৎপরে, "ক" চিহ্নিত শতের ঘরে ১টা সরান আছে; অতএব উহা "এক শত" তাহার পর দশকের ঘরে ৪টা সরান আছে, অতএব উহা ৪ × ১০ = ৪০ হইয়াছে। এইবার ঠিক দিউন ১০০, ৪০ এবং ৫ = ৪৫, মোট ১৪৫ তিন লাইনের যোগফল।

আচ্ছা, যদি বলা যায়, ১৪৫ এবং ২১০ একত্র কত হইবে? তাহা হইলে উহারা কি করিবে জানেন? অগ্রে ১৪৫, অঙ্ক বল বা ঘুটি সরাইয়া রাখিবে। যেমন পূর্ব্বে আমরা লাইন অনুসারে রাখিয়াছি, উহা দেখিবেন, বা এখানে একটু নূতন ভাবে রাখিয়া দিতেছি। আপনারা লাইন অনুসারে ধরিয়া লইবেন।

আমাদের যেমন একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত এবং কোটি প্রভৃতি শ্রেণীভাবে লেখা হয়, উহারা তেমনি লাইনের কাটির গাত্রে বল রাখিয়া অঙ্ক রাখিবার শ্রেণী বিভাগ করিয়া লয়। প্রথম শিক্ষার্থীদের অবশ্য জটিল বোধ হইবে (কোন্ বিষয় প্রথম শিখিবার সময় জটিল বোধ না হয়?)। তৎপরে ঐ ঘুটি চালা দ্বারা এমন সুন্দর অভ্যাস হয় যে, কোন অঙ্ক আমরা কাগজে কলমে অথবা শ্লেট পেন্‌সিল দ্বারা যত শীঘ্র কষিতে পারি, উহারা ঐ বল দ্বারা তত শীঘ্র কষিতে পারে। এখানে ১৪৫, উহাদের নিয়মে রাখা হইল,—

	(বাঁয়ে)	(ডাইনে)
শতকের ঘর	০	০০০০০০০০০
দশকের ঘর	০০০০	০০০০০০
এককের ঘর	০০০০০	০০০০০

বাঁয়ে অঙ্কের "বল" রাখাই ধর্ত্তব্য। উক্ত ১৪৫ সঙ্গে ২১০ যোগ করিতে বলা হইয়াছে। অতএব দুই শতের "দুই" গোলা শতকের ঘরে সরাইয়া দাও। তৎপরে দুই শত দশের দুই শত গেলে, বাকী রহিল "এক দশ"। অতএব দশকের ঘরে এক বল বা ০ এক শূন্য সরাইয়া দাও। দশকের ঘরে আছে "০০০০" চারি শূন্যে ৪ দশ বা ৪০ চল্লিশ, উহাতে আর এক শূন্য ০ বা বল সরাইয়া দিলে "০০০০০" পাঁচ দশ বা পঞ্চাশ হইল। ২১০, বলা হইয়াছে, অতএব এককের ঘরে আর অঙ্ক রাখিবার জন্য অবশিষ্ট নাই। কাজেই এককের ঘরে পাঁচ একক বা ৫ রহিয়া গিয়া ঠিক দিয়া হইল,—

শত	০০০	০০০০০০০
দশ	০০০০০	০০০০০
এক	০০০০০	০০০০০

অর্থাৎ ৩৫৫ হইল। এইরূপে উহারা সঙ্গে সঙ্গে হিসাব করিয়া যোগ দিয়া যায়। উহাদের বিয়োগ কষিবার নিয়ম সুন্দর। নিম্নে দুই একটি উদাহরণ দিতেছি।

প্রশ্ন। আঠার হইতে দশ গেল বাকী রহিল কয়? প্রথম ১৮ রাখা হইতেছে, যথা এক দশক এবং আট একক।

	বামদিক	দক্ষিণ দিক
দশক	০	০০০০০০০০০
একক	০০০০০০০০	০০

এই আঠার হইতে দশক বা দশ বাদ দিতে হইলে, দশকের ঘরের বলটি সরাইয়া দক্ষিণ দিকে রাখা হইল। তাহা হইলে উত্তরে কেবল আট একক দাঁড়াইল। অতএব উত্তর ৮ আট।

আচ্ছা, ৬৫২৩ হইতে ৪৮২১ বাদ গেলে কত বাকী থাকে?

সহস্রের ঘরে	০০০০০০	০০০০
শতকের ,,	০০০০০	০০০০০
দশকের ,,	০০	০০০০০০০০
এককের ,,	০০০	০০০০০০০

ইহা হইতে চারি হাজার আট শত একুশ বাদ যাইবে। অতএব ৪৮২১ উহাদের নিয়মে বলের দ্বারা রাখা হইল।

সহস্রের ঘরে	০০০০	০০০০০০
শতকের ,,	০০০০০০০০	০০
দশকের ,,	০০	০০০০০০০০
এককের ,,	০	০০০০০০০০০

এইবার বাদ দিয়া রাখিয়া যাউক। প্রথম এককের ঘরে এককের ঘরে বাদ দিয়া, পরে দশকের ঘরে দশকের ঘরে বাদ দিয়া, তৎপরে শতকের ঘরে শতকের ঘরে বাদ দিয়া, সর্ব্বশেষ সহস্রের ঘরে সহস্রের ঘরে বাদ দিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের যেমন এককের ঘর হইতে পর পর উচ্চ ঘর দিয়া বাদ কাটিয়া যাইতে হয়, উহাদেরও সেই নিয়ম। যাহা হউক, এক্ষণে ধরুন, প্রথম এককের ঘরে "০০০" শূন্য আছে, এবং দ্বিতীয় এককের ঘরে "এক" ০ উহা হইতে বাদ যাইতেছে; অতএব "০০০" হইতে "০" বাদ দিলে "০০" দুই শূন্য থাকিল। তৎপরে দশকের দুইটি ঘরেই দুই ০০ দুই ০০ শূন্য আছে। অতএব দুই হইতে দুই বাদ গেলে কিছুই থাকে না। কাজেই দশকের ঘরে কোন বল বা গোলা রাখা হইল না। ফাঁকা রহিল। আমরা এস্থানে দশকের ঘরে একটা ড্যাস "—" দিয়া রাখিলাম। এইবার উর্দ্ধ শতকের ঘরে "০০০০০" পাঁচটা এবং নিম্ন শতকের ঘরে "০০০০০০০০" আটটা আছে। অতএব ৫ হইতে ৮ বাদ যায় না। কাজেই একটা হাজারের বল ভাঙ্গাইতে হইল। হাজারের বল ১টা বাম হইতে দক্ষিণ দিকে সরাইয়া দিয়া উহাকে দশ শত ০ ধরিয়া, তৎসঙ্গে ০০০০০ শূন্যে পাঁচ শত এবং হাজার বল ভাঙ্গানি দশ শত, মোট ১৫ শত হইতে এইবার "০০০০০০০০" আট শূন্য আট শত

বাদ গিয়া অবশিষ্ট রহিল, ৭ সাত "০০০০০০০" শূন্য। তৎপরে হাজারের ঘরে ৬টা বল অর্থাৎ ছয় হাজার ছিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে উহা হইতে এক বল সরান হইয়াছে, কাজেই এখন হাজারের ঘরে "০০০০০" পাঁচ শূন্য বা পাঁচ বল আছে। অতএব পাঁচ শত হইতে অপর হাজারের ঘরের ৪ বাদ গেল, কাজেই বাকী রহিল "০" এক শূন্য বা এক হাজার। মোট বিয়োগের উত্তর এই রাখা হইয়াছে।

সহস্র	০	০০০০০০০০০
শত	০০০০০০০	০০০
দশ	——	০০০০০০০০০০০
এক	০০	০০০০০০০০০

অর্থাৎ ১৭০২ অবশিষ্ট রহিল। এইরূপে উহারা গুণ ভাগ ইত্যাদি সমুদয় অঙ্ক করিয়া থাকে। এবং লাইনের হিসাব রাখিয়া উহা দ্বারা সিকি, আনা এবং পয়সা, কড়া, ক্রান্তি পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া লয়। এই সঙ্কেত দ্বারা চক্ষুষ্মান বালক এবং অন্ধ বালক উভয়ে এক স্থানে বসিয়া অঙ্কবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। কারণ যাহার চক্ষু আছে, সে ইহা দেখিয়া বল নাড়াইবে, অন্ধ বালক চক্ষুর কার্য্য হস্তাঙ্গুলির সাহায্যে হাৎড়াইয়া করিতে অভ্যাস করিবে।

অনেক বাঙ্গালা স্কুলে দেখিয়াছি, বোর্ডের মত করিয়া কাষ্ঠবলের মালা সাজাইয়া, উহা দ্বারা ছোট ছোট বালকদিগকে গণনা শিক্ষা দেওয়া হয়। এইবার ঐ সকল বলের সাহায্যে অন্ধ বালকদিগকে অঙ্ক কষান শিক্ষা দেওয়ার কথা বলিব। কতকগুলি মারবেল বা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক খণ্ড বা শিলাখণ্ড অথবা তেঁতুল বিচি, অথবা কড়ি দিয়াও অন্ধদিগকে অঙ্ক কষান শিক্ষা দেওয়া যায়। উহার সঙ্কেত পূর্ব্বোক্তরূপ। উদাহরণ যথা,—

আমরা যেমন ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি অঙ্ক লিখিয়া থাকি; অন্ধেরা ঐ লেখার কার্য্য কড়ি ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের দ্বারা সম্পন্ন করে। পাঠশালার একদিকে চক্ষুষ্মান বালক-বালিকা যেমন স্লেট্ পেন্সিল দিয়া অঙ্ক করিতে বসে, তাহাদের পার্শ্বেই অন্ধ বালক-বালিকা কাপড়ে কড়ি লইয়া অঙ্ক শিক্ষার জন্য বসিতে পারে। আমরা যেমন ১৩ তের লিখিতে হইলে, প্রথম একটা 'এক' তৎপরে একটা 'তিন' লিখিয়া থাকি, অন্ধেরাও তেমনি "'তের' বুঝিতে হইলে, প্রথম মাটিতে এক স্থানে 'এক কড়া কড়ি' রাখে, তৎপরে উহার একটু পার্শ্বে তিনের জন্য 'তিন কড়া কড়ি' রাখে। তৎপরে হস্ত বুলাইয়া উহার উপলব্ধি করে।

মনে করুন, কোন অন্ধ বালককে বলা হইল, 'তের', 'আটাশ' এবং 'ষোল' যোগ দিয়া কত হইবে? সে প্রথম 'তের' রাখিবার জন্য কড়ি গুলি এইরূপে রাখিবে। (নিম্নস্থ '০' দ্বারা কড়ি বা তাদৃশ কোন বস্তু বুঝিতে হইবে।)

(বাম) (দক্ষিণ)

০ ০০০ অন্ধ বালক প্রশ্ন করিল, ১৩ রাখিয়াছি। তারপর?

"তৎপরে ২৮ রাখ।"

উত্তর 'আচ্ছা' ০০ ০০০০ ২৮ রাখিয়াছি। তারপর?

০০০০

'তার পর ১৬ রাখ।'

'আচ্ছা' ০ ০০০ ১৬ রাখা হইল। এই বার ঠিক দিব বলিয়া সে

০০০

দক্ষিণ দিক হইতে পর পর থাকা গুলি হস্ত বুলাইয়া, প্রত্যেক থাকায় ক'কড়া কড়ি আছে, তাহা গুণিয়া ঠিক দিতে আরম্ভ করিল। একটী বুদ্ধিমান অন্ধ বালক দেখি যে, সে দক্ষিণ দিকের 'থাকা' গুলি পর পর কোন্ থাকায় ক'কড়া হিসাব না রাখিয়া থাকার শেষ ঠিকে যে ক'কড়া বসে, তাহা বসাইয়া, তৎপরে বাম দিকের থাকটী গুণিয়া ঠিক দিয়া বলিল "৫৭ সাতান্ন হইয়াছে।"

প্রশ্ন। রাখ,—এক হাজার তিন শত তেইশ।
তৎপরে, দুই ,, ছয় ,, কুড়ি।
,, তিন ,, চারি ,, বাইশ।

অন্ধ বালক কড়ি মাটিতে এই ভাবে সাজাইয়া গেল,—

সহস্র	শত	দশক	একক,
০	০০০	০০	০০০
০০	০০০	০০	—
	০০০		
০০	০০	০০	০০
০	০০		
০০০	০০	০০০	০০০
০০০	০	০০০	০০

ঠিক দিল "এককের" ঘর হইতে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় ''সহস্রের'' ঘরের যোগফলে ক কড়া কড়ি আছে, তাহা হাৎড়াইয়া গুণিল, বুঝিল ৬ কড়া, বলিল '৬ সহস্র'—শতের ঘরে তিন কড়া, অতএব ''তিন শত''—দশকের ঘরে ছয় কড়া, অতএব উহা ছয় দশ অর্থাৎ ৬০ ষাটি, তৎপরে ৫ একক, অতএব ৬০+৫=৬৫ হইল।

উত্তর "৬৩৬৫'' হইয়াছে।

এইরূপ সঙ্কেতে উহাদের সমুদয় অঙ্ক কষান চলে। আর আনা পয়সার জন্য অন্য প্রকার কোন বস্তু, যথা তেঁতুল বিচি হইল আনা, কুরুই বা নুড়ি বা প্রস্তরখণ্ড হইল পয়সা রাখিবার সঙ্কেত, কড়ি হইল টাকার সঙ্কেতরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এইরূপ ভাবে উহাদের অঙ্ক কষাইতে শিখাইলে, অন্ধদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইতে পারিবে, এবং আপিসের হিসাব দোহারা করিবার জন্য ইহাদের আপিসে কর্ম্ম হইলেও হইতে পারিবে। রীতিমত শিক্ষা পাইলে, ইহারা 'অন্ধ-বিদ্যালয় করিয়া, টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে। চোখ-ওয়ালার বিদ্যালয় অপেক্ষা 'অন্ধ-বিদ্যালয়' এদেশে অনেক বেশী হওয়াই সম্ভব; কারণ এ দেশের ক'টা লোকের চক্ষু আছে ?

অন্ধদের জন্য স্বতন্ত্র অক্ষরের পুস্তক আছে, সেই পুস্তক উহারা পাঠ করে। "গীতা" খানা অন্ধদের অক্ষরে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলে, উহারা তাহা পাঠ করিয়া, কত হরিসভা, ব্রহ্মসভা করিবে। ক্রমে যখন অন্ধেরা অনেকে লেখাপড়া শিখিবে, তখন উহাদের অক্ষরে কত সংবাদপত্র বাহির হইবে। অন্ধ সম্পাদক উহা লিখিবে, অন্ধ গ্রাহকেরাই উহা পড়িবে। সমাজের অর্দ্ধ অন্ধ, সিকি অন্ধ এবং দু'আনা অন্ধ যত চসমাধারী বাবুরা আছেন, তাঁহারাও এই সময় হইতে কিছু কিছু অন্ধদের সঙ্কেত শিক্ষা করিতে চেষ্টা করুন। ইহা দ্বারা পরিণামে তাঁহারা অনেক ফল পাইবেন, এবং উপস্থিত ইহা দ্বারা অনেকের 'অন্ধজ্ঞান' কাটিবার ঔষধের ন্যায় এই সকল প্রবন্ধ কার্য্য করিবে।

যেখানে যত চক্ষুষ্মান মহাভাগ আছেন, সকলেরই উচিত, যাহাতে অন্ধেরা লেখাপড়া সুকৌশলে শিক্ষা করিতে পারে, তাহার কৌশলগুলি সাধারণকে বলিয়া দেওয়া। কেবল একটী অন্ধ-বিদ্যালয় (যাহা কলিকাতায় হইয়াছে) করিলে হইবে না। গ্রামে গ্রামে অনেক অন্ধ-পাঠশালা বসাইতে হইবে।

বাণিজ্যের কথা।

ভারতের পণ্য চিরদিনই বিদেশে গিয়াছে, এখনও অনেক দ্রব্য যাইতেছে। অতএব ইহা বাণিজ্যপ্রধান দেশ। কল-কব্জার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের অনেক ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিয়াছে। ইংরাজেরা এখানে আসিয়া ঐ সকল পতনশীল ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধন জন্য এদেশে কল ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং এখনও তজ্জন্য প্রস্তুত আছেন; কিন্তু এই সকল কলের বহুবিধ দ্রব্য বাণিজ্যের জন্য প্রস্তুত হয় নাই, উহা অন্তর্বাণিজ্যের জন্যই যেন প্রস্তুত হইতেছে। এ জন্য এদেশে দেশালাই, কাপড়, চিনি প্রভৃতির কল প্রতিষ্ঠা দ্বারা কোন ফল হইতেছে না। অথচ এ সকল কলের দ্রব্য বিদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। কাজেই দেশী কলে প্রায় ক্ষতি হইতেছে। বিদেশী দ্রব্যের আমদানীও বন্ধ হইতেছে না।

এদেশী কলের এবং বিদেশী কলের দ্রব্যে কি কিছু প্রভেদ আছে? নিশ্চিত নাই। তবে কেন এমন হয়? পড়তার জন্য। এদেশী কলের খরচ কি বেশী পড়ে? তাহাও নহে। এ পক্ষে এখানকার কুলী মজুর শস্তা, এখানকার কেরাণী এবং চর্বি, চামড়া, কয়লা ইত্যাদি সবই শস্তা, এ পক্ষে বিদেশে সবই মহার্ঘ। তবে কেন এদেশী কলের দ্রব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠে না? তাহার কারণ বাণিজ্য।

বাণিজ্যে বাজার দরে ১০৲ টাকার মালটা সময়ে ৮৲ টাকা হয়, এবং ৮৲ টাকার মালটা সময়ে ১২৲ টাকাও হইয়া থাকে। আবার বলি, বাণিজ্যে ১৲ টাকার জামাটা সময়ে আট আনা হয়, আবার ১৲ টাকার জামাটা সময়ে ১।০ পাঁচ সিকা, ১॥০ দেড় টাকাও হইয়া থাকে। কেন হয়? যে জামাটা হয় ত পড়তায় আট আনা হইতে পারে না, অথচ উহা আট আনায় কেন বিক্রয় হয়? উত্তরে "টাকার জ্বালা।" ব্যবসাদারের টাকা মজুত না হইলে, উহার ফেরাই না চলিলে, গুদামে মাল মজুত থাকিলে সুদ লাগে। অতএব উহাও এক ক্ষতি। কাজেই অধিক দিন সুদের ক্ষতি অপেক্ষা অল্প ক্ষতি করিয়াও দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহা বাঁচাইতে হয়। এইরূপ বাঁচাইতে গিয়া কলের পড়তা অপেক্ষাও বাণিজ্যের পড়তায় সময়ে সময়ে

দ্রব্যগুলি শস্তা হইয়া যায়। আবার পণ্যদ্রব্য বাজারে না থাকিলে, জাহাজ আসিতে বিলম্ব আছে বুঝিলে, ব্যবসায়ীরা উহা একটু ধরিয়া বিক্রয় করেন, তাহাতেই লাভ হয়। এ সুযোগ এদেশী কলওয়ালারা পান না। কারণ, তাঁহাদের দ্রব্য বিদেশী মহাজনের হস্তে যায় না, এদেশের মধ্যেই উহা থাকে, অথচ বিদেশী ঐ সকল দ্রব্য এদেশী মহাজনের হস্তে পড়ে, তাহাতে বরং এদেশী মহাজনের ক্ষতি হয়, তবু (এদেশী কলের দ্রব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারে না বলিয়া) এদেশী কলের দ্রব্য ইহাঁরা লইয়াও লয়েন না। কেন না, এখনও এদেশী কল অধিক নাই, এদেশে যত দ্রব্য কাটে, তাহা হয় ত এদেশী কলে উৎপন্নই হয় না। কাজেই বিদেশী মালের সাহায্য লইতে হয়। এইরূপ অবস্থাই এখন এদেশে চলিতেছে। যত দিন না এদেশী কলের সংখ্যা বেশী হইতেছে, যত দিন না এদেশী কলের দ্রব্য বিদেশে বাণিজ্যার্থ বাহির হইয়া যাইতেছে, ততদিন এদেশী মহাজনের মঙ্গল নাই।

ব্যবসাদার বা মহাজন "খেলুড়ে" জাতি। অর্থাৎ ইহারা খেলা করিয়া অর্থার্জ্জন করেন। এই খেলার জন্ত ইহাঁরা সব করিতে পারেন, ১০।২০ হাজার টাকা ক্ষতি দিতে পারেন, এবং ১০।২০ হাজার টাকা লাভও করিতে পারেন। এই ক্ষতি এবং লাভের সঙ্গে কলের পড়তার সম্বন্ধ থাকে না, সে দিকে ইহাঁরা দৃকপাতও করেন না। কাজেই শিল্পী এবং ব্যবসায়ী স্বতন্ত্র। কলওয়ালারা এখনও এদেশী ব্যবসায়ী হন নাই,—এখনও ইহাঁরা শিল্পী-শ্রেণীভুক্ত। অতএব এদেশী শিল্পীদের উচিত যে, ব্যবসায়ীহস্তে তাঁহাদের দ্রব্য উঠাইয়া দেওয়া। ইহা দিতে হইলে, দ্রব্যের প্রচুরতা চাই। কিন্তু তাহার এখন পর্য্যন্ত অভাব। সময় ক্রমে এ অভাব দূর হইবে, কেন না ভারতে কলের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। এ বৃদ্ধির মূলে কিন্তু বিদেশীয় বণিক; ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজ। ইহাঁদেরই কৃপায় এদেশী কোন কোন মহাজন ঘাড় তুলিয়াছেন,—তাহাও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে।

শ্রীঃ—

ঘর্ষণ দেশালাই।

বিলাতেও পূর্ব্বে দেশালাই ছিল না, রাসায়নিক বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে পরে, তবে আমরা "দেশালাই" শিল্পটি পাইয়াছি। অধিক দিনের কথা নহে, এ প্রদেশে "চকমকির" পাথর ছিল, এখনও পল্লীগ্রামে অনেক স্থানে এ প্রথা প্রচলিত আছে। তাহার পর মধ্যে আর এক প্রথা উঠে, তাহা পাটকাটির মুখে উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের সাহায্যে গন্ধক মাখাইয়া রাখা হইত, এবং ঘরের ভিতর কোন পাত্রে ছাই চাপা আগুন থাকিত; প্রয়োজন হইলে তদ্দ্বারা জ্বালান হইত। এ দেশে যেমন এই প্রথা ছিল, বিলাতের লোকেরাও ঐরূপ ভাবে এক কৌশলে আগুন জ্বালাইতেন; তাহা এই,—ক্লোরেট অব পটাস এবং চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া, বিশ গ্রেণ করিয়া এক এক মোড়ক করা হইত। এইরূপ অনেক মোড়ক করা হইত। প্রয়োজন হইলে এই মোড়ক মাটিতে রাখিয়া ইহার উপর এক ফোঁটা দ্রাবক ঢালিয়া দেওয়া হইত। দ্রাবক দিবা মাত্র ইহা জ্বলিয়া উঠিত। তৎপরে কাটি ইত্যাদি ইহাতে ধরাইয়া লইয়া প্রদীপ জ্বালা বা চুরুট ইত্যাদি ধরান হইত।

দ্রাবক অর্থাৎ এসিড বা অম্ল। গন্ধক দ্রাবক; ইহার ইংরাজী নাম সালফিউরিক এসিড,—ইহার এক বোতলের মূল্য ছয় আনা বা সাত আনা। ইহাতে রীতিমত জল মিশ্রিত করিলে ইহা দ্বারা অনেক কাজ হয়। এ বিষয় মেটিরিয়া মেডিকাতে এইরূপ লিখিত আছে,—গন্ধক-দ্রাবক ৭ ঔন্স, পরিস্কৃত জল যথাপ্রয়োজন। প্রথমতঃ গন্ধক-দ্রাবক ১ ভাগ তাহাতে ৭৭ ভাগ জল মিশাইবে, তাহার পর আবার উহাতে এই পরিমাণ জল দিবে যেন ৬০ তাপাংশে ৮৩৷৷০ ঔন্স হয়; ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জল-মিশ্রিত গন্ধক দ্রাবক বা সালফিউরিক এসিডকে ইংরাজীতে "ডাইলিউটেড সালফিউরিক এসিড" কহে। জল মিশাইবার সময় ইহা গরম হইয়া উঠে, এমন কি শিশি বা গ্লাসও ফাটিতে পারে। এজন্য অল্প অল্প জল ক্রমে ক্রমে মিশাইতে হয়। জলমিশ্রিত গন্ধক-দ্রাবক খাইবার মাত্রা ৪ হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত। ইহা ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। এই জল মিশ্রিত গন্ধক-দ্রাবকের ১ ঔন্সের মূল্য দুই পয়সা মাত্র। "দ্রাবক" বলিলে ষ্ট্রং নাইট্রিক এসিডকেও বুঝাইতে পারে, বাঙ্গালায় ইহাকে "মহাদ্রাবক" বলা হয়। দ্রাবক কোন স্থানের চর্ম্মে লাগিলে

সে স্থান পুড়িয়া যাইবে, জ্বালা করিবে। অতএব সাবধান! ক্লোরেট অব পটাস দেখিতে পরিষ্কার পেযা চিনির মত, আস্বাদ লবণাক্ত, জ্বরের সময় প্রবল পিপাসা নিবারণ করিবার জন্য ক্লোরেট অব পটাস ১ ড্রাম এবং জল ২৪ ঔন্স বা যথেচ্ছা মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিলে জ্বরের তাপ কম পড়ে এবং পিপাসা রোগ আরোগ্য হয়। ইহা দ্বারা দেহের ভিতরের রক্ত পরিষ্কার হয়, এজন্য ইহা টনিক মিক্সচারেও অনেক ডাক্তার ব্যবহার করেন। দাম খুব শস্তা। এক ঔন্স চারি পয়সা হইতে আট পয়সার মধ্যে। *

যাহা হউক, এখন ঘর্ষণ দেশালায়ের কথা বলি।

পূর্ব্বে এই দেশালায়ের আমদানী বেশী ছিল, এখন নিরাপদ দেশালাই (Safety Match) আবিষ্কার হইয়া যদিও ইহার আমদানী কমিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও আসিতেছে। সকলেই দেখিয়াছেন যে, এ দেশালায়ের মুখ লাল এবং যেখানে সেখানে ইহা ঘষিলেই জ্বলিয়া উঠে। পাতলা কাষ্ঠের বড় বড় বাক্সের ভিতর এই দেশালাই জাহাজে করিয়া কলিকাতায় আইসে। যখন এই সকল দেশালাইপূর্ণ বাক্স জাহাজ হইতে কয়লাঘাটার ক্রেণে কুলীরা তুলিতে থাকে, তখন এক মজা হয়। কুলীরা যেমন এই বাক্স মস্তক হইতে সজোরে মাটিতে ফেলে, তখন এই বাক্সের চারিদিকের ছিদ্র দিয়া প্রবল ভাবে ধূম বহির্গত হইতে থাকে। ইহা দেখিয়া কুলীরা উহাকে হস্ত দ্বারা আস্তে আস্তে চাপ দিয়া তবে নিবারণ করে। এরূপ না করিলে ক্রমে ধূঁয়াতে ধূঁয়াতে জ্বলিয়া উঠে! ফস্ফরসের জন্যই এই ধূঁয়া হয়। এদেশী পল্লীগ্রামের অসভ্য লোকেরা এখনও ইহাকে বড়ই পছন্দ করে। আর এই জন্যই কিছু কিছু ইহার আমদানী হয়। ইহা প্রস্তুত করা খুব সহজ।

ফস্ফরাস	২ ভাগ,
ক্লোরেট অব পটাস	১ ভাগ,
গম একেসিয়া কিংবা গঁদের জল	অর্দ্ধ ভাগ,

একত্র মিশ্রিত করিয়া মণ্ড প্রস্তুত হইলে পর, সেই যে আমাদের দেশে পাট-কাটির মুখে গন্ধক মাখান হইত, ঐরূপ ভাবে গন্ধক মাখান পাট-কাটি বা যে কোন হাল্কা শুষ্ক কাটির মুখে গন্ধক মাখাইয়া উক্ত মণ্ড লেপন করিয়া শুকাইয়া লইলেই ঘর্ষণ দেশালাই প্রস্তুত হইল। ফস্ফরাস বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। জল-পাত্রের ভিতর ইহাকে রাখিতে হয়। মূল্য বোধ হয় ১ ড্রাম চারি আনা হইতে ছয় আনা হইবে। এ দেশালাই যথা তথা ঘষিলেই জ্বলিয়া উঠিবে। ইহার সমুদয় জিনিসগুলিই বিপদ-জনক। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে ইহা রাখা উচিত নহে। আমি একবার মফঃ-স্বলে গিয়াছিলাম, অন্ধকার পথ দিয়া গাড়ি যাইতেছিল। গাড়োয়ান বাতি জ্বালিবার জন্য দেশালাই বাহির করিল, দেখি এই লাল দেশালাই। আমি ইহা তাহার নিকট হইতে লইয়া গাড়িগাত্রে আমার নাম আস্তে আস্তে লিখিলাম। লেখাগুলি জ্বলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ জ্বলিয়াছিল। গাড়োয়ান বলিল, এদেশের লোক মুড়কির সঙ্গে এই দেশালায়ের মুখের লাল দ্রব্য মিশাইয়া কাককে খাইতে দেয়, কাক উহা খাইয়া মরিয়া যায়। শ্রী ঃ—

বসিরহাটে চিনির কারখানা।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট একটী গণ্ডগ্রাম। খুলনা রেলওয়ে দিয়া কলিকাতায় যাওয়া আসা চলে। হরিশপুর, মৃর্জ্জাপুর, ভোজপাড়া মেদিয়া এই তিনখানি গ্রাম বসিরহাটের নিকটবর্ত্তী। ঐ গ্রামগুলি এবং নিজ বসিরহাটে পূর্ব্বে অনেক চিনির কারখানা ছিল, অনুমান ১০০ শত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে অদ্যাপি অনুমান ৫০টী চিনির কারখানা আছে। আমাদের এ প্রদেশে গুড়ের দর খুব কম, ২॥০ টাকা মণ হইতে খুব বেশী বড় জোর ৩।০ টাকা মণ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ দর দেখিয়াছি। আমরা অন্ততঃ ২৫ বৎসর এই কার্য্য করিতেছি, গুড়ের দর যাহা বলিলাম, উহার কম বা বেশী হইতে দেখি নাই।

আমরা গাঁওয়ালের কৃষকদিগের নিকট হইতে গুড় ক্রয় করি। তাহারা গুড়পূর্ণ ছোট ছোট কোলা গরুর গাড়ীতে সাজাইয়া লইয়া আসিয়া আমাদের কারখানায় আনিয়া দিয়া থাকে। পরে আমরা গুড় পরীক্ষা করিয়া দর চুকাইয়া লই। গুড় পরীক্ষা না করিলে, চিনির ফলন কম হইয়া চিটে গুড় বেশী হয়। এই জন্য কোলার ভিতর শলা দিয়া দেখি, উহার নীচে মাৎ আছে কিনা। দানাদার গুড়েই চিনির ফলন অধিক হয়, কাদার মত গুড় ভাল নয়। চাষীদের সময়ে নগদ মূল্যও দিয়া থাকি, অথবা উহারা দুই শত

---

* এই প্যারার সহিত "দেশালাই" প্রবন্ধের কোন সংস্রব নাই, জিনিস দুইটীর পরিচয় সাধারণকে দিবার জন্য ইহা লিখিত হইয়াছে। মঃ বঃ সঃ।

এক শত টাকা সময় সময় বাকী রাখিয়াও যায়। এ কাজে আর সুবিধা নাই। বোধ হয়, ৫।৭ বৎসর আমরা লাভ কিছুই করিতে পারি নাই, ক্ষতি অনেক দিয়াছি। তবু যে ইহা করি কেন, তাহা বুঝিতে পারি না। মানুষ যে ধোঁকায় পড়িয়া অহিফেনের নেশা ছাড়িতে পারে না, আমরাও সেই ধোঁকায় পড়িয়াছি। গাজনের সন্ন্যাসীর পিঠ চৈত্র মাস পড়িলেই চড় চড় করিতে থাকে। কেন হয়? উত্তর "সংস্কার।"

আমরা শেওলা দিয়া গুড় শুকাইয়া চিনি করি। এদেশে ইচ্ছামতী নদী আছে এবং উহার বাঁমোড় আছে। বাঁমোড়ে যে শেওলা জন্মে, আমরা উহাই ব্যবহার করি। এক নৌকা শেওলা ২৲ হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে আমরা ক্রয় করিয়া থাকি। ৪৲ টাকা শেওলা এক নৌকা; ইহার উর্দ্ধদর দেখি নাই। এখনকার পুকুরেও ইহা পাওয়া যায়। কিন্তু পুকুর পূর্ব্ব হইতে জমা লইতে হয়। বৎসর ৪৲ ৫৲ ১০৲ বড় জোড় ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে কেবল শেওলা লইবার জন্য চিনির কারখানাওয়ালারা পুকুর জমা লইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, পাটা শেওলা ভিন্ন অন্য শেওলা আমরা লই না; কারণ পাটা শেওলার দ্বারাই চিনির কার্য্য হয়।

গুড়ের পাত্র ভাঙ্গিয়া গুড় বাহির করিয়া উহা চুবড়ীতে রাখিয়া, এই গুড়পূর্ণ চুবড়ী একটা গামলার উপর বসাইয়া চুবড়ীর মুখে পাটাশেওলা চাপা দিয়া রাখি। সাত দিন পরে শেওলা সরাইয়া যে শুষ্ক গুড় পাই, উহা যন্ত্র বিশেষ দ্বারা কাঁকিয়া বাহির করিয়া লই, এবং আবার নূতন পাটাশেওলা চাপা দিয়া রাখি। আবার ৭ দিন পরে শেওলা তুলিয়া ফেলিয়া শুষ্ক গুড় কাঁকিয়া চিনি বাহির করি। এই চিনিকে "দলো" চিনি বলে। এইরূপ করিয়া যখন চুবড়ীর নিম্নস্থ গুড় আর শেওলা দ্বারা শুকাইতেছে না দেখিতে পাই, অথবা ইহা পশারিরা বুঝিতে পারে যে, আর চুবড়ীর গুড় শুকাইবে না, তখন এই গুড়ের সঙ্গে এবং চুবড়ীর নিম্নে যে গামলা থাকে, তাহাতে যে রস ঝরিয়া পড়ে, সেই রস একত্র করিয়া জ্বাল দিয়া আবার গুড় করি এবং ইহাকে নাদে ফেলিয়া শীতল হইলে এই গুড় আবার চুবড়ীতে দিয়া পাটাশেওলা চাপা দিই, এবং পূর্ব্বোক্ত-ভাবে চিনি বাহির করি। এবার যে চিনি হয়, তাহাকে গোড় চিনি কহে। দলো চিনি অপেক্ষা ইহা দেখিতে লাল। এ সকল চিনিকে ইংরাজীতে "র" সুগার বলে। আমাদের এখানকার কারখানায় এই দ্বিবিধ চিনি হয়। গোড় চিনি হইয়া গেলে যে রস গামলাতে পাই, তদ্দ্বারা আর চিনি করি না। কিন্তু চাঁদপুরওয়ালারা এই রস দ্বারা পুনরায় গুড় করিয়া চিনি করে। আমরা যদিও ইহাকে সময়ে সময়ে জ্বাল দিয়া থাকি বটে, কিন্তু সে গুড়ে আর চিনি করি না, উহাকে "পাকা চিটে" বলিয়া বিক্রয় করি। জ্বাল না দিয়া এ রস বিক্রয় করিলে তাহাকে আমরা "কাঁচা চিটে" বলি। পাকা চিটে করিয়া বিক্রয় করিলে দর কিছু বেশী পাওয়া যায়। কাঁচা চিটের দর ১॥০ টাকা হইতে বড় জোর ২৲ টাকা মণ বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। ইহাকে মদ করিবার জন্য এবং তামাক মাখিবার জন্য লোকে লইয়া থাকে। এদেশে ৮০ শিক্কার ওজন।

যাহারা গুড় জ্বাল দেয় এবং গুড়ের অবস্থা ভাল বুঝে, তাহাদের এদেশে "পসারি" বলে। উহাদের প্রত্যেকের মাহিনা খারা ১০৲ টাকা; খাইতে দিতে হয় না। যাহারা গুড়ের পাত্র ভাঙ্গে এবং চিনি কাকিয়া বাহির করে, বস্তাবন্দী করে, তাহাদের আমরা "টোলো" বলি। ইহাদের প্রত্যেকের বেতন খোরাকী সহিত ৬৲ ৬॥০ টাকা। এক হাজার টাকা গুড় ভাঙ্গিব সংকল্প করিলে আমরা ১ জন পসারি এবং ১ জন টোলো রাখি। এই হিসাবে যত টাকার গুড় ভাঙ্গা হইবে, তত লোক রাখিয়া থাকি।

আমরা কারখানার সমুদয় খরচ টাকার উপর ধরি। এক শত টাকার গুড় হইতে চিনি করিতে ১৪৲ ১৫৲ টাকা খরচ হয়; কিন্তু ইহা আমাদের কারখানা পর্য্যন্ত; কারখানার বাহিরে রেলে করিয়া চালান দিলে এবং উহা বিক্রয় কর্ত্তা বা এজেণ্টের কমিস্তানী বা আড়তদারী দিলে খরচা বেশী পড়ে, তাহা মণকরা ॥৶০ আনা হইবে। ৪০।৪১ মণ গুড়ে ১০০৲ টাকা হয়।

আমরা ৩/০ মণ গুড়ে ১/০ মণ দলো, গোড় /।০ সের, চিটে গুড় ১/॥০ মণ পাইয়া থাকি; বাকী /।০ সের জলতি যায়। একটী হিসাব দেখুন,—

৩৩/০ মণ গুড় ধরুন ৩৲ টাকা প্রতি মণ ক্রয় করিলাম,

অতএব উহার মূল্য ৩৩/০ মণ ৩৲ হিসাবে		৯৯৲
ইহাকে চিনি করিতে এবং সেই চিনি বিক্রয় করিতে মণকরা ॥৶০ হিসাবে খরচা		২২॥৶০
টাকা খরচ—		১২১॥৶০
৩৩/০ মণ গুড় হইতে দলো চিনি পাইলাম	১১/০	
গোড় চিনি পাইলাম	৩/০	
মোট—	১৪/০	

এভারেজ উক্ত দুই চিনির মণ ৬৲ ধরিলাম,	
অর্থাৎ ১৪/০ মণ ৬৲ হিসাবে	৮৪৲
৩৩/০ মণ গুড় হইতে চিটে গুড় পাইয়াছি	
১৬/০ মণ, উহার দর ২৲ মণ, দাম হইল	৩২৲
মোট আদায়—	১১৬৲
ক্ষতি—	৫৷৶০

ধরুন ৩৩/০ মণে ৫৷৶০ ক্ষতি। পশারি ভাল না হইলে ৩৩/০ গুড়ে ১১/০ মণ দলো পাই না, ১০/ মণ পাই। যাহা হউক, এভারেজে ৬৲ টাকা চিনির মণ ধরিয়াছি। কিন্তু এ বৎসর এই চিনি ৪৲ ৪৷০ টাকা মণ বিক্রয় হইয়াছে, তাহাতে আমাদের কি ভয়ানক ক্ষতি, সহজেই বুঝিবেন! এদেশী গুড়ের মণ কত হইলে তবে আমাদের লাভ হইবে, তাহাও হিসাব করিয়া দেখিবেন। এদেশী কারখানা আর কিছুতেই বাঁচিবে না। আমরা কলের চিনি কলিকাতা হইতে আনিয়া ব্যবসায় করিতেছি। এরূপ অনেক অনেক কারখানাওয়ালারা কারখানা তুলিয়া দিয়া কলের চিনির দোকান খুলিয়াছেন এবং খুলিতেছেন।

শ্রীমতিলাল সাহা।
বসিরহাট, চিনির কারখানা।

জাপানী ভাষা শিক্ষা।

(ব্যবসাদি সম্বন্ধীয় শব্দ।)

অফিসার—যাকুনিন।
শিক্ষক—সেনসেই।
কাপ্তেন—সেনচো।
সহকারী অধ্যক্ষ—উনটেনসী।
ইঞ্জিনিয়ার—কিকানসী।
নাবিক—সুইফু।
ছাত্র—সোসেই।
অনুবাদক—হোনযাকুসা।
দোভাষী—সুবেন।
গোলাবাড়ীর অধ্যক্ষ—হিয়াকুশো।
দ্রব্যনির্ম্মাতা—সেইজোনিন্।
শিল্পী—একাকী।
ডাক্তার—ইসা।
চিকিৎসক—ঙ্গেকাইসা।

মহাজনবন্ধু, মাসিক পত্র।
২য় খণ্ড, ১২শ সংখ্যা ; মাঘ, ১৩০৯ সাল।

কাসাভা আলুর চাষ। *

(৪)

(লেখক—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, M. A, M. R. A. C, and F. H. A. S.)

কাসাভায় যে বিস্কুট প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার কতক হাবড়ার একজন মুসলমান রুটীবিস্কুট-ওয়ালা প্রস্তুত করিয়াছে, আর কতক মেঃ আমুটী কোম্পানীর শিবপুরের এল্‌বিয়ন্-বিস্কিট-ওয়ার্কস্ নামক কারখানায় প্রস্তুত হইয়াছে। আমুটী কোম্পানী এই বিস্কুটগুলি ৩ ভাগ কাসাভা ময়দা ও ১ ভাগ গমের ময়দায় মিশাইয়া প্রস্তুত করাইয়াছেন, এরূপ সম্বাদ আমাকে দিয়াছেন। এগুলি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বিস্কুট্ প্রস্তুত কার্য্যে এই ময়দা ব্যবহার করিতে গেলে বোধ হয়, এইরূপ মিশাইয়া প্রস্তুত করা আবশ্যক হইবে।

কাসাভার মূল কত প্রকারে ব্যবহারে আনা যাইতে পারে, আমরা দেখিতে পাইতেছি। কি দরিদ্র, কি ধনী, সকলেই কোন না কোন ভাবে এই মূল ব্যবহার করিতে পারেন। সদ্য-উৎখাত মূল হইতে অতি সুন্দর সুন্দর ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। ময়দা হইতে অতি সুন্দর রসে ফেলা মালপো ও মস্‌কটের হালুয়া প্রস্তুত হয়। অনাবৃষ্টিতে এমন সুন্দর জন্মে, এত অধিক শস্য উৎপন্ন করে, যাহা হইতে এমন সহজে এত প্রকার পুষ্টিকর ও মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুতকারী সামগ্রী জন্মাইতে পারা যায়, এরূপ আর কোন

---

* গত জুলাই মাসের ১৩ই তারিখে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কালেজের কৃষি-বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সায়েন্স এসোসিয়ান্ সভাগৃহে ইংরাজী ভাষায় উপরিলিখিত বক্তৃতা করেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর বাক্‌লাণ্ড্ সাহেব বক্তৃতাটী বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া জেলায় জেলায় বিলি করিবার প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবানুসারে ইহা মহাজনবন্ধুতে লিখিত হইতেছে।

গাছ আমি জানি না। মহাজনবন্ধুর পৃষ্ঠপোষকগণ যদি এই গাছ আপনাপন বাগানে লাগাইয়া ক্রমশঃ কৃষকদের মধ্যে ইহার আবাদ প্রচলিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের একটী মহৎ উপকার সাধন করিবেন। মিষ্ট কাসাভার কলম শিবপুরের গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে শতকরা এক টাকা দরে ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে। আগামী ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আমি কয়েক মণ কাসাভা-ময়দা প্রস্তুত করিব, ইহাও আশা করি।

কাসাভার চাষ সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেকের লক্ষ্য পড়িয়াছে, এ বিষয়ে কিছু উৎসাহ জন্মিয়াছে, দেখা যাইতেছে। এই চাষ হইতে যে প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যদি কাহারও কোন সন্দেহ থাকে, তবে গবর্ণমেণ্ট-অব-ইণ্ডিয়ার রিপোর্টার-অব-ইকনমিক্ প্রডাক্‌টের আপিস হইতে সম্প্রতি যে ১৮৯৭ সালের ৪নং "লেজার্" বাহির হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই ঐ সন্দেহ দূরীভূত হইবে। এই "লেজার্" খানির নাম "ট্যাপিওকা গাছ, দুর্ভিক্ষের সময় অন্যতম খাদ্য উৎপাদনের উপায়।" ইহাতে ভারতবর্ষের সেক্রেটারি-অব-ষ্টেট্ এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত ই, হ্যালিডে গানিং, এম্-ডি, এল-এল্-ডি এবং রবার্ট টম্‌সন্ সাহেব দ্বয়ের কয়েকখানি চিঠি এবং এ-এম্ সইয়ার্ সাহেব লিখিত 'ত্রাবাঙ্কুরে ট্যাপিওকার চাষ' আখ্যাত একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাক্তার গানিং সাহেব ভারত-সচিবকে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬ তারিখে যে পত্র লেখেন, তাহাতে সকল কথা আছে,—"ব্রেজিলে অবস্থান কালে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষজনিত ভয়ানক ক্লেশ ও ব্যয় সম্বন্ধে ভাবিয়া আমার মন বড় ব্যাকুল হইত। আমি তখনও বিশ্বাস করিতাম এবং এখনও বিশ্বাস করি যে, মানিয়োক্ (ব্রেজিলে এই গাছকে মান্দিয়োকা বলে) গাছ লাগাইলে দুর্ভিক্ষ এককালীন রহিত অথবা দুর্ভিক্ষের অনেক উপশম হইবার সম্ভাবনা। একারণ আমি মহারাণীর রাইও-ডি-জানেরোর কর্ম্মকর্ত্তা সার্ জর্জ্জ বাক্‌লি ম্যাথিউর সমক্ষে এ বিষয় জ্ঞাপন করি। তিনি এবং আর আর বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকর্ত্তাগণ আমার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে এবং স্থানীয় সম্বাদ পত্রগুলি আমার প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, আমি ১৮৭৪ সালে পর-রাষ্ট্র-সচিব লর্ড ডার্বিকে পত্র লিখিতে অনুরুদ্ধ হই। লর্ড ডার্বি আমার পত্রখানি ইণ্ডিয়া আপিসে পাঠাইয়া দেন। তখন ভারত-সচিব লর্ড সলস্‌বেরি।

কোন না কোন কারণ বশতঃ তিনি বিষয়টীর প্রতি আর লক্ষ্য রাখেন নাই। কিন্তু এবারের দুর্ভিক্ষ এত ভয়ানক হইয়াছে—এবং ভবিষ্যতেও দুর্ভিক্ষ হওয়া সম্ভবপর বলিয়া, আমি আবার উক্ত বিষয়টী সাধারণের গোচর করিতে বাসনা করিয়াছি। এই অবস্থায় আমি আমার বন্ধু লর্ড লোর্ণ-এর পরামর্শ ও সাহায্যের প্রার্থনা করি। তিনি লেখেন, * * * "আমি এখন অন্ধ, আমার শারীরিক অবস্থা ভাল নহে। আমার বয়স ৭৯ বৎসর, কিন্তু আমার নিতান্ত বাসনা, আপনি (ভারত-সচিব) এই বিষয়টী মনোযোগ করেন। আমার মনে এই ধারণাটী বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, ঈশ্বর নিরূপিত এই খাদ্যটী যদি দুর্ভিক্ষের সময় ভারতবর্ষের রেলওয়ে-বহির্ভূত ভূভাগ গুলিতে প্রচলিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ও লক্ষ লক্ষ লোক বাঁচিয়া যাইবে। আফ্রিকা সম্বন্ধে লিভিংষ্টোন এই খাদ্যকে "জীবনের যষ্টি" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ব্রেজিল, চিলি, পেরু, এবং মধ্য আমেরিকায় ইহা সাধারণ খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল দেশে আমরা কখন দুর্ভিক্ষের কথা শুনিতে পাই না, অথচ এ সকল দেশে অনাবৃষ্টি সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। আমি এমন কোন কারণই জানি না, কেন এই গাছ ভারতবর্ষের যেখানে আবশ্যক, সেইখানেই জন্মান হইবে না।"

"প্রথম বৎসরে মূলগুলি আহারের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং ডাল পালাগুলি (প্রত্যেক গাছ হইতে অন্তত ১০০ কলম পাওয়া যায়) অন্য কৃষককে লাগাইবার জন্য দেওয়া যাইতে পারে। এরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে যেখানে আবশ্যক, সকল স্থানেই এই গাছের আবাদ প্রচলিত করা যাইতে পারে।"

১৮৭৪ সালে ব্রেজিল হইতে ডাক্তার গানিং লর্ড ডার্বিকে যে পত্রখানি লেখেন, উহা হইতে কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"ভারতবর্ষের প্রধান আহার অন্ন, বৃষ্টি না হইলে অন্ন উৎপাদন চলে না। আমার মনের ভাব, আমার পরামর্শ, প্রত্যেক কৃষকের প্রত্যেক গৃহস্থের কাসাভা বা মান্দিয়োকা গাছ সংগৃহীত থাকুক। এই গাছের মূল চাউলান্নেরই সদৃশ, আলুর ন্যায় মুখরোচক এবং ইহা অনেক বৎসর ধরিয়া জমির নিম্নে টাট্‌কা অবস্থায় থাকে। ইহা অধিক শীতে বা অধিক গরমে নষ্ট হয় না। উত্তর অক্ষরেখায় ত্রিহুতের যেরূপ অবস্থান, দক্ষিণ রেখায় সাণ্টাকাথেরিণার ঠিক সেই রূপ অবস্থান। সাণ্টা কাথেরিণা কাসাভা-চাষের প্রধান আড্ডা। কিন্তু এই চাষ নানাপ্রকার মৃত্তিকায়, নানা স্থানে, সকল সময়ে সমান হয়। * * কলম

গুলি তিন ইঞ্চি করিয়া কাটিতে হয়। কলম লাগান ব্যতীত ডাল-পালাগুলি জ্বালানী কাষ্ঠ-রূপে ব্যবহারও করা যাইতে পারে। কলমগুলি সহজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পাঠান যায়; কারণ এগুলি এত সরস যে, দুই তিন মাস রাখিলেও ইহারা জীবন্ত থাকে। কলম লাগান অতি সহজ। যে-সে জমিতে কলম লাগান যাইতে পারে। কোমল বালুকাময় জমিই এই গাছের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। * * এক খানি কোদালী দ্বারা জমি পরিষ্কার করিয়া লইয়া দুই তিন হাত অন্তর দুই তিন ইঞ্চ গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া, কলমগুলি উহার মধ্যে দিয়া মৃত্তিকা ঢাকিয়া দিতে হয়। বৎসরের যে-সে মাসে কলম লাগান যাইতে পারে, কিন্তু শীতাবসানে কলম লাগানই প্রশস্ত। শীতকালে গাছের পাতা ঝরিতে আরম্ভ করে, এবং ডালগুলি পাকিতে থাকে।

[ক্রমশঃ।

ডিক্লেরেসন-আইন।

সংবাদপত্র বাহির করিলে পুলিসকোর্ট হইতে "ডিক্লেরেসন" করিতে হয়, ইহা ইংরাজরাজের একটী আইন। ডিক্লেরেসন অর্থে ঘোষণা বা প্রচার ইত্যাদি। সংবাদপত্র বলিলে, দৈনিক এবং সাপ্তাহিক যে সকল পত্র বাহির হয়, অনেকে তাহাই বুঝেন। এইজন্য এদেশী অনেক মাসিক পত্রের বোধ হয়, অদ্যাপি ডিক্লেরেসন হয় নাই; কিন্তু উক্ত আইনের মর্ম্ম, যে-কোন মাসিক পত্রকেও ডিক্লেরেসন করিতে হইবে, না করিলে উর্দ্ধ সংখ্যা ৫০৲ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। এইজন্য আমরা "মহাজনবন্ধু"কে অগ্রেই ডিক্লেরেসন করাইয়া লইয়াছি। এক্ষণে আমাদের মাসিক সহযোগীরা যদি ইহা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে করাইয়া লইবেন। এক মাস কাগজ বাহির করিয়াই ইহা করান কর্ত্তব্য। অন্যথা পুলিসে ধরিবার পূর্ব্বে অথবা পুলিসে ধরিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ করান উচিত, কিন্তু এরূপ অসময়ে করানতে বেগ পাওয়াই সম্ভব !!!

পুলিস-কোর্টে ডিক্লেরেসনের ফারম পাওয়া যায়। উহা মণিঅর্ডারের ফারমের মত। উক্ত ফারমে পত্রিকার নাম, প্রেসের নাম এবং ঠিকানা, প্রিণ্টারের নাম এবং প্রকাশকের নাম ইত্যাদি লিখিতে হয়। এডিটার কিংবা কোন লেখক বা ম্যানেজারের সঙ্গে এ আইনের কোন সম্বন্ধ নাই। উক্ত ফারমের নকল নিম্নে দিলাম,—

No.

I

declare that I am the Printer and Publisher of the periodical work entitled the

at No.

of Calcutta.

Printed and published
in the Town.

Acknowledged before me at
the Calcutta Police Court,
this day of
190

Presidency Magistrate
and Justices of the Peace.

প্রত্যেক মাসিক পত্রের জন্য এইরূপ ৮ খানি ফারম লিখিতে হয়। স্বাক্ষরের স্থানে যে ভাষায় ইচ্ছা স্বাক্ষর করা চলে, কিন্তু লিখিতে হয় ইংরাজীতে। ঐ ৮ খানি ফারমে ভিতরের লেখা একই প্রকারের; কিন্তু উহার ৪ খানি প্রকাশকের নামে, অপর ৪ খানি প্রিণ্টারের নামে লেখা হয়, কাজেই স্বাক্ষরও প্রত্যেককে উক্ত ৪ খানি ফারমের উপর ৪ বার করিতে হয়। তৎপরে ইহা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দেখাইতে হয়, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যেক ফারমে স্বাক্ষর করিয়া দিয়া থাকেন। এইত কাজ। কি প্রকারে প্রবন্ধ সকল পত্রিকাতে বাহির হয়, ফারমে তাহা কিছুই লিখিতে হয় না। প্রত্যেককে ৪ খানি ফারম লেখাইয়া লইবার তৎপর্য্য এই যে, তাহাদের মধ্যে বড়লাট বাহাদুরের দপ্তরখানায় ১ খানা, ছোটলাট বাহাদুরের দপ্তরখানায় ১ খানা, রেজেষ্ট্রী আফিসে ১ খানা এবং পুলিস-কোর্টে ১ খানা রক্ষিত হয়; এইজন্য বোধ হইল ৪ খানা লেখা হয়।

মহাজনবন্ধু প্রকাশক,—শ্রীসত্যচরণ পাল।

ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স।

সুখ দুঃখের অনেক কাহিনী লইয়া ঊনবিংশ শতাব্দী গত হইয়াছে। নূতন আশা হৃদয়ে ধরিয়া, নূতন উৎসাহে লোকের মন অনুপ্রাণিত করিয়া বিংশ শতাব্দী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জন্মের অব্যবহিত পরেই সে যে দৃশ্য দেখাইয়াছে, তাহাতে ভরসা হয়, তাহার সুদীর্ঘ জীবনে যে বঙ্গের ব্যবসায়ের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিবে।

অল্পদিন পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স্ সংস্থাপিত হইয়াছে। নিমজ্জমান ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য ইহার সৃষ্টি। দেশে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু উল্লেখ-যোগ্য, তাহা এক একটী করিয়া বাছিয়া লইয়া ইহার মেরুদণ্ড নির্ম্মিত। আপনার অবস্থা ভুলিয়া, আপনার নাম-গৌরবে অন্ধ না হইয়া, দেশের সুসন্তানগণ এই মাতৃসেবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ব্যবসায়-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইবেন? মহারাজার স্বদেশ-হিতৈষিতা, স্বদেশের শিল্পাদির উন্নতির জন্য আন্তরিক বাসনা, কাহারও অবিদিত নাই। চিত্রবিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শিতা-লাভের জন্য মিঃ হেমকে তিনিই নিজ ব্যয়ে ইটালি প্রভৃতি দেশে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রত্যাগমনের পরও যাহাতে তাহার উন্নতি হয়, সেজন্য বিশেষরূপ চেষ্টিত ছিলেন, ইহা সকলেই জানেন। এইরূপ অনেক ঘটনা আছে, যাহা দ্বারা মহারাজার স্বদেশের উন্নতির জন্য ঐকান্তিক কামনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি যে সেইজন্য নিজ পদ-মর্য্যাদায় প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাসে অন্ধ না হইয়া, একটী সামান্য যৌথ কারবারের পরিচালক বা ডিরেক্টররূপে দণ্ডায়মান হইতে স্বীকৃত হইবেন, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এদৃশ্য নিতান্ত বিরল না হইলেও, আমাদের দেশে ইহা এই নূতন বলিয়া মনে হয়। কাশিম বাজারের মহারাজা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যাইতে পারে। তিনি বোধ হয়, অধুনা বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী। সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর পর্য্যবেক্ষণ ও অন্যান্য সাধারণ হিতকর কার্য্যে তিনি যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করেন, সামান্য লোকে তাহার উদরান্ন সংস্থানের জন্য সেরূপ করে কিনা সন্দেহ। ইহার উপরও তিনি স্বদেশের হিতকল্পে যে এই গুরুভার নিজ মস্তকে বহন করিতে স্বীকার করিয়াছেন,

তাহা কেবল একান্ত কর্ত্তব্যবোধেই। বাবু সীতানাথ রায় ধনকুবের, বিস্তৃত ব্যবসায়ের মালিক, বঙ্গের রথচাইল্ডস কি রকিফেলার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হৃদয়ে স্বদেশ-হিতৈষিতা ও মস্তকে অনন্য-সাধারণ ব্যবসায়-বুদ্ধি লইয়া তিনি এই শুভকার্য্যে নিজ ক্ষমতা মিশাইয়াছেন। মিঃ আর, এন, মুখার্জ্জি স্বনাম-ধন্য পুরুষ-সিংহ। স্বচেষ্টায় ও স্বাবলম্বনে তিনি সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে নিজাঙ্কশায়িনী করিয়াছেন। মার্টিন কোম্পানির বর্ত্তমান উন্নতির তিনি বিশিষ্ট কারণ। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সূক্ষ্মদৃষ্টি, প্রভূত কার্য্যকুশলতা ও অসাধারণ অধ্যবসায় না থাকিলে কখন তিনি এরূপ উন্নত অবস্থাপন্ন হইতে পারিতেন না! এই শুভানুষ্ঠানে তাঁহার অসামান্যশক্তির কিয়দংশ নিয়োগ করিতে স্বীকার করায় অনুমান হয়, যাহাতে অনুষ্ঠানটী সুফলপ্রদ হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষরূপ চেষ্টিত থাকিবেন। আর নলিন বাবু, তাঁহার বিষয়ে বেশী লেখাই বাহুল্য। আমাদের হতভাগ্য দেশে জন্ম বলিয়াই তাঁহার পূর্ণবিকাশ হইল না। তাঁহার মত ন্যায়বান্, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, স্বাধীনচেতা, শ্রমপরায়ণ, ভূয়োদর্শী পুরুষ সকল দেশেই দুর্লভ, আমাদের দেশেও দ্বিতীয় নাই বলিয়া অনুমিত হয়। বিলাত, বোম্বাই, দিল্লী, করাচি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র সকলের সহিত তাঁহাদের বিস্তৃত ব্যবসায় চলিতেছে। তাঁহার ন্যায় লোক এই ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাতেই, সকলে আশা করিবে যে, ইহার ভিতর কোনরূপ গলদ নাই বা হইবার সম্ভাবনা নাই এবং ইহার প্রত্যেক কার্য্যই উপযুক্ত সময়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইবে। মিঃ চৌধুরী সুশিক্ষিত, শ্রমশীল, উদ্যোগশালী, সাহসী ব্যক্তি। তাঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত উইকলি নোট্স নামক আইন-সংক্রান্ত সাপ্তাহিক পত্র অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত আনই-ব্যবসায়ীদিগের অতি আদরের বস্তু হইয়াছে এবং তিনিও তদ্দ্বারা যথেষ্ট লাভবান্ হইতেছেন। স্বদেশের মঙ্গল-কামনা তাঁহার হৃদয়ে কাণায় কাণায় বিরাজ করিতেছে। তিনি যে প্রাণপণ শক্তিতে এই কারবারের উন্নতির জন্য চেষ্টিত থাকিবেন, তাহা ধ্রুব। এই সকল দেখিয়া আশা হয় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নূতন আয়োজনে নূতন ধরণে সংগঠিত এই যৌথ কারবারটী হয় ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও হইতে পারে।

গাছে পোকা ধরা নিবারণ।

১। গাছের গুঁড়ি বা ডালে পোকা ধরিলে, উক্ত স্থানে আলকাতরা লাগাইলে পোকা মরিয়া যায়।

২। গাছের মূলে বা ফলে পোকা ধরিলে, ফল ছোট থাকিতে ১০।১২ দিন অন্তর কেরোসিন তৈল ও জল একত্র করিয়া, সেচন করিলে পোকা মরিয়া যায়। ডালে বা পাতায় পোকা লাগিলেও কেরোসিন-মিশ্রিত জল দিলে পোকা মরে।

৩। বোতলের অর্দ্ধেকের কম কেরোসিন এবং বাকীটুকু দধি দিয়া পূর্ণ করিয়া উত্তম রূপ নাড়িবে। তৎপরে উহার সঙ্গে জল মিশ্রিত করিয়া গাছে সেচন করিলে মূল, ফল, ডাল ও পাতার পোকা মরিয়া যায়।

৪। ছাই ও রন্ধন শালার ঝুল, গাছের উপর ছড়াইয়া দিলে পোকা নষ্ট হয়।

৫। লবণ ও চূণ জমির উপর ছড়াইয়া দিলে ক্ষেতের পোকা মরিয়া যায়।

৬। জমিতে আগুণ দিয়া পরে আবাদ করিলে, গাছে পোকা লাগে না।

৭। তামাক সিদ্ধ জল, সেঁকো বিষ, সর্ষপের খইলের গুঁড়া, ক্ষার, হরিদ্রার জল এবং ফট্‌কিরির জলে পোকা বিনষ্ট হয়।

৮। চিনির সিরা প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত গন্ধক-চূর্ণ বা তাম্রচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তৎপরে দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ আর্সেনিক অর্থাৎ সেঁকো চূর্ণ মিশাইয়া আমগাছের ডালে ডালে লেপন করিয়া দিলে পোকা মরিয়া যায়।

৯। চাউলাদিতে পোকা ধরিলে, কার্ব্বন্ বাইসাল্‌ফাইড্ খোলা পাত্রে রাখিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হয়; তৎপর জানালা খুলিলেই দেখা যাইবে, পোকা মরিয়া গিয়াছে। ২০ মণ শস্যে অর্দ্ধসের কার্ব্বন্ বাইসাল্‌ফাইড্ আবশ্যক।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিশ্বাস।

দিল্লীর শিল্প-প্রদর্শনী।

(বড়লাট কার্জ্জন বাহাদুরের বক্তৃতা।)

দিল্লীর এই শিল্পপ্রদর্শনী খুলিয়া আমার বড়ই প্রীতি বোধ হইতেছে। ভারতে আসিয়া অবধি আমি ভারতের শ্রমশিল্প সম্বন্ধে যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান লইয়াছি। কিন্তু ভারতের যে সকল শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যাদি এককালে অতি সুন্দর ও প্রসিদ্ধ ছিল, আজ তাহার ক্রমিক অবনতি দেখিয়া অপরাপরের ন্যায় আমাকেও দুঃখ-প্রকাশ করিতে হইতেছে। ভারতের নষ্টপ্রায় শিল্পজাতের পুনরুদ্ধার-সাধন বিষয়ে যদি কিছু করিতে পারা যায়, তাহার সুযোগ অনেক দিন হইতেই অন্বেষণ করিতেছিলাম। দিল্লীতে দরবার যখন স্থির হইয়া গেল, তখন মনে করিলাম যে, এই দরবারে নানা স্থান হইতে রাজা, মহারাজা, সর্দ্দার, জমিদার প্রভৃতি বহুলোকের সমাগম হইবে। এই সুযোগে একবার ভারতের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে কতকটা চেষ্টা পাইলে মন্দ হয় না। শিল্পসাধন বিষয়ে ভারতের এখনও কি পর্য্যন্ত সামর্থ্য আছে, তাহাও জগৎকে দেখান যাইতে পারিবে; এবং অতঃপর আর যাহাতে ভারতীয় শিল্পের অবনতি না হইতে পায়, তাহার যদি কোনরূপ উপায় বিধান করা সম্ভবপর হয়, তাহাও করা যাইতে পারিবে।

এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া আমি ডাঃ ওয়াটকে আমার সহায় করিয়া লইলাম। এই দরবার সম্পর্কে একটী প্রদর্শনী খোলা হইবে এবং উহাতে ভারতের কেবল সূক্ষ্ম শিল্পগুলিই সংগৃহীত হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। সুতরাং সূক্ষ্ম শিল্পদ্রব্য ব্যতিরিক্ত শ্রম শিল্পজাত অন্যান্য আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অনেক দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও, সে সকলের সংগ্রহ করা হয় নাই। খাঁটি ইউরোপীয় বা সেই ধরণের কোন শিল্পদ্রব্য এ প্রদর্শনীতে রাখিব না স্থির করিলাম; কিন্তু ইউরোপীয় ধরণ ধারণ যেরূপ অল্পে অল্পে এদেশের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতেছে, তাহাতে প্রদর্শনীর সকল দ্রব্যই যে খাঁটি এদেশীয় ধরণের হইয়াছে, এরূপ আমার মনে হয় না। তবে সাধারণতঃ আমার অভিপ্রেত মত কার্য্যই অনেকটা হইয়াছে।

যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুন্দর, দুষ্প্রাপ্য, ভারতের এমন সকল শিল্পদ্রব্যই আমি এই প্রদর্শনীস্থলে সংগ্রহ করিতে বলিয়াছি। লোকের রুচি-প্রবৃত্তি এক্ষণে বিকৃত হইয়া পড়িতেছে; আধুনিক অনেক শিল্পদ্রব্যও সুতরাং বিকৃত-রুচিসম্পৃক্ত হইয়া নির্ম্মিত হইতেছে।, যাহাতে রুচির পরিবর্ত্তন হইয়া ভালর দিকে দেশের লক্ষ্য হয়, সেইজন্য আমি আধুনিক কালের শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে প্রাচীন কালের অনেক শিল্পদ্রব্য পাশাপাশি ভাবে রাখিতে বলিয়া দিয়াছি। ভারতীয় যে সকল শিল্পী এস্থলে উপস্থিত আছেন, আমি আশা করি, তাঁহারা ঐ সকল প্রাচীন শিল্পদ্রব্যকে আদর্শস্বরূপ করিয়া লইয়া নিজেদের অভ্যস্ত শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে থাকিবেন। কেহ কেহ হয়ত এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য কি এবং ইহাতে কি উপকার হইতে পারে, একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমি তাহার উত্তরে এই বলি যে, ভারতীয় শিল্পের যে পরিমাণে অবনতি হইতেছে, লোকের মনে ব্যবসাদারী-ভাবও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। হাতের কাজ কমিয়া কলের কাজ বাড়িতেছে; রুচির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া লোকে কেবল নিজের কার্য্য-সৌকর্য্যের দিকে লক্ষ্য করিতেছে। পৃথিবী জুড়িয়া একটা নূতন পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, আর সেই পরিবর্ত্তনের একটা ঢেউ, দেখিতেছি, ভারতে আসিয়াছে। এই নূতন পরিবর্ত্তন প্রণালীতেই ইংলণ্ডে হাতের কাজ কমিয়াছে, চীন জাপানেও কমিতেছে। এই পরিবর্ত্তনের স্রোতকে এখন প্রতিহত করিতে পারা যাইবে না; হাতের তাঁত কলের তাঁতের নিকট পরাভূত হইবেই, কলের কারখানা হাতের কারখানার উপর জয়লাভ করিবেই, কলের গাড়ীর নিকট ঘোড়ার গাড়ী পারিয়া উঠিবে না, হাতে-টানা-পাখার স্থান এখন ইলেক্‌ট্রিক অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত পাখা অধিকার করিবেই। এ সকল অপরিহার্য্য। এখন লোকে জিনিস ভালমন্দ বড় একটা দেখে না—শস্তাই চায়,—বিলাসিতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চায়,—সৌন্দর্য্য খোঁজে না। এরূপ অবস্থায় যে অনেক প্রাচীন সুন্দর সুন্দর শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে শিল্প জাতীয় আদর্শের অনুকূল নহে, যে জাতীয় লোকের মধ্যে যে শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে, সে শিল্প যদি সেই জাতীয় লোকের অভাব মোচনের অনুকূল না হয়, তবে তাহা কখন চিরস্থায়ী হইতে পারে না। উন্নতি বা অবনতি মুখে বাঁধা দেওয়া চলে না; ঈশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই হইরে।

ভারতীয় শিল্পের উন্নতি অথবা উদ্ধার, ভারতের রাজা, মহারাজা, জমিদার ও শিক্ষিতবর্গের পৃষ্ঠ-পোষকতাতেই হইতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা বৈদিশিক শিল্পে আপনাদিগের গৃহসজ্জিত রাখিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমি বলিতে পারি, ভারতের শিল্পোন্নতির কোন আশা নাই। আমি তাঁহাদের প্রতি কোন-রূপ তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিতেছি না, ও-সম্বন্ধে ইংলণ্ডও সমান দোষে দোষী। ইংলণ্ডেও লোকে বৈদেশিক কোন সৌখিন শিল্পদ্রব্য পাইলে, সেই জাতীয় স্বদেশীয় দ্রব্য ত্যাগ করিয়া তাহারই আদর করিয়া থাকেন। আমার বক্তব্য এই যে, যদি ভারতের শিল্প, ভারতের কারুকার্য্য বজায় রাখিতে হয়, তবে তাহা কেবল বাহিরের লোকের পৃষ্ঠ-পোষকতায় হইবে না। ভারতের রাজা-রাজড়া প্রভৃতি এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকবর্গ যদি আধুনিক বিকৃত রুচির পরিহার করিয়া অথবা রুচি মার্জ্জিত করিয়া তাঁহাদের স্বদেশীয় অতি সুন্দর প্রাচীন ধরণের আদর্শ শিল্প সমূহের পক্ষপাতী হন, তবেই আসল কার্য্য সাধিত হইতে পারে। এইরূপ বিষয় লইয়া তাঁহাদের মধ্যে একটু আন্দোলন হয়, আমার ইচ্ছা; কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, সে দিন এক সময়ে আসিবেই—তবে হইতে পারে—অনেক বিলম্বে।

ভারতীয় শিল্পের যদি এইরূপ সমস্ত লক্ষণই হয়, তবে এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য কি এবং কিরূপ অভিপ্রায়ই বা ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইবে বলিয়া মনে করিতে পারি? ইহার উত্তর এক কথায় এই দেওয়া যাইতে পারে যে, ছেলেদের যেমন বস্তু উপলক্ষ করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে, এই প্রদর্শনীও সেইরূপ একটী শিক্ষণীয় বস্তু স্বরূপ। এখনও ভারতের কল্পনাশক্তির কতদূর বিকাশ হইতে পারে, সেই কল্পনা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, এই প্রদর্শনীতে তাহা দেখাইতে পারা যাইবে বলিয়া মনে করা গিয়াছে। এই প্রদর্শনীতে দেখাইতে পারা যাইবে যে, ভারতের শিল্পীদিগের শিল্পকুশলবুদ্ধি আজও বিলুপ্ত হয় নাই। এখন তাহাদের উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজন। আর দেখা যাইবে যে, ভারতবাসীর গৃহ-সজ্জার সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য কলিকাতা অথবা বোম্বাইয়ে ইউরোপীয়ের দোকানে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই অধিকাংশ সহরে, অনেকানেক পল্লীতে এখনও শিল্পদ্রব্য ও শিল্পীর অভাব নাই। ঐ সকল শিল্পিদ্বারা প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যে গৃহসজ্জা এবং সেই সঙ্গে সাংসারিক প্রয়োজনয়ীতা উভয়ই সাধিত হইতে পারে এবং প্রাচীন শিল্প সমূহের সংরক্ষণের উহারা প্রকৃত প্রস্তাবেই যোগ্যপাত্র।

এই উদ্দেশ্যে ডাঃ ওয়াট ও আমার পরিশ্রমের ফলে এই প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি এক্ষণে এই প্রদর্শনী খুলিয়া দিতেছি। আমি আশা করি যে, প্রকৃত প্রস্তাবে যে দেশহিতকর উদ্দেশ্য মাত্র মনে রাখিয়া এই প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহার যেন অন্ততঃ কতকটাও সফল হয়।

চা।

অষ্টম অধ্যায়—চা-চালুনী।

ভাঙ্গাপিকু, পিকু, পিকুসুস্, সুসং, ভাঙ্গা সুসং, কাঙ্গু, ভাঙ্গা চা, চা-ধূলি, পিকু ধূলি প্রভৃতি বহু প্রকারের চা হয়। পূর্ব্বে ইহাপেক্ষাও অনেক শ্রেণীর চা হইত; কিন্তু বাজার ঠিক থাকে না বলিয়া, সামান্য পার্থক্য অনেক গ্রাহকেও ভাল বুঝেন না বলিয়া, এখনকার চা-করেরা চারি শ্রেণীর চা সচরাচর প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ক্বচিৎ দুই এক বাগিচায় পাঁচ শ্রেণীর চা দেখা যায়। নচেৎ ভাঙ্গা পিকু (ইহার অপর নাম অরেঞ্জ পিকু) পিকু, পিকুসুস্ এবং ভাঙ্গা চা এই চারি শ্রেণীর চা-ই প্রায় সকল বাগিচায় হইয়া থাকে।

চা-চালুনীর জন্যই ইহার শ্রেণী-বিভাগ হয়। যে চালুনীতে ১ ইঞ্চির মধ্যে ১২টী তার থাকে, তাহাকে ১২ নং চালুনী বলে। এইরূপে ১ ইঞ্চির মধ্যে তারের সংখ্যানুসারে ১০, ৬, ৮ ও ৪ নং চালুনী হয়। সাধারণতঃ ১২ নং চালুনীতে চালিয়া ভাঙ্গা পিকু, ১০ নং চালুনীতে চালিয়া পিকু, ৮ নং চালুনীতে চালিয়া পিকুসুস্ এবং ৬ নং চালুনীতে চালিয়া ভাঙ্গা চা হয়। এক্ষণে কিন্তু এই প্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। অনেকে প্রথমতঃ ১০ নং এবং ১২ নং চালুনীতে একবার পিকু ও ভাঙ্গা পিকু বাহির করিয়া যাঁহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা ৮ নং চালুনীতে ভাঙ্গিয়া পরে ১০ নং চালুনীতে দিয়া, পুনরায় পিকু বাহির করিয়া, তৎপরে ৬ নং চালুনীতে দিয়া পিকসুস্ বাহির করেন। এরূপ করাতে দুই প্রকারের পিকু হয় মাত্র।

৮ নং, ১০ নং এবং ১২ নং চালুনীতে পিকুসুস্, পিকু এবং ভাঙ্গা পিকু বাহির হয়। ঐ সকল চা, যখন চালুনীতে চালা হয়, সেই সময় যে সকল চা চালুনীর ছিদ্র দিয়া বাহিরে পড়ে, তাহাদের চালুনীর নম্বরানুসারে ঐ সকল নাম দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু যে চা, চালুনীর ছিদ্র দিয়া বাহিরে না পড়িয়া উহা চালুনীর উপরেই থাকে, ঐ সকল চা একত্র করিলে অর্থাৎ ৮, ১০, ১২ নং চালুনীর উপরের চা একত্র মিশ্রিত করিলেই তাহাকে ভাঙ্গা চা বলে। কেহ কেহ ভাঙ্গা পিকু ঝাড়িয়া পিকু-গুঁড়ি (Pekoe-dust) নাম দিয়া এক শ্রেণীর চা করেন। কিন্তু এই পিকু-গুঁড়ি ভাঙ্গা চার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিলেই লাভ থাকে, নচেৎ উহা স্বতন্ত্র কোয়ালিটি করিয়া বিক্রয় করিলে প্রায়ই ক্ষতি হয়। চা চালিবার ও ভাঙ্গিবার জন্য তিন চারি প্রকার কল আছে। হাতে চালা অপেক্ষা কলে চালাতে চার গায় কম চোট লাগে। এই জন্য কলে অপেক্ষাকৃত মোটা চালুনী ব্যবহৃত হয়। কলে চালার চা চাকচিক্যও বেশী।

ভারতবর্ষে কাল বর্ণের চা অধিক উৎপন্ন হয়। পাতা ছিঁড়িবার সময় অর্দ্ধশক্ত পাতা আনা হয়। এই অর্দ্ধশক্ত পাতা রোল করা যায় না। এই পাতা গুলি শুকাইলে কাল না হইয়া লাল হয়। ইহাকেই red leaf বলে।

চা চালা হইলেই তাহা বাক্স বন্ধ করা কর্ত্তব্য; কারণ বাতাস লাগিলে ইহা নষ্ট হয়। দেশীয় লোকের যত বাগান আছে, সে গুলি প্রায়ই ছোট ছোট। ইহাঁদের কর্ত্তব্য, চা-শ্রেণী-সংখ্যা কম করা।

এ বর্ষের মত এ প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

বিবিধ দ্রব্যের চিনি।

(লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগ্‌চী)।

Fruit-Sugar ফল-শর্করা। ফল গুলি এক এক অবস্থায় এক একটী গুণের পরিচয় দেয়। পরিণামে যে ফলে যে গুণ অধিক হয়, লোকে তাহাকে সেই গুণ হিসাবে গ্রহণ করে। ভগবানের কি আশ্চর্য্য কৌশল! এক গাছেই ট্যানিক, অম্ল এবং মিষ্ট জন্মে। উদাহরণের স্বরূপ আম্রকে লইলাম। প্রথমাবস্থায় ইহা কাঁচা অর্থাৎ ট্যানিক ধর্ম্মবিশিষ্ট। ইহার পরীক্ষা এই যে, জগতে যে বৃক্ষের, যে ফলের, যে ফুলের এবং যে কোন খনিজ দ্রব্যের কষা গুণ আছে, সেই দ্রব্যের সঙ্গে লৌহ একত্র করিলে কালি হয়। হরিতকী কষা, উহা লৌহের উপর ঘষিলে কালি হয়। ক'ষো আম্র লোহার

ছুরিতে কাটিলে ছুরীর গায়ে কাল দাগ এই জন্যই পড়িয়া থাকে। ক'ষো পেয়ারা ইত্যাদি কাটিলেও এই জন্য ছুরীতে কালি পড়ে। ইহাই ট্যানিক ধর্ম্মের পরীক্ষা করিবার সহজ উপায় বলিয়া আমি মনে করি। তাহার পর আম্র খাইতে টক লাগে। জগতে যে কোন দ্রব্য যখন খাইতে টক লাগে, তখন যে উহা অম্ল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। তৎপরে ফলের মিষ্টাবস্থার সময় উহাতে চিনি পুরা হয়। মিষ্ট আম্র ইত্যাদি যে কোন ফলের মিষ্টাবস্থায় ভক্ষণ করিলে, বাস্তবিক উহা চিনি খাওয়াই হইয়া থাকে। লবিউলোস অর্থাৎ মধু পান করিলে দেহে যে কার্য্য হয়, মিষ্ট ফল ভক্ষণ করিলেও দেহে সেই কার্য্যই হইয়া থাকে। সমস্ত মিষ্ট ফলেই এই শর্করা বর্ত্তমান আছে। ইক্ষু চিনি হইল গাছের চিনি। সমুদয় গাছেই এইরূপ চিনি হয়, তবে কম এবং বেশী, এই যাহা বলুন। গাছ হইতেই উহা উৎসেচন প্রক্রিয়া (Fermentation) প্রভাবে উহা ফুল এবং ফল মধ্যে নীত হয়। চিনি খাইলে দেহের পুষ্টিসাধন হয়, এই জন্য বালকেরা মিষ্ট আম্র, কাঁঠাল অতিরিক্ত খাইলে "মোটা" হয়, এ ঘটনাও আমাদের প্রত্যক্ষ।

Starch শ্বেতসার। চলিত কথায় ইহাকে "পালো" বলে। এরারুট, বার্লি, মেলিন্সফুড, এমন কি দোলের ফাগ্ ইত্যাদি পালো ভিন্ন আর কিছুই নয়। কলা, আলু ইত্যাদির পালো বাহির আজকাল হইতেছে। সমুদয় ফল এবং মূলের পালো বাহির হইতে পারে। ময়দা, ছাতুও পালোর অন্তর্গত। অতএব শ্বেতসার সব জিনিষেই আছে। আমরা ভাত, রুটি, খই, মুড়ি, চিঁড়া ইত্যাদি নানারূপে যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেতসার ভক্ষণ করি। পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, শ্বেতসার এবং চিনির রাসায়নিক তত্ত্ব এক। চিনি খাইলে যে ফল এবং শ্বেতসার খাইলেও সেই ফল। চিনি আমাদের পাকস্থলীতে গিয়া যে কার্য্য করে, শ্বেতসারও তাই করে; অতএব ভাজা চিঁড়া ভিজাইয়া খাওয়া এবং মাল্ট এক্সট্রাক্ট খাওয়া অথবা পেটের অসুখে বার্লি খাওয়া এবং চিনির পানা খাওয়া এক। যে রোগে চিনি খাওয়া নিষিদ্ধ জানিবেন, সে রোগে জগতের প্রায় সমুদয় দ্রব্য খাওয়াই নিষিদ্ধ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বিগত বর্ষ অর্থাৎ আমাদের মহাজনবন্ধুর দ্বিতীয় বর্ষের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত যে সমুদয় সাময়িক পত্র-পত্রিকা পাইয়াছি, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত এইস্থানে প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি।

সাপ্তাহিক পত্র। এডুকেশন গেজেট, হিতবাদী, বঙ্গবাসী, মেদিনীবান্ধব, নীহার, এই কয়খানি ঠিক সুনিয়মে পাইয়াছি; জল, ঝড়, বাতাসের বরং গোলযোগ হয়, কিন্তু ইহাদের আসিবার গোলযোগ নাই। বসুমতীও প্রায় ঐ নিয়মে বাহির হয়, কিন্তু বাড়ীর কাছে বলিয়া বোধ হয়, আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে সময়ে সময়ে আলস্য করিয়াছেন। ২।১ সপ্তাহ পরেও দুই একবার বসুমতী পাইয়াছি। তৎপরে মিহির ও সুধাকর, হিন্দুরঞ্জিকা, মানভূম, বিকাশ, সময়, রংপুরদিক্ প্রকাশ, রংপুর বার্ত্তাবহ, পল্লীবাসী, ইহাদের আসিবার ঠিক নাই, কখন ইহারা দয়া করিয়া ২।৪ সপ্তাহ পরে আইসেন, কেহ বা ৩ সপ্তাহ একত্র আইসেন, কেহ বা কিছুদিন পরে যদি মনে পড়িল, তবে দেখা দেন। ইহাদের মধ্যে বিকাশ এবং সময়ের অবস্থা বরং ভাল। রংপুরের কাগজ দুইখানির অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বে ইঁহাদের অবস্থা মেদিনীবান্ধব প্রভৃতির ন্যায় ছিল। হিন্দুরঞ্জিকাও লোলমাংস হইয়াছিল; এক্ষণে আবার তাঁহার যেন নবযৌবন ফিরিয়া আসিতেছে, টাইপ ইত্যাদি ভাল হইয়াছে। মানভূম আসেন মন্দ নয়, কিন্তু পরের লেখা নিজস্ব বলিয়া, নামের উল্লেখ না রাখিয়া ইনি প্রায় প্রচার করেন। এই সম্পাদক খাটেন কম।

ভারতজীবন।—হিন্দি ভাষায় লিখিত, বেনারস হইতে প্রকাশিত; সাপ্তাহিক পত্র। এই পত্রিকাও আমাদের দেশের বঙ্গবাসী বসুমতীর মত বলবান্ পত্রিকা। ইহাও ঠিক সুনিয়মে আইসে।

উড়িয়া ও নব সংবাদ।—উড়িয়া ভাষায় লিখিত, বালেশ্বর উৎকল দে' প্রেস হইতে প্রকাশিত; সাপ্তাহিক পত্র। ঠিক সুনিয়মে পাই না।

পাক্ষিক পত্র। ফরিদপুর হিতৈষিণী, ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত; শান্তি, মাদারিপুর হইতে প্রকাশিত; এবং ছাত্র, কলিকাতা মাণিকতলা হইতে প্রকাশিত; এই তিনখানি পাক্ষিক পত্র আমরা পাইয়া থাকি। এই সকল পত্রের লেখা ও ছাপা ভাল। তবে ঠিক সুনিয়মে বাহির হয় কি না, বলিতে পারি না।

পূর্ব্বোক্ত উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রে যেমন ছড়া কাটান কম হয়, আশা করি, আপনারা ছড়া কাটানর দিকে একটু লক্ষ্য রাখিবেন। তবে "ছাত্রের" কথা স্বতন্ত্র। ছাত্র জীবনে ত আমরা ছড়াই ভাল বাসিতাম।

মাসিক পত্র। প্রবাসী, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত। প্রকৃতি, কলিকাতা হইতে; বীরভূম, কীর্ণাহার হইতে; নবপ্রভা, ভবানীপুর কলিকাতা হইতে; পূর্ণিমা, বাঁশবেড়িয়া হইতে; আশা, নোয়াখালী হইতে; উৎসাহ, রাজসাহী হইতে; জন্মভূমি, কলিকাতা হইতে; অন্তঃপুর, কলিকাতা হইতে; সখী, কলিকাতা হইতে; ইস্‌লাম প্রচার, কড়েয়া হইতে; সুধা, মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত হয়। সখী আমাদের সঙ্গে এ বর্ষে ১ বার দেখা করিয়াছেন। সুধাও বোধ হয়, এ বর্ষে ২ বার আমাদের খাওয়াইয়াছেন। অন্তঃপুরেরও ঐ দুর্দ্দশা। "উৎসাহ" এবং 'আশা' আমাদের বড় নাই। বীরভূম, বীরপুরুষের মত ঠিক বাহির হয়েন, রণে ভঙ্গ দিবেন না নিশ্চিত; কিন্তু ২।৩ মাস পরে আসিয়া থাকেন। প্রকৃতির ঠিক নাই, আজ রৌদ্র, কল্য বর্ষা হওয়াই সম্ভব। প্রবাসীর দূরত্ব হিসাবে ঠিক আছেন। নবপ্রভা বর্ষার দামিনীর ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে চম্‌কাইয়া থাকেন। প্রবাসী, নবপ্রভা, পূর্ণিমা প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালা ভাষায় এই তিন খানি পত্রিকাই ভাল। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল প্রবাসী। প্রবাসীর যেমন রূপ, তেমনই গুণ।

এক এক ধরণের মাসিক পত্র। কৃষক, ১৮১নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে; শিবপুর কালেজ পত্রিকা, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কালেজ হইতে এবং আমাদের মহাজনবন্ধু, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, এই তিন খানি এক ধরণের পত্র। বাঙ্গালায় এই ধরণের পত্র যত বৃদ্ধি হইবে, ততই দেশে সুবাতাস বহিবে, ধন, ধান্যে দেশ পূর্ণ হইবে। তখন আমাদের আবার ছড়া ও গল্পের কাগজ ভাল লাগিবে।

দারোগার দপ্তর।—ইহা এক ধরণের গল্পের কাগজ।

ভিষক্ দর্পণ।—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বাঙ্গালায় ডাক্তারি বিষয়ক অত্যুৎকৃষ্ট কাগজ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত; এবং তত্ত্বমঞ্জরী, কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণের দল হইতে প্রকাশিত। এই দুইখানিই ধর্ম্ম বিষয়ক পত্রিকা। তত্ত্ববোধিনী ঠিক সুনিয়মে বাহির হয়। তত্ত্বমঞ্জরীর নিয়ম নাই।

গার্ডনার মেগাজিন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত, আলিপুর হইতে প্রকাশিত; মাসিক পত্র। ইহাও "কৃষকের" ধরণের।

যে সকল মাসিক পত্রের নিজেদের প্রেস আছে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। নচেৎ সমুদয় মাসিক পত্র গুলিই অনিয়মে বাহির হইবার তিনটী কারণ বর্ত্তমান। প্রথম কারণ, মাসে একবার; এজন্য সম্পাদক ২।৫ মাস খাটিয়া আলস্য করেন; কেননা অবকাশ-দিন বেশী, এই সকল দিনে অবশ্য অন্য কার্য্য করিতে হয়, কাজেই বেশী-দিনের অভ্যাসটাই বলবতী হয়। একখানা মাসিক কাগজ চালাইয়া এক ঘর সংসার প্রতিপালিত হইবার মত সময়, এখনও বঙ্গে হয় নাই। লেখা-সংগ্রহ ইত্যাদিতেও বিলম্ব ঘটে। দ্বিতীয় কারণ, প্রেস। অন্যের কথা বলিবার পূর্ব্বে মহাজনবন্ধুর কথাই বলি। মহাজনবন্ধুর জন্য আমরা প্রেসে অগ্রিম ৪।৫ মাসের টাকা প্রায়ই জমা দিয়া রাখি, ঠিক সুনিয়মে কাগজ বাহির হইবে বলিয়া। ঠিক সময়ে না দিলে জরিমানা করিব, এইরূপ নিয়ম আছে। প্রেসের ম্যানেজার কয়বার জরিমানা দিয়াছেন, তবু ঠিক সুনিয়মে কাগজ দিতে পারেন নাই। আমার ধারণা, সমুদয় প্রেসওয়ালাই এ সম্বন্ধে সমান। এই সকল ভদ্র-সন্তানেরা প্রেসম্যান প্রভৃতির জন্যই মিথ্যাবাদী হইয়া পড়েন। টানা কম্পোজে প্রেসের লাভ কম। ছোট কাজ পাইলে, টানা কম্পোজ পড়িয়া থাকে। এই সকল নানা কারণে প্রেসের গোলযোগে মাসিক পত্রিকা বাহির হইতে বিলম্ব হয়। তৃতীয় কারণ, পোষ্টাপিশের আইন। মাসিক কাগজ এক পয়সা ডাকে যায় না। মনে করুন, আমাদের মাসে প্রায় দশ টাকা ষ্ট্যাম্প লাগে। মহাজনবন্ধুর মত কাগজ ৩ খানা একত্র দুই পয়সায় যায়। অতএব কালবিলম্ব করিয়া আমরা যদি দুই মাস এক সঙ্গে পোষ্ট করি, তাহা হইলেও ঐ দশ টাকা খরচেই হইয়া যায়। নচেৎ দুই মাসে ২০৲ টাকা লাগে। এই হিসাবের জন্যও অনেক মাসিক পত্র সময়ে বাহির হইয়াও অসময়ে ২।৩ মাস একত্র যায়। মাসিক কাগজ এই ত্রিদোষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তবে গ্রাহকের নিকট পৌঁছে।

ত্রৈমাসিক পত্র। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ইহাও এক নূতন ধরণের কাগজ।

পুস্তক প্রাপ্তি স্বীকার। এই বর্ষে কতকগুলি পুস্তকও আমরা পাইয়াছি। যে সকল পুস্তক আমরা পাইয়াছি, বাস্তবিক তাহা বঙ্গ সাহিত্যের এক একটী রত্নের স্বরূপ। বাজে পুস্তক দেশের লোক যে আমাদের নিকট পাঠান নাই, এবং উহা পাঠ করিয়া যে বৃথা সময় নষ্ট করি নাই, তজ্জন্য আমাদের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতেছি।

অভিব্যক্তি বাদ। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি প্রণীত। এ পুস্তক পাঠ না করিলে মানব জীবন সম্পূর্ণ হয় না। ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমুদয় শাখাগুলির সমষ্টি। মূল্য ২॥০ টাকা, সুন্দর বাঁধান পুস্তক।

খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত সংগৃহীত। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর পুস্তক ২।১ খানি আছে। কুশদ্বীপের ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা বলিলেও হয়। ঐ জেলার প্রাচীনতত্ত্ব, নদ নদী, বৃক্ষলতা, কৃষি, শিল্প এবং ঐ জেলায় কত জাতির বাস এবং তাঁহাদের বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনচরিত পর্য্যন্ত ইহাতে আছে। মূল্য ৩্ টাকা।

তমলুকের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত প্রণীত। ইহাও কুশদ্বীপ কাহিনীর মত তমলুকের কাহিনী। ত্রৈলোক্য বাবুর পুস্তকের সংগ্রহে দুর্গাচরণ বাবু পরাস্ত! দুর্গাচরণ বাবু লোক দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে কুশদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অন্যের পুস্তকের সাহায্য খুব কম লইয়াছেন। এ পক্ষে ত্রৈলোক্য বাবু দুর্গাচরণ বাবুর নিকট পরাস্ত।

গন্ধবণিক তত্ত্ব। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া অতি সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছে। এ পুস্তকেও সৌরভ আছে। জাতি বিশেষের নিকট অর্থাৎ গন্ধবণিকের নিকট এই পুস্তক অমর হইয়া থাকিবে।

কলেরা চিকিৎসা। ডাক্তার শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, হোমিওপ্যাথিক মতে। আমার এক ডাক্তার বন্ধু বলেন, ইহা অতি সুন্দরভাবে লেখা হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ত্তব্য, ইহা একখানি করিয়া নিকটে রাখা।

গান। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত। আমাদের বঙ্গবাসীর বিহারী বাবু যে, দেশ এবং দশের কাজ করিতে করিতে নিজের গলায়, নিজের ভাবে গান করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। তাঁহার মত অদ্বিতীয় লেখকের পক্ষে খুবই ভাল হইয়াছে। দুঃখের বিষয় আমরা গাহিতে জানি না, ও-রসে বঞ্চিত।

ইহা ভিন্ন আমরা উড়িষ্যা ভাষায় লিখিত গীতা ইত্যাদি অনেক পুস্তক পাইয়াছি।

গোপালনগরে গুড়ের বাণ।

—০ঃ * ঃ০—

আপনার পত্রিকায় প্রায় প্রতি জেলার চিনির কারখানার বিষয় লিখিত হইতেছে এবং চিনির আনুষঙ্গিক প্রবন্ধও অনেক প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু "বাণের" সংবাদ এ পর্য্যন্ত একটীও পাই নাই। অগ্রে "গুড়ের বাণ" তৎপরে চিনির কারখানা। আমাদের গোপালনগরের (যশোহর জেলায়) গুড়ের বাণের বিষয় যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলাম; আশা করি, ইহা "মহাজনবন্ধু"তে স্থান পাইবে।

আমাদের গ্রামটুকুতে বোধ হয়, ১৫।১৬ হাজার খেজুর গাছ আছে। এক শ্রেণীর কৃষকেরা ইহা জমা লয়। আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ইহাদের জমার সময় নির্দ্ধারিত থাকে। যে সকল খেজুর গাছে তাড়ি হয়, তাহা বার মাস জমা লয়। কিন্তু এ শ্রেণীর গাছ অল্প। গৃহস্থেরা খেজুর গাছে তাড়ি করিতে দেন না, কারণ গাছ নষ্ট হয় বা গাছ "কম জোরী" হয়। ঐ কয় মাসের জন্য প্রত্যেক গাছ চারি আনা হিসাবে জমা লয়। ইহার জন্য কোন লেখাপড়া বা কন্‌ট্রাক্ট হয় না। বিশ্বাসে এবং ধর্ম্মেই একার্য্য সম্পন্ন হয়। যাহারা এই কার্য্য করে, তাহাদের "শিউলী" বলে।

শিউলীরা গাছ জমা লইয়া, "গাছ কাটে" অর্থাৎ নলী দেয়। খেজুর গাছ এক-বীজদল উদ্ভিজ্জ। ইহার বেল্‌ত বা গাছের শাখার অন্ততঃ অর্দ্ধ-হস্ত নিম্নে বৃক্ষকাণ্ডে 'দা' দিয়া চাঁচিয়া থাকে, তৎপরে ছুরি দিয়া চাঁচে। তাহার পর গাছের হাড় বা মাঝ বাহির করিয়া তথায় একটা কঞ্চি কাঠির নল বসাইয়া প্রেক মারার মত 'দা' দিয়া ঠুকিয়া বসাইয়া দেয়। ইহাকেই নলী বসান বলে। নলীর উপর দিকটা (V) "ভি"র টানের মত করিয়া সূত্ররেখাবৎ ছুরি দিয়া রস আনিবার নর্দ্দামাও করা হয়। এ বৎসর যে পৃষ্ঠে নলী বসান হয়, আগামী বর্ষে ঠিক উহার পর পৃষ্ঠে নলী দেওয়া হয়। ফলের মোচের উপর এইরূপভাবে নলী দিলে, যে রস পাওয়া যায়, তাহাতে গুড় হয় না। সে রস জ্বাল দিলে জল্‌তি বেশী যায় এবং যাহা গুড় হয়, তাহার দানা হয় না, এজন্য ইহা দ্বারা তাড়ি হয়। কাণ্ডের নিম্নাংশে নলী দেওয়া দেখিলেই, তাহা হইতে গুড় হইবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। নলী দিবার পরে ভাঁড় বাঁধিতে হয়। ২৪ ঘণ্টায় একটা গাছ হইতে /৫ /৬ সের রস বাহির

হয়। কিন্তু প্রতিদিন প্রত্যেক গাছের রস লইয়া গুড় হয় না। কুয়াসার দিন রস বেশী হয়। কেন না, উহা রসের দিন। গাছে নলী দিয়া পর পর দুই দিন রস লইয়া জ্বাল দেওয়া হয়; তৃতীয় দিনের রস লওয়া হয় না, অর্থাৎ উহাতে গুড় বা চিনি কম থাকে বা হয় না, যাহা হয়, তাহাতে খরচাও পোষায় না, কাজেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। রসের অবস্থা দেখিলে শিউলীরা ইহা বুঝিতে পারে। আবার দুই দিন পরে গাঢ়রস গাছ হইতে বাহির হয়, তখন পুনরায় রস লওয়া হয়। বৃক্ষগাত্র চাঁচার দরুণ যে ঘা হয়, তাহা শুকাইবার মত হইলে তাহাকে পুনরায় চাঁচা হয়। এই সকল কারণে ১০০টা গাছ জমা লইলে গড়ে প্রত্যহ ২৫টা গাছ হইতে রস পাওয়া যায়। রসও ঠিক সময়ে জ্বাল না দিলে, উহা গাঁজিয়া তাড়ি হইয়া যায়।

শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এমন একটু স্থান থাকে, যে স্থানে ক্ষেত্রস্থ শস্য কাটিয়া আনিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া লওয়া হয়। এই স্থান-টুকুকে “খামার” বলে; কিন্তু রস জ্বাল দিবার স্থানকে খামার বলে না। ইহাও কিন্তু প্রায় মাঠের মধ্যেই হয়। যাহা হউক, এ স্থানকে এদেশে বাণ বলে।

বাণ উনান-বিশেষের নাম। কলিকাতার ভুনাওয়ালাদের যেমন উনান, ইহাও সেইরূপ। তবে ইহা প্রায় কোমর পর্য্যন্ত উচু; ভুনাওলাদের উনান খুব নীচু, কেন না উহারা বসিয়া কাজ করে। নচেৎ ইহাদের উভয়ের উনানই এক ধরণের,—দশটী হাঁড়ী এক সঙ্গে এক জ্বালে এক উনানে জ্বাল দেওয়া যায়। বাণে রস জ্বাল দিবার জন্য বৃক্ষশাখা, শুষ্কপত্র এবং ঘুটের আগুনেই কার্য্যোদ্ধার করা হয়।

একজন শিউলীর যদি ১০০টা খেজুর গাছ জমা থাকে, তাহা হইলে সে গড়ে ২৫টা গাছে /৫ সের হিসাবে ৩/৫ সের রস পায়। উহা জ্বাল দিলে ১/০ মণ গুড় হয়। এক মণ গুড়ের মূল্য (৮০ শিক্কা মণে) ৩৲ টাকা। ইহা একদিনের আয়। তাহা হইলে ১ মাসে আয় হয় ৯০৲ টাকা।

ব্যয় যথা;—একজন শিউলীতে প্রত্যহ ২৫টা গাছ কাটিতে পারে, অতএব যাহার ১ শত গাছ, তাহাকে ৪ জন শিউলী রাখিতে হয়। ইহারা গাছ কাটে, নলী দেয় এবং রস জ্বাল দেয়। এই জন্য ইহাদের মাসিক বেতন দিয়া রাখিতে হয়। প্রত্যেকের গড়ে ৮৲ টাকা বেতন ধরিলে মাসিক বেতন ৩২৲ টাকা। গাছের জমা আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৬ মাসে ১ শত গাছে চারি আনা হিসাবে ২৫৲ টাকা হইলে প্রতি মাসে ৩৷৷৵১০ লাগে। মোট খরচ ৩৫৷৷৵১০। জমা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ৯০৲ টাকা, ইহা হইতে খরচ ৩৫৷৷৵১০ বাদ গেলে ৫৪।১০ লাভ থাকে। কিন্তু এবার গুড়ের দর হইয়াছে ১৸০, ২৲ টাকা মণ। কাজেই এবার আমাদের লাভ হইতেছে না, সমান হইতেছে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন প্রামাণিক।

জাপানী ভাষা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

চলিত কথা।

আসিতে আজ্ঞা হউক—ইরাস সাই মাসটা।
সব ঠিক—হে! কাসকোমারি মাসটা!
তোমাকে অপেক্ষা করাইতে দুঃখিত হইলাম—ওমাচি-ডোসামা।
আশা করি আপনি ভাল আছেন—ঙ্গোকিঙ্গেন য়ো ঙ্গোজাইমাস।
আসবেন, (খাদ্যাদির) অংশ গ্রহণ করুন—ওয়াঙ্গারি নাসাই বা ওয়াঙ্গান নাসাই।
আমাদিগের কেহই নাই—ওয়াইনিকুসামা।
দয়া করিয়া যে কষ্ট করিয়াছেন, তাহার জন্য শত শত ধন্যবাদ—ঙ্গোকুরোসামা।
আমি দেখছি, বুঝেছি—নারু হোজে।
আপনি স্বচ্ছন্দ ভাবে থাকুন—যুক্কুরী।
ধূমপান করুন—ইপ্পুকু ওয়াগারি নাসাই।
এক্ষণে আমি বিদায় হইব—ওইটোমা ইটাসি মাসো।
তুমি আমায় সন্তুষ্ট হইলাম—যোকু নাসাই মাস্টা।
আমার সম্মানসূচক অভিবাদন দিবেন—যোকু যোরো সিকুডোজো।
তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি—ঙ্গোমেন নাসাই।
ব্যাপার কি?—ডোসটু?
খুব ভাল, জমকাল—কেক্কো।

স্থানীয় ইংরাজী।

ধাত্রী—আমা।
বাটীর চাকর—বয়।
একতালা বাটী—বঙ্গলো।
চিঠি—চিট্।
বাসস্থান—কম্পাউণ্ড।
পুরাতন পিত্তলাদি—কিউরিয়োস।
বিক্রয়ের এজেণ্ট—কম্প্রাডোর।
গুদাম—গোডাউন।
প্রথম দৌড়ের ঘোড়া—গ্রিফিন।
জেটি—হাটোরা।
ব্যবসায় স্থান—হঙ্গ।

রাত্রিকালীন পরিধেয়—পায়জামাস।

দেশীয় নৌকা—সাম্‌পান।

জলযোগ—টিফিন।

অঙ্ক বা সংখ্যা।

১—ইচি।

২—নি।

৩—সান।

৪—সী।

৫—ঙ্গো।

৬—রোকু।

৭—স্‌চী।

৮—হাটি।

৯—কু।

১০—জিউ।

১১—জিউইচি।

১২—জিউনি।

১৩—জিউসান।

১৪—জিউ-সী।

১৫—জিউ-ঙ্গো।

১৬—জিউরোকু।

১৭—জিউস্‌টী।

১৮—জিউহাটি।

১৯—জিউকু।

২০—নি-জিউ।

২১—নিজিউইচি।

এক বার—ইচি ডো।

দুই বার—নি-ডো।

তিন বার—সান-ডো।

চারি বার—যো-টাবি।

পাঁচ বার—ঙ্গো টাবি।

ছয় বার—রোকু টাবি।

ত্রিশ—সান-জিউ।

চল্লিশ—সিজিউ।

এইরূপ ৯০ পর্য্যন্ত।

শত—হিয়াকু।

এক শত—ইপ্পিয়াকু।

দুই শত—নি হিয়াকু।

হাজার—সেন।

এক হাজার—ইস সেন।

দুই হাজার—নি সেন।

দশ হাজার—মান।

এক লক্ষ—জিউ মান।

দশ লক্ষ—হিয়াকুমান।

এক কোটী—সেনমান।

আটত্রিশ নিযুত—সানসেন হাপ্পিয়াকুমান।

দশ লক্ষ নিযুত—চো।

সাত গুণ—স্‌চি টাবি।

আট গুণ—হাচি টাবি।

নয় গুণ—কু টাবি।

দশ গুণ—জিট্টাবি।

দ্বিগুণ—বাই কিংবা নিবাই।

ত্রিগুণ—সামবাই।